বাদল বৈকাল। মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ে আবার থামে। গৌরী-গ্রামের আকাশ মেঘে মেঘে ছাওয়া। খালের বুকে চলমান মেঘের ছায়া পড়ে, কোনটা দ্রুত যায়, কোনখানা বা নিতম্বিনী যুবতীর মত দেহভারে যেন চলিতেই চায় না। ভিজা মাটিতে ঘাসপাতায় প্রকৃতির স্নেহ ঝরিয়া পড়ে, কচুপাতায় টল টল করে স্বচ্ছ জল।

ছোট্ট খাল। খালের উপরেই গোকুল ও গোলাপীর বাড়ি। ওপারে জেলাবোর্ডের সড়ক। খালের উপর ধনুর মতন বাঁশের একটা সাঁকো বাড়ি ও রাস্তাটাকে সংযুক্ত করিয়াছে। সাঁকোয় উঠিলে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হয়, পায়ের তলায় বাঁশগুলি ঠকঠক করে।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে দুর্ভিক্ষের সময় সরকার হইতে খালটা কাটান হয়, খালের পাশেই হয় রাস্তা। তাই লোকে বলে, আকালের খাল, আকালের সড়ক। আগে অনেকে খুনী পীতাম্বরের খাল এবং খুনীর জাঙালও বলিত।

ঘাটে ছইওয়ালা ছোট্ট একখানা নৌকা বাঁধা। গোকুলের জ্ঞাতি ও বন্ধু ভীম ছইয়ের মধ্যে বসিয়া তামাক টানে, তার দৃষ্টি ন্যস্ত সামনের দিকে—মেঘলা আকাশে নয়, বেঁটে একটা হিজল গাছের ডালের উপর। সেখানে এক চড়ুই দম্পতি কিচির মিচির করে। কী তাদের উল্লাস! এক একবার উড়িয়া যায় আবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরস্পরের কাছে আসিয়া বসে, একে অপরের গা ঠোকরায়।

ছেলেবেলায় এই দৃশ্য দেখিলে ভীম ঢিল ছুঁড়িত। তার সন্ধান ছিল অব্যর্থ। গোকুলের বিবাহের পর সে ঢিল ছোঁড়া বন্ধ করিয়া দিল। তখন তার ও গোকুলের বয়স এগার, বন্ধুর স্ত্রী গোলাপীর বয়স আট।

কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত, এ কী এমন বদলাইয়া গেলা যে? ভীম বলিত, আমি যে বড় হইছি।

বিবাহ করিল গোকুল আর বয়স বাড়িল তার।

মেঘের ডাক শুনিয়া, বৃষ্টির জল পাইয়া কতকগুলি কইমাছ ডাঙায় উঠিয়াছিল। পারে মাছ দেখিয়া ভীম কিন্তু আজও থাকিতে পারে নাই। হোগলার তৈরি জোংরা মাথায় দিয়া খালুই ভরতি মাছ ধরিয়াছে।

তার কলিকা নিঃশেষে পুড়িবার আগেই গোকুল আসিয়া ঘাটে দাঁড়াইল। সুশ্রী স্বাস্থ্যবান যুবা, তবে বৃষ্টিরোদে ভিজিয়া পুড়িয়া চেহারা কিছুটা রুক্ষ কর্কশ হইয়াছে। দিন মজুরের শক্ত কর্মঠ গড়ন, কামারের মতন পেশীবহুল বাহু, গায়ে সাবান কাচা হাতকাটা শার্ট, পরণে হাঁটু পর্যন্ত ধুতি।

তার বাঁ হাতে বোঁচকা, ডান্ হাতে বাঁশের লগি। পিছনে স্ত্রী গোলাপী আর তাদের দুটি ছেলে মেয়ে, কুমি ও মানিক।

গোলাপীর গড়ন লম্বা ছিপছিপে; শ্যামল কিন্তু বেশ মাজা রং, চোখ দুটি স্নিগ্ধোজ্জ্বল। একবার দেখিলে আবার দেখিতে ইচ্ছা করে। তার এক হাতে নেকড়া দিয়া মুখ বাঁধা মাটির হাঁড়ি আর এক হাতে শতরঞ্জিতে জড়ানো কাঁথা বালিশ। সে ভীমকে বলিল, ঠাকুরপো শোনলাম মেলা মাছ ধরছ?

ধরছি চারডি—বলিয়া ভীম উঠিয়া আসিয়া মাছের খালুইটা গোলাপীর সামনে রাখে। বলে, কুমি মানিকরে ভাজিয়া দিও।

গোকুলের এখন রওনা হওয়া দরকার। আর দেরি হইলে পুবে যাইয়া উজান ঠেলিতে হইবে। কিন্তু সে মানিকের হাত ধরিয়া গোলাপীর দিকে চাহিয়া উপদেশ দেয়, আশ্বাস দেয়।

ঘর আছে, তাদের সাধের 'বাবুইর বাসা'। ঘরে ধান রাখিয়া গেল। বিদেশে যাইয়াও সে বসিয়া থাকিবে না, রোজগার করিবে, মাস মাস টাকা পাঠাইবে।

সরকার নৌকা বাজেয়াপ্ত করিয়াছে, তারা খেসারত দিবে। ঐ টাকা আনিয়া দিবে ভীম।

সে আছে, নতুন মনিব ফুটু ভুঁইয়ারা আছেন, দায়ে-অদায়ে কিছুই ঠেকিয়া থাকিবে না।

গোকুল মানিককে কাছে টানিয়া তার মাথা শুঁকিয়া বলিল, যাইয়াই টাকা পাঠাব। তখন পাঠশালায় যাইস্ কিন্তু—

হ যাব।

গোকুল কুমির মুখে চুমা খায়। কুমি বলে, মাতেও তুমু দাও। তাল লাত্তিলে দিয়েথ।

গোলাপী লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠে। ভীমের দিকে চাহিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে, কথাটা তারও কানে গেল কিনা।

মায়ের মুখে বাবার চুমা খাওয়ার কথা শুনিয়া মানিক ঘাড় সোজা করিয়া দাঁড়ায়। উপরওয়ালা 'অ্যাটেন্‌সন' বলিলে কুচকাওয়াজের সময় সিপাহীরা যেমন করে ঠিক সেইরূপ।

গোকুল বলিল, সাবধানে থাইক্যো। কুমি যেন জলের ধারে না যায়। মাইনকা রদ্দুরে না ঘোরে। আমি এবার যাই।

গোলাপী স্বামীর হাতে হাঁড়িটি দিয়া বলিল, যাই বলতে নাই, কও আসি।

গোকুল হাসিয়া বলিল, হ আসি। এতে দিছ কি?

চিঁড়া, মুড়ির মোয়া আর পাটালি।

পাটালি ক'খান অগো জন্য থাক। তুমি দেহের যত্ন করিও। সময় মতন নাবা খাবা।

উপদেশের তালিকা হয়ত আরো দীর্ঘ হইত এই সময় ভীম ডাকিল, গোন যে যায়।

গোকুল নৌকায় উঠিলে গোলাপী ডাকে, মা মনসা, মা কালী।

নৌকা পুবমুখো চলে। গোলাপীরা নৌকার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। খালটা সোজা, দেখা যায় বহু দূর পর্যন্ত।

ছইয়ের পাশে দাঁড়াইয়া গোকুল ডাকে, মানিক মাইনকা, কুমি।

আকালের সড়ক ও আশে পাশের নৌকা হইতে লোকে তার দিকে চাহিয়া থাকে। তার ডাক ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া আসে; শেষটায় আর শোনা যায় না।

এই সময় একটা চিল চীৎকার করিতে করিতে পুব্ দিক হইতে উড়িয়া আসিল। মানিক বলিল, ও বাবারে দেইখ্যা আইছে, তাই না মা?

তাদের চোখের উপর নৌকাখানা ক্রমে ক্রমে ছোট হয়, আরও ছোট। একেবারে একটা বিন্দু। মানিক এবার সাঁকোর মাঝখানে যাইয়া দাঁড়ায়। গোলাপী ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে, কিছু দেখতে পাস মানিক?

মানিক বলে, না মা।

কুমি কিন্তু দেখিতে পায়। তর্জনী তুলিয়া বলে, ঐ বাবা।

মানিক ধমক দেয়, ধেৎ। যারে তারে বাবা কইতে নাই।

গৌরীগ্রাম চোখের উপর হইতে সরিয়া গেলে গোকুল বলে, লগিটা দেও ভীম।

ভীম বলিল, বৌ ছাওয়াল ছাড়িয়া চললা, তোমার মন খারাপ। লগি আমিই ঠেলি। তুমি বরং কৈল্কায় আগুন দেও।

ভীম এক একবার লগি তোলে, লগির গা বাহিয়া মুক্তার দানার মত ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়ে। ঐ মুক্তাবিন্দু দেখিতে দেখিতে গোকুল বলে, মাইনকা আজ আমারে বড় ঠকাইছে।

কি রকম?

সে জিজ্ঞাসা করছে, সূর্য সন্ধ্যাবেলা পশ্চিমে ঘাঘরের গাঙে ডুবিয়া সকালে আবার গচাপাড়ায় ওঠে কি করিয়া? কোন্ পথে যায়?

ভীম বলিল, এ ত বড় গভীর কথা।

মাইনকা গভীর কথাই কয়। পরশু জিজ্ঞাসা করল, মেঘ হইলে শীত কমে কেন, বাবা?

খুব বোঝদার ছাওয়াল ত। তুমি কইলা কি?

আমি মাথা চুলকাইতে লাগলাম।

অরে নেকাপড়া শেখাও, ভদ্দর লোক করিয়া তোল। বরাতে থাকে ত একদিন থানার বড়বাবু হৈতে পারবে।

রক্ষা কর। অরে করব দারোগা!

কেন, দারোগা পচিয়া গেল কিসে?

গোকুল বলিল, মনে নাই লবণ তৈয়ারির সময় দারোগা ছাওয়ালগো কী মারই না মারল?

তা ঠিক। দারোগা করিয়া কাজ নাই। মানিকরে করবা কি?

দেখি, আমার গো যা বরাত।

ভীম বলে, পড়লে তুমিও ভদ্দর হইতে পারতা।

গোকুল লেখাপড়ায় ভাল ছিল। তার সহপাঠীরা কেহ আজ শিক্ষক, কেহ উকিল, কেহ ইঞ্জিনিয়র। সে পড়ায় তাদের চেয়ে ভাল বই খারাপ ছিল না। সে বলিল, তা ভাবিয়া আর লাভ কি?

আকাশে অপরূপ শোভা ফুটিয়া ওঠে। পশ্চিম দিক্ জুড়িয়া বিরাট কালোপাহাড়। তার পিছন হইতে সূর্য হাজারো পিচকারি দিয়া সহস্র ধারায় রং ছড়ায়। এই লাল, এই হলুদ আবার বেগুনি। মনে হয়, হোলির মহোৎসব।

গোকুল এই শোভা দেখে আর নিজেকেই যেন প্রশ্ন করে, অরাও কি দেখতেছে?

স্বামীর নৌকা অদৃশ্য হওয়ার পর ছেলেমেয়ের হাত ধরিয়া গোলাপী ঘরে ফিরিয়া আসে। বিরহের সঙ্গে পরিচয় তার যথেষ্ট। গোকুল বাড়ি

থাকে খুবই কম। গঞ্জে গঞ্জে পাঁচ সাত দিনের পথ নৌকা বাহিয়া বেড়ায়। গোলাপীর তখন কষ্ট হইত না। সে মনে করিত, স্বামী ঘরের কাছেই আছে।

সে শুইয়া ছিল। তার ইচ্ছা মাটিতে গড়াইয়া গড়াইয়াই রাতটা কাটাইয়া দেয়। মানিক বায়না জুড়িয়া দিল, মাছ ভাজিয়া দাও মা। ভীমকা মাছ দিয়া গেছে।

তোরগো জন্য আবার উনান ধরাই আর কি? ভারী দায় পড়ছে! মুখে ইহা বলিলেও গোলাপী একটু পরেই উঠিয়া উনানে আগুন দেয়, মাছ ভাজে, মাছপাতুরি করে। মাছপাতুরি মানিকের বড় প্রিয়।

সন্ধ্যার কিছু পরেই একটি বৃদ্ধা আসিল। তার কপালে নাকে ও হাতে উলকি কাটা—বাঁ হাতে যুগল মূর্তি, লম্বাচওড়া, গোঁফওয়ালা পুরুষের পাশে দাঁড়াইয়া এক কিশোরী।

লোকে এই উলকির জন্য বৃদ্ধাকে ডাকে উলকি পিসি। গৌরীগ্রাম ও আশেপাশের আবালবৃদ্ধবনিতার সে পিসি। গোকুলের পিসি, মানিকের পিসি আবার সম্বন্ধে যারা মানিকের ঠাকুরদা হয় তাদেরও। তার বয়স আশির উপর কিন্তু শরীর এখনও নুইয়া পড়ে নাই।

বৃদ্ধা পাশের গ্রামে আমতলির এক কবিরাজের সংসারে থায়। এই ভদ্রলোককে সে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে। তাকে ডাকে আমার কবিরাজ ছাওয়াল বলিয়া। রাতে থাকেও তার বাড়িতে। আর দিনের বেলা আমতলি, গৌরীগাঁ প্রভৃতি আশেপাশের দু'তিন খানা গ্রামে ঘুটঘুট করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

গ্রামের জীবিত লোকদের মধ্যে মাত্র দু'তিন জন তাকে শাঁখা সিঁদুর পরা অবস্থায় দেখিয়াছে। তারাও আজ সত্তরের কাছাকাছি। সে চেহারা তাদের মনে নাই।

পিসির সম্পর্কে গল্প অনেক। প্রথম যৌবনে সে এক লম্পটের কানের

লতা কাটিয়া দিয়াছে,আর একজনের কপালের উপর জামবাটি ছুঁড়িয়া মারিয়াছে। কাহিনী-গুলি সব একই ধরণের।

তরুণ-তরুণীরা জিজ্ঞাসা করে, তুমি খুব সতী ছিলা, তাই না?

বৃদ্ধা বলে, ছিলামই ত।

তুমি এত সোঁদর, তোমার বর বুঝি তোমারে খুব আদর করত?

বৃদ্ধা উত্তর করে, পোড়া কপাল!

তার মন হইতে স্বামীর স্মৃতি প্রায় মুছিয়াই গিয়াছে, আছে শুধু দুইটি ঘটনা। ফুলশয্যার রাত্রে সে স্বামীর পাশে শুইয়াছিল। তার বয়স তখন সাত কি আট, স্বামীর বয়স যে কত, আটাশ কি আটত্রিশ উহা ধারণা করার মতন শক্তি তার ছিল না। স্বামীর মস্ত বড় এক জোড়া গোঁফ ও ততোধিক বিশাল জুলফি দেখিয়া সে ভড়কাইয়া যায়।

দে রে, গোঁফ জোড়া চুমরাইয়া দে, বড় সুড়সুড় করতেছে। ইহাই তার স্বামী দেবতার প্রথম ভাষণ।

বছর দুই পরে এই দেবতাটি আর একবার শ্বশুরালয়ে আসে। সেই যাত্রায় পর পর তিন রাত্রি ধরিয়া বালিকা স্ত্রীর দেহে উলকি পরাইয়া দেয়। বালিকা যন্ত্রণায় কাঁদে।

স্বামী বলে, সতীদের উলকি পরতে হয়। উলকি থাক্‌লে সোয়ামীরে কখনও ভোলে না। ডাগর চোখ দুটি তুলিয়া বালিকা প্রশ্ন করিল, ভোলে না ত?

না রে না। বড় বউরেও পরাইছি।

পিসি সেই দিন প্রথমে শুনিল যে তার সতিন আছে। এর কিছু দিন পরেই সে বিধবা হয়।

গোকুল ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছে বৃদ্ধা তার ঘরে শুইবে। বিনিময়ে পাইবে বছরে একজোড়া কাপড় আর দু'কুড়ি হর্তুকি। হর্তুকি খাওয়ার পর মুখশুদ্ধির জন্য।

গোলাপী ছেলেমেয়ের সঙ্গে পিসিকেও চারটি ভাত আর মাছভাজা দেয়। খাইয়া বৃদ্ধা আশীর্বাদ করে, আমার মাথার যত চুল তোর তত পেরমাই হোক্।

তার মাথার চুল একরাশ। তাতে গোলাপীর পরমায়ু হয় অনেক। সে বলিল, অত পেরমাই দিয়া করব কি? গরিবের পেরমাই ত শাস্তি। তার চাইয়া অন্য আশীর্বাদ কর, পিসি।

সে ত সব সময়ই করি। গোকুল মাইনকার শত বছর পেরমাই হোক আর পীতাম্বরের মতন ঘর ভরতি সোনা।

গোলাপী বলিল, সোনা হোক। কিন্তু আর কিছু যেন তারগো মতন না হয়, পিসি।

সে সারাদিন পরিশ্রম করিয়াছে, আগের রাত্রেও ঘুমায় নাই। তার বড় ক্লান্তি বোধ হইতেছিল। ক্লান্তির জন্যই হয়ত ঘুম আসিল না।

নিস্তব্ধ রাত্রি। পিসির নাক ডাকানো ছাড়া আর কোন শব্দই নাই। সে শব্দটা বিকট, চলতি পথে মোটর গাড়ীর ইঞ্জিন মিস্‌ফায়ার করিলে যেরূপ হয় সেই রকম।

ঘুম আসে না। হাজারো ভাবনা মাথার মধ্যে আসিয়া ভিড় করে।

বিদেশে বিভুঁয়ে তার স্বামীকে দেখিবে কে? সংসারই বা চলিবে কেমন করিয়া? ধান যাহা আছে, তাতে মাস দুই চলিতে পারে। কিন্তু পয়সারও ত দরকার, হাতে যে কিছুই নাই। গোকুল রাখিয়া গিয়াছে মাত্র বার গণ্ডা পয়সা।

মানিকের লেখাপড়া বন্ধ। মাহিনা দিতে পারে নাই বলিয়া সে আজ কিছুদিন পাঠশালায় যায় না। অথচ ছেলেটা লেখাপড়ায় ভালই ছিল। চাষাভুষার ছেলের পড়াশুনা এই ভাবেই বন্ধ হয়। গোকুলের হইয়াছে, গোলাপীর হইয়াছে, ভীমেরও।

সে কথা যাক্, এখন দুবেলা ছেলেমেয়ের মুখে দুগ্রাস ভাত তুলিয়া

কোন রকমে ওদের বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে হয়। অথচ কিছুদিন আগেও দিন চলার ভাবনা ছিল না। নৌকা বাহিয়া গোকুল বেশ দু'পয়সা আনিত।

লাগিল জাপানী যুদ্ধ। সরকার নৌকা কাড়িল, বাই-সিকল কাড়িল। পোড়া যুদ্ধে সবই ওলট-পালট হইয়া গেল।

ভাবিতে ভাবিতে ভোরের দিকে গোলাপী ঘুমাইয়া পড়িল। উঠিল স্বপ্ন দেখিয়া, অস্পষ্ট স্বপ্ন। অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছু মনে করিতে পারিল না। কিন্তু ভয়ে তখনও বুক ধুক ধুক করিতেছিল।

দুই

গোলাপী সকালে উঠিয়া দেখে চারিদিক আলোয় ভরিয়া গিয়াছে। কালকের মেঘলা আকাশ আজ সোনায় মোড়া। পাখীরা ঐ আলোয় লুটাপুটি খায়, না যেন সোনার জলে স্নান করে।

ডাইনে সিধুর বাড়ির তাল গাছের পাতাগুলি সদ্য ধার দেওয়া তলোয়ারের মতন দেখায়। ডালে ডালে বাবুইর বাসা, মনে হয় উবুড় করা সবুজ কতকগুলি বোতল ঝুলিতেছে। এই বাসার সঙ্গে গোলাপীদের জীবনের যোগ বড় নিবিড়।

কয়েক বছর আগে। তখন তাদের শুধু একখানা খড়ের চালা ছিল, তাও বাঁশের খুঁটির উপর। দরজা জানালা কিছুই ছিল না, দরজার বদলে ছিল দরমার তৈরি ঝাঁপ।

গোকুল খাইতে বসিয়াছে। পরিবেশন করে গোলাপী, দেয় কচুর শাক, সরল পুঁটি ভাজা আর সরল পুঁটির ঝোল। আগের রাত্রে গোকুল জাল বাহিয়া ঐ মাছ ধরিয়াছিল।

সে খায় আর বাবুইর বাসা বাঁধা দেখে। তার বাড়ির দক্ষিণ পুব কোণে সিধুর তালগাছে এক জোড়া পাখী বাসা বাঁধিতেছে। চঞ্চুইর

মতন ছোট্ট পাখী, গায়ের রং ধূসর নয় বরং একটু হলদে। তারা ঠোঁট দিয়া নারিকেল পাতা চিরিয়া ফিতার মতন সরু সরু ফালি বানায়। ঐগুলি নিচের দিকে বুনিয়া বোতলের মতন বাসা তৈরি করে। এই বাসা যেমন মজবুত, তেমনই সুন্দর। প্রবেশের পথ থাকে নিচের দিকে। চাষীরা বলে, নীড়। এই নীড় বাতাসে দোল খায় কিন্তু ঝড়ে ভাঙে না।

গোলাপী জিজ্ঞাসা করিল, দেখতেছ কি ?

গোকুল বলিল, বাবুইর নীড় বাঁধা। আমারও ইচ্ছা ঐ রকম নীড় বাঁধি, ঝড় বৃষ্টিতে যা পড়বে না।

গোলাপীর মুখ খুশিতে ভরিয়া উঠিল। গোকুল বলিল, শুধু তোমার আমার নয়, মাইনকারও একটা গতি হবে। কুমি তখনও হয় নাই।

সেই হইতে দুজনে ভাল একখানা ঘর করার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যায়। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পরিশ্রমী, হিসাবী। গোকুল নৌকা লইয়া গঞ্জে গঞ্জে ঘোরে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া টাকা আনে। গোলাপী তার প্রতিটি পয়সা হিসাব করিয়া খরচ করে। করার আগে পাঁচবার ভাবে, এ যে তাদের নীড় বাঁধার কড়ি।

সেই নীড় হইল। শালের খুঁটি, গামার কাঠের দরজা—হইল সবই কিন্তু যুদ্ধের জন্য টিন দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় চালা খড় দিয়াই ছাইতে হইল।

গোকুল বলিল, এই আমাগো নীড়।

সেই সময় বাড়িতে আরও একটা সংসার ছিল, গোকুলের দাদা মণিরামের ঘর। আজ সেই ভিটায় জঙ্গল গজাইয়াছে। দেখিলে দুঃখ হয়। গোলাপীর বেশী দুঃখ হয় ছোট জায়ের জন্য। এটি মণিরামের দ্বিতীয় স্ত্রী। পেটের দায়ে একদিন সে কোথায় যেন উধাও হইয়া গিয়াছে।

কয়েকদিন জল ঝড়ে মাটির পোতা জায়গায় জায়গায় ধ্বসিয়া

গিয়াছিল। গোলাপী গোবর মাটি দিয়া সেইগুলি সারে, আগাগোড়া গোবর জলের পোঁচ দেয়।

একটু পরে মাথাব উপর দিয়া এক ঝাঁক এরোপ্লেন উড়িয়া যায়।

এ অঞ্চলে রেল নাই, মোটর গাড়ী নাই। ভাল এমন একটি রাস্তা নাই যার উপর দিয়া গরুর গাড়ী চলিতে পারে। কিন্তু দেশের লোকের বিমানের সঙ্গে পরিচয় আছে। প্রথম প্রথম এরোপ্লেন দেখিলে তারা ভয় পাইত, বিস্মিত হইত। তার পর ছেলের দল বিমানের পিছু পিছু ছুটিতে লাগিল। দু'একজন এখনও ছোটে।

হঠাৎ গোলাপীর সামনে বড় একটা ঢিল পড়ায় সে চাহিয়া দেখে মানিক ঢিল ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে উড়ো জাহাজের পিছন পিছন ছুটিতেছে। -

ওরে থাম্, হারামজাদা থাম্, দেখলে গুলি করবে যে—বলিয়া গোলাপী ছুটিয়া গিয়া ছেলেকে ধরে।

মানিক বলে, মারব না? অরা বাবারে দেশছাড়া করল। ভারী ত যুদ্ধ! মানষের নৌকা কাড়বে, সাইকেল কাড়বে।

গোলাপী বলে, এই করিয়া তুই অগো যুদ্ধ থামাবি?

যুদ্ধ চলিতেছে দু বছরের উপর। এতদিন লোকের গায়ে একটা আঁচড়ও লাগে নাই। বরং জাপান রেঙ্গুন আক্রমণ করার পর কলিকাতার প্রবাসী বাবুরা দেশে ফেরায় এই অঞ্চলের চাষীমজুরের মধ্যে কিছুটা অর্থস্বাচ্ছল্য দেখা গিয়াছিল।

এই সময় সরকার নৌকা কাড়িল, সাইকেল কাড়িল।

নৌকা এ অঞ্চলের প্রধান অবলম্বন, বহু লোকের জীবিকার উপায়। শিরায় শিরায় রক্তসঞ্চারিত হইয়া দেহীর যেমন দেহ রক্ষা হয়, বড় বড় নৌকাগুলিও তেমনি গঞ্জে গঞ্জে হাটে বাজারে মাল বহন করিয়া নদীমাতৃক এই দেশের প্রাণশক্তি জীয়াইয়া রাখে।

গোকুলের একখানা নৌকা ছিল। উহাই ছিল তার জীবিকার একমাত্র,

উপায়। ঐ নৌকা ভাড়া খাটাইত। নৌকা বাহিত সে, ভীম আর কাশীনাথ।

নৌকা বাজেয়াপ্ত হইলে গৌরীগ্রাম, গচাপাড়া ও আমতলির অনেকে মিলিয়া মহকুমায় দরখাস্ত দেয়, তদ্বির করে, খরচাও করে প্রচুর। গোলাপীর সোনার মাকড়ি ও রূপার গোট বাঁধা পড়ে কিন্তু ফল হয় না কিছুই।

নৌকার মালিকদের মধ্যে যাদের জমি জমা ছিল, অন্য কারবার ছিল, তারা দেশে টিকিয়া রহিল, গোকুল পারিল না। তার ইচ্ছা ছিল কলিকাতায় যায়। গোলাপী বাধা দিল। বলিল, লোকে কলকাতা ছাড়িয়া পালাইতেছে। আর তুমি সেইখানে যাবা? তা হবে না।

ভিতে গোবর লেপিতে লেপিতে বেলা হইয়া যায়। কুমি আসিয়া তার বুকের কাপড় সরাইয়া একটা স্তন ধরিতে চেষ্টা করে।

তার বয়স তিন পূর্ণ হইতে চলিল। এখনও সে মায়ের দুধ খায়। আগে মেয়েকে দুধ দিতে বেশ লাগিত কিন্তু তার দাঁত ওঠার পর সে স্তনের বোঁটায় মুখ দিলেই গোলাপীর গা শির শির করে।

সে বোঁটায় নিম নিসিন্দা মাখায়, কিন্তু কুমিকে নিরস্ত করিতে পারে না। সে তেতো চুষিয়া ফেলিয়া দেয়, তারপর দুধ টানে। আজ কিন্তু গোলাপী আপত্তি করিল না। বরং বুকটা একটু আগাইয়া দিয়া বলিল, খা রাক্ষুসী, খা। দু একটা টান দিয়া কুমি হাসিয়া বলিল, মা ভাল।

সন্ধ্যায় লক্ষ্মী পুজা। প্রতি বৃহস্পতিবার গোলাপী লক্ষ্মী পুজা করে। ঠাকুরের আসনে সন্ধ্যামণি ফুল দেয়, আর গুড় কলা—যে দিন যা পারে।

সেদিন সন্ধ্যায় গা ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া সে সিঁথিতে সিঁদুর পরিল। কপালে দিল ছোট্ট একটা টিপ। তারপর দেবীর সামনে বসিয়া যুক্তকরে আবৃত্তি করিতে লাগিল—

সাগরের কন্যা তুমি হরির ঘরণী
পেচক বাহিনী মাতা চম্পক বরণী,
দয়া কর দীন জনে চাও হাসি মুখে
পুত্রকন্যা লৈয়া মোরা থাকি যেন সুখে।

চোখ বুজিয়া সে বহুক্ষণ দেবীকে ডাকিল, অর ভাল কর মা। বিদেশে বিভুঁয়ে গেল, চাইয়া দেইখ্যো।

কুমি ও মানিক ততক্ষণে প্রসাদের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। মা প্রসাদ দিলে কুমি অভ্যাসবশে উহা নাকের ডগায় ছোঁয়াইয়া মুখে পোরে, মানিকের ঐটুকু দেরিও সয় না।

গোলাপী বলে, তোর কি হবে রে? ভক্তি নাই, ছেদ্দা নাই।

ছেদ্দা আছে মা। গুড় কলা বাতাসায় খুব ছেদ্দা।

গোলাপী হাসিয়া বলে, চুপ চুপ।

মানিক অবশিষ্ট বাতাসাখানা চায়। কুমি বলে, না, মা খাবে।

গোলাপী বলে, না, ওখানা খাবে পিসি।

কুমি বলে, উলতি পিথি?

এই সময় ভীম বাহির হইতে ডাকিল, গোলাপ বৌ।

গোলাপী বলিল, কে, ভীম ঠাকুরপো? এর মধ্যে পালদীর থা আইলা?

জল বাতাস দুইই গোন ছিল। নাও তীরের মত ছোটছে।

ভাল করিয়া জাহাজে ওঠতে পারছে ত? বসার জায়গা পাইছে?

না, দিছি চোঙায় উপর উঠাইয়া।

গোলাপী বলিল, তুমিও পাশে বইলেই পারতা। কানাই বলাই এক সঙ্গে যাইতা, একত্তর চাকরি করতা।

ভীম মুচকি মুচকি হাসে।

ধর লক্ষ্মীর প্রসাদ—বলিয়া গোলাপী তার হাতে কয়েক টুকরা শশা, কলা আর অবশিষ্ট বাতাসাখানা দেয়।

ভীম ঘরের ভিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করে। এই প্রণাম কার উদ্দেশে, গোলাপীর না দেবী কমলার, সে নিজেও তাহা জানে না।

মানিক বলে, বাতাসা খান ত পিসির জন্ম ছিল। ভীম কাকারে দিলা যে?

গোলাপী কোন উত্তর করে না।

একটু পরে ভীম চলিয়া গেল। সে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিসি আসিয়া উপস্থিত। সাঁকোর উপর ভীমের সঙ্গে তার দেখা। সে গোলাপীকে জিজ্ঞাসা করে, ভীম আইছিল না?

গোলাপী কহিল, হ।

সন্ধ্যার পর কোন জোয়ানরে বাড়িতে আসতে দিস না।

গোলাপীর বিরক্তি বোধ হয়। সে বলে, এমনে ত আসে নাই। আইছিল জাহাজে তোলার খবর দিতে।

কাল সকালে দিলেও ত পারত। দেখিস, মানষে পাচটা কুকথা কইতে না পারে।

কুকথা কই ত আমরা, আমি তুমি।

বৃদ্ধা রাগত ভাবে কহিল, আমি কারও কুচ্ছায় নাই। তেমন বাপ মায় আমারে জন্ম দেয় নাই।

তা জানি পিসি। তুমি কারও নিন্দা কর না। আমিও আর পাঁচ জনের কথাই কইছি।

সেই পাঁচ জন যদি অবুঝ হয়, তা হইলে উপায় কি? চলতে হবে সবাইরে লইয়া। তার উপর আমরা গরিব।

গোলাপীর মনে হয় কথাটা সত্য। তার মনে পড়ে গ্যাস বেলুনের কথা। গোকুলের নৌকার এক যাত্রী মানিক কুমির জন্ম দুইটি বেলুন দিয়াছিলেন, হাওয়ায় ভরতি খেলনা।

মানুষগুলা যেন এক একটা বেলুন। হিংসার হাওয়ায় ভরতি।

ভাবিতে ভাবিতে পিসিকে প্রসাদ দিতেও সে ভুলিয়া যায়।

তিন

গোকুলের পৌছাসংবাদ আসে। চিঠিখানা বড় বড় অক্ষরে লেখা। বহু দিন অভ্যাস না থাকায় অক্ষরগুলি ছোটবড় হইয়াছে। লাইন আঁকা-বাঁকা। সে লিখিয়াছে :

ছিরিমতি গোলাপ, বিনা কেলেশে বরিশালে পৌছিয়াছি। জাহাজে শুইয়া আসিয়াছি, দোতলায় চোঙার পাশে। জাহাজে একটি লোকের সঙ্গে আলাপ হইল। লোকটি ভারি মহাশয়। এই শহরে তানার চুলদাড়ি বানাইবার কারবার আছে। সেই দোকানেই আছি। দোকানে চেয়ার, টেবিল আর আয়নার কী বাহার! তোমাকে একবার এই গদিওয়ালা চেয়ারে বসাইতে পারিলে হইত। কাচের সামনে।

এই মহাশয়ের যজমানরা সব বড়লোক—দারোগা, হাকিম, উকিল, পেশকার। তানাদের বলিয়া আমার চাকরি করিয়া দিবে। খাই এক সোটেলে, পয়সা সোটেল। কাল ডালভাত, বেগুন-ভাজা খাইয়াছি। চাকরি হইলে ভাল-অভাল খাইব। তোমাদের টাকা পাঠাইব।

শত সাবধানে থাকিবা। কুমি, মানিককে খালের ধারে আর উননের ধারে যাইতে দিবা না।

ইতি

গোকুল

পুঃ—এক বাইজীর বাড়িতে আমার চাকরি হইতে পারে। দোকানের এক যজমান আশা দিয়াছে। তিনি কাছারির বড় পেশকার।

আমার ঠিকানা—স্টাইল-ডি-সেলুন,

কালীবাড়ি পোঃ আঃ

বরিশাল।

মাকে চিঠি পড়িয়া শোনায় মানিক। তোমাকে গদিওয়ালা চেয়ারে বসাইতে পারিলে বেশ হইত—পড়িয়া মায়ের দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলে, আমরাও গদিতে বসব মা।

গোলাপী কোন উত্তর করে না। বাইজীর চাকরির কথা শুনিয়া সে গম্ভীর হইয়া গিয়াছিল।

বাইজীর চাকরি। সে আবার কি?

রাত্রে পিসি আসিলে তাকে জিজ্ঞাসা করিল, বাইজী কারে বলে পিসি?

কেন, বাইজী দিয়া করবি কি?

বাইজীর ওখানে তোমার ভাইপোর চাকরি হবে।

ওঃ—বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর কেমন যেন অমঙ্গল সূচনা করে।

গোলাপী বলে, কিছু কইলা না ত?

পিসী বলিল, পেশাগর জানিস্? ঐ যে ঘাঘরে আছে। বাইজীরাও শুনছি সেই রকম।

বৃদ্ধা তারপর আপন মনেই যেন আওড়াইতে থাকে, বাইজীরা ছলাকলা জানে, কত পুরুষ-ভুলানো মন্তর। কত তুকতাক।

চিঠির উত্তর দিল মানিক—

ছিরিচরণেষু বাবা, তোমার চিঠি পাইয়াছি। আমরা ভাল আছি। আমরা খালের ধারে যাই না, আগুনের নিকটও নয়। কাল কালীর চারটা বাচ্চা হইল। দুইটা কালো, একটা কালো-শাদা আর একটা বাঘার মতন। তাদের চোখ ফোটে নাই। খালি কেঁউ কেঁউ করে, আঁধারে আছে কিনা। বাচ্চাগুলার ধারে যাওয়ার জো নাই, গেলেই কালী তাড়া করিয়া আসে। দেখিলে—তুমি যে বাবা—তুমিও ভয় পাইতে।

আজ পিসির দুটা দাঁত পড়িল। আশি বছরে এই প্রথম। আগে একটিও পড়ে নাই। পিসি গালে হাত দিয়া কাতরাইতেছে।

তোমার জন্য বড় দুঃখ করে বাবা। কুমির, মায়ের, পিসির আর কালী কুকুরটার—ডুস্‌কু সকলের।

ইতি

আং মানিক।

পুনঃ—আজ কচুর শাক খাইয়াছি। রান্না ভাল হইয়াছে। আর কি লিখিব? আসি—আবেদন ইতি

মানিক।

গোলাপী শুনিয়া বলিল, হইছে বেশ। আর একটা কথা ল্যাখ, তুমি যার তার বাড়ি কাজ করবা না। মায়ের মাথার কিরা।

সেই দিনই বৈকালে। গোলাপী ধান ভানিতে ছিল, সে ঢেঁকিতে পাড় দেয় আর মানিক খেজুর ডাঁটা দিয়া চাউল উপর নিচ করিয়া দেয়। আজ বছর দুই যাবৎ সংসারের বহু কাজেই সে মাকে সাহায্য করে। কুমিও কাজ করিতে চায়। এক একবার ঢেঁকির দিকে হাত বেড়ায়। সে ঢেঁকির খুব কাছে আসিয়া পড়িলে গোলাপী ধমক দেয়।

চাউল ঝাড়ার জন্য সে মাঝে মাঝে ঢেঁকি হইতে নামে, দু' একবার কুমিকে স্তন্য দেয়। স্বামী বিদেশে যাওয়ার পর হইতেই এই স্তন্যদানের মধ্যে নূতন এক আনন্দের সন্ধান পাইয়াছে গোলাপী।

কুমির আনন্দ আর ধরে না। প্রতিবার স্তন্য পানের পরেই সে বলে, মা ভাল।

গোলাপী মেয়েকে স্তন্য দিতেছে এমন সময় দাঁতে মিশি দিতে দিতে একটি স্ত্রীলোক উঠান হইতে ডাকিল, ও গোকুলের বৌ, ও গোলাপ।

এই স্ত্রীলোকটিকে দেখিলে হঠাৎ পুরুষ বলিয়া ভ্রম হয়। গলার হাড় পুরুষদের চেয়েও উঁচু, উপরের ঠোঁটে গোঁফের রেখা, জল লাগিলে রেখাটা আরও স্পষ্ট হইয়া ওঠে; তার নাম হরিমতী ওরফে হরি কাবলী।

তাকে দেখিয়া গোলাপীর ভাল লাগে না। শুধু সে নয়, হরিমতীকে দেখিলে অনেকেই মনে করে কোন দুষ্ট গ্রহের নজর পড়িয়াছে।

হরিমতী মাখাল পীতাম্বর নন্দীর মেয়ে, হারাণ নন্দীর বোন। হারাণরা গৌরীগ্রামের সব চেয়ে বড়লোক। তাই জলচল না হইলেও বামুন কায়েতরা পর্যন্ত তাকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করে। আর সকলে বলে, হারাণ বাবু।

হরিমতী ভাইদের সংসারে থাকে। সে কখনও স্বামীর ঘর করে নাই, স্বামী নেয় নাই। সে বলিত, আগুনে ঝাঁপ দেব, তাও সই। কিন্তু ঐ গুঁফোর সঙ্গে ঘর করা! ওরে বাপ্।

হরিমতীও তার মৃত্যু সংবাদ আসিলে হাতের নোয়া এবং পায়ের মল খুলিতে খুলিতে বলিল, বাঁচলাম। এগুলা ছিল আমার হাত-পায়ের বেড়ি।

তাদের সমাজে বিধবার নিরামিষ খাওয়ার রীতি নাই। তাই স্বামীর মৃত্যুতে তার কোন অসুবিধাই হইল না।

গোলাপী একখানি পিঁড়ি আনিয়া তাকে বসিতে দিয়া বলিল, কি মনে করিয়া, দিদি?

আইলাম দায়ে পড়িয়া। তোর সোয়ামী বিদেশে গেল, আমারে একবার কইয়াও গেল না। জানতাম মানুষটা ভাল, লোকেও কইত। এখন দেখতেছি, পাকা জুয়াচোর।

কি করছে সে? তারে ত সগলে ভালই কয়।

ভাল না হাতী। তোর অসুখের সময় গেল বছর এক কুড়ি সাতটা টাকা নিছে। কথা ছিল, নাও বাইয়া শোধ করবে। নাও ত শিকায় উঠছে। এখন উঠবে পরাণ।

গোলাপীর মুখখানা ম্লান হইয়া গেল। সে বলিল, হয়ত তোমার দাদারে কইয়া গেছে।

দাদারে! মহাজন হইলাম আমি। এক কুড়ি সাত টাকার মাসে দু' কুড়ি চৌদ্দপয়সা সুদ। আজ পর্যন্ত একটা আধলা ঠেকায় নাই। তুই কিছু জান্‌তিস্‌ না?

না দিদি।

সোয়ামী লইয়া তোরা সকলেই সুখে ঘর করিস্‌ দেখতেছি—হরিমতীর কথার মধ্যে প্রকাশ পায় একটা হিংস্র উল্লাস। নিজে স্বামীপ্রেমে বঞ্চিতা, তাই কাহাকেও বঞ্চিতা মনে ভাবিতেই সে আনন্দ পায়। সেই উল্লাস আর চাপিয়া রাখিতে পারে না।

গোলাপী কহিল, চাকরি হবে লেখছে। হইলে কিছু কিছু করিয়া দেব।

কেডা তার জন্য নায়েবী নিয়া বইছে শুনি, যে তোরগো খাওয়াইয়া আবার দেনাও শোধবে? তার থা বরং গায়ে গায়ে শোধ করিয়া দে।

গোলাপী কথার অর্থ বোঝে না। হরিমতী বলে, বুঝলি না? গতর খাটাইয়া দেনা দিবি। সুদের বাবদ অনেকের কাছে আমি ধান পাই, তাই চাউল করিয়া দিবি। এক মনে চাউল দিবি চার সের। নগদ না, সুদের বাবদ কাটান যাবে।

গোলাপী নীরবে দাঁড়াইয়া থাকে। হরিমতী বলে, কি রে, কথা কস্‌ না যে?

আমি মাইনকার বাবারে লেইখ্যা দেখি, সে কি কয়।

হরিমতী বলিল, অত দেরি করতে আমি পারব না।

টাকা তোমার পাবা, অর চাকরি হউক।

একজনে নৌকা দেখাবি আর একজন দেখাবি চাকরি, ও চলবে না। যা কওয়ার আজই ক'।

গোলাপী এবার দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, তোমার বাড়ি যাইয়া ধান ভানতে আমি পারব না।

ওরে আমার সোহাগ রে! দুধ খাবেন আর পালান টানবেন না। গাল দিয়া ভূত ছাড়াইয়া দেব না? শাপান্ত করব।

হরিমতী সোনাদানা বন্ধক না রাখিয়াই টাকা ধার দেয়। তার টাকা পড়িয়া থাকে না। গালি দিয়া, শাপান্ত করিয়া আদায় করে। লোকমুখে গোলাপী তার কারবারের কথা শুনিয়াছিল, আরও শুনিয়াছিল যে তার অভিশাপ বিফল হয় না।

সে কাতর কণ্ঠে কহিল, শাপ দিও না দিদি। তোমার দেনা আমি দেবই।

জানিস আমার টাকা কারও হজম হয় না? ওলা—ওলা হয়; বলিয়া হরিমতী হাসে।

তার মিশি দেওয়া দাঁত আব প্রকাণ্ড হাঁ দেখিয়া গোলাপীর ভয় করে। মনে হয় সাক্ষাৎ ওলা দেবীই উপস্থিত হইয়াছেন। সে তার হাত ধরিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলে, না, না দিদি।

হরিমতী বলে, কিছু না নিয়া আজ আমি ওঠব না।

ঘরে ত কিছুই নাই।

হরিমতী ঘরের মধ্যে এদিক-ওদিক তাকায়। ভিতরটায় বার দুই তিন চোখ বুলাইয়া নেয়। পিছনের বেড়ায় গোঁজা ছোট্ট লাল একখানা চিরুনির উপর চোখ পড়ায় বলে, দে, ঐখান দে।

সামান্য জিনিস, দামও অল্প, কিন্তু চিরুনিখানা গোলাপীর বড় শখের। নৌকা বাজেয়াপ্ত হওয়ার আগের বার গোকুল তার জন্য আনিয়াছে। উপরে সোনালী অক্ষরে লেখা, 'পতি পরম গুরু'।

গোকুল চিরুনিখানা তার হাতে দিয়া বলে, জানিস্ এর দাম কত?

গোলাপী হাসিয়া কহিল, অমূল্য।

তোর লগে আর পারার জো নাই, ছেমড়ী। এই জন্যই মাইয়া লোকেরে বিদ্যা শিখাইতে নাই, তোরা হইলি ছলনাময়ী—বলিয়া গোকুল তাকে বুকে জড়াইয়া ধরে।

সেই অমূল্য বস্তু ছাড়িতে গোলাপীর আজ কষ্ট হয় খুবই। কিন্তু হরিমতীর অভিশাপের ভয়ে সেখানা আনিয়া তার হাতে দিয়া বলে, কিছু সময় দাও, দিদি।

হরিমতী বলিল, বেশ, দিলাম এক মাস। সুদ কাটান যাবে না কিন্তু।

আরও এক মাস দেও।

হরিমতীর আশঙ্কা ছিল খালি হাতে ফিরিতে হইবে। তাহা না হওয়ায় সে খুশী মনেই আরও পনর দিন সময় দিল।

সে চলিয়া গেলে গোলাপী চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। তার ধারণা ছিল বাড়ির খাজনা ও মানিকের পাঠশালার মাহিনা ছাড়া আর কোন দেনা নাই। কিন্তু স্বামী যাওয়ার পর কয়দিনের মধ্যেই এ কী!

ধার করা ত দূরের কথা, তাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া গোকুল একটা পয়সাও খরচ করিত না। কিন্তু হরিমতীর পাওনার কথা ত কখনও বলে নাই। ঐরূপ দেনা কি তবে আরও আছে?

দেনা অবশ্য তারই জন্য। কিন্তু গোলাপী ভাবে, কি দরকার ছিল ঘটা করিয়া চিকিৎসা করাইবার? প্রমোদ ডাক্তার আর দুর্গা কবিরাজকে না ডাকিলেই হইত। পিসি টোটকা জানে, সেই টোটকা খাইয়া সে সারিয়া উঠিত।

অসুখের সময় সংজ্ঞা ছিল না বলিয়া তার নিজের উপরও রাগ হয়। জ্ঞান থাকিলে সে খরচা করিয়া চিকিৎসা করাইতে দিত না, দেনা ত নয়ই।

সময় গড়াইয়া যায়। দিনের আলো ধীরে ধীরে কমে, গাছপালার উপর ছায়ার পর্দা নামিয়া আসে। বাবুইগুলি জোড়ায় জোড়ায় বাসায় ফেরে। দূরে দেখা যায় একটা চিল। খাল ও আকালের সড়কের ওপারে গভীর নীলিমার মধ্যে একটি বিন্দু।

গোলাপী একদৃষ্টে ঐ ফুটকিটুকুর দিকে চাহিয়া ছিল। সেটুকু কখন যে আকাশে মিলাইয়া গেল তাহা জানিতেও পারিল না।

চার

স্টাইল-ডি-সেলুনে নন্দচাকীর সঙ্গে গোকুলের আলাপ হয়। চোখ-বসা গাল-তোবড়ানো, লম্বা, রোগা এই ব্যক্তিটি জজের পেশকার। গোকুল তাকে চাকরির কথা বলিলে নন্দ জিজ্ঞাসা করিল, বাইজীর ওখানে কাজ করবে ?

তা করব কর্তা। যেখানে হউক কাজ একটা পাইলেই হয়।

দিন কয়েক পরে নন্দচাকী শহরে কোন বারবনিতার নিকট এক পরিচয়পত্র লিখিয়া দিল—

প্রিয় জুঁইফুল, তুমি একটি লোকের কথা বলিয়াছিলে। পত্রবাহককে পাঠাইলাম। লোকটি বিশ্বাসী এবং কর্মঠ। ইহাকে রাখিতে পার। ইতি
নন্দচাকী

পুঃ—রাত্রে দেখা হইবে। ভাল একটি মোরগ পাইয়াছি। ন, চা,

বেলা দশটা আন্দাজ সেলুনের মালিকের নিকট জুঁইফুলের বাড়ির পথটা জানিয়া লইয়া গোকুল রওনা হয়।

ছায়ায় ঢাকা ছোট্ট গলি। দু'পাশের ঘরগুলির বেশীর ভাগই টিনের। দালানও কয়েকটি আছে। বাড়িগুলির সামনে রাংচিতার বেড়া। প্রায় বাড়িতেই ছোট ছোট বাগান, আম জাম শিউলি জবার গাছ।

একটি বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া একটি স্ত্রীলোক গুনগুন করিতেছিল। তার গায়ের রং ফরসা, কিন্তু শুকনা ব্রণের কালো দাগে দাগে মুখখানা কুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে।

গোকুল তাকে জিজ্ঞাসা করিল, জুঁই বাইজীর বাড়ী কোন্‌টা।

স্ত্রীলোকটি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেয়। তার পরই সুর ধরে—

জুঁই চামেলি বকুল বেলি
ফুটল কত ফুল,
লুটতে মধু এল বঁধু
বনের অলিকুল।

রাস্তার বাঁয়ে একটু বাগিচা, পিছনে ধবধবে শাদা ছোট্ট বাড়ি, সম্ভ চুনকাম করা।

বাড়িটা নিঝুম, নিস্তব্ধ; কাহাকেও দেখা যায় না। সমান ভাবে ছাঁটা সামনের রাংচিতার উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে গোকুল ভাবিতেছিল বাড়ির ভিতরে ঢুকিবে, না এখানে দাঁড়াইয়া ডাকাডাকি করিবে। এই সময় ভিতর হইতে একটি তরুণী বাহির হইয়া আসে। সুশ্রী মুখ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, স্নিগ্ধ সুঠাম গড়ন, গায়ে তোয়ালে জড়ানো। তোয়ালের টকটকে লাল পাড়টা গলার উপরে মালার মত দুলিতেছে। তার এক হাতে শাড়ি ও সাবানের কৌটা আর এক হাতে জবাকুসুমের শিশি। সে জিজ্ঞাসা করিল, কাকে চাই?

গোকুল বলিল, জুঁইফুল বাইজীকে।

আমিই জুঁইফুল। কি দরকার?

আপনি নাকি লোক রাখবেন? নন্দবাবু আমারে চিঠি দিয়া পাঠাইছে।

হ্যাঁ, রাখব। তুমি থাকবে?

গোকুল বলিল, হঃ, হ্যাঁ—তার এই অপ্রস্তুত ভাব দেখিয়া জুঁইফুল একটু খুশি হইয়া কহিল, বেশ। বারান্দায় ব'স গিয়ে। আমি খালে চান করে আসি। নাইতে আমার দেরি হয় কিন্তু।

গোকুল ফটক ঠেলিয়া সবে উঠানে পা দিয়াছে এই সময় জুঁই আবার ডাকিল, শোন।

গোকুল ফিরিয়া দাঁড়াইলে বলিল, বরং বাইরেই দাঁড়াও। ভিতরে একটা কুকুর ছাড়া আছে, নতুন লোক দেখলে তেড়ে আসে।

গোকুল বেড়ার সামনে গলির মধ্যে পায়চারি করে। ভাবে নানা কথা। মনে মনে জুঁইফুলের সকল অঙ্গের কল্পনা করে—উজ্জ্বল দেহ, পরিপুষ্ট তার সকল অবয়ব। আবার মনে পড়ে গোলাপীর মাতৃমূর্তি—কুমিকে সে স্তন্য দিতেছে। গোকুল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে।

সামান্য ধান ছাড়া ঘরে আর কিছু রাখিয়া আসে নাই। তবে এই চাকরি জুটিলে আর কোন ভাবনা থাকিবে না। ছেলেমেয়ের আর তার গোলাপীর ভাতকাপড়ের সংস্থান হইবে। গোলাপী বড় ভাল মেয়ে, কত কমে সংসার চালায়। কোন দিন কোন অভিযোগ করে না, ঘ্যান ঘ্যান করে না। খাটেই বা কত, নিজে চাউল বানায়, চিঁড়া কোটে, ডাল ভাঙে। ঘরের পোতা গোবরমাটি লেপিয়া ঝকঝকে তকতকে করিয়া রাখে।

গোলাপী তার সংসারের লক্ষ্মী; সে ছিল তাই ঘরে শালের খুঁটি হইল আর কাঠের দরজা, জানালা।

এই সময় কল্পনার স্রোতে বাধা পড়িল।

এস, আমার সঙ্গে ভিতরে এস—শুনিয়া গোকুল পিছন ফিরিয়া তাকায়। দেখে পাশে জুঁইফুল দাঁড়াইয়া। ভিজা কাপড়ের মধ্য হইতে তাহার যৌবনসুষমা যেন উপচাইয়া পড়ে।

গোকুল তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে লক্ষ্য করিয়া জুঁইফুল নারীসুলভ লজ্জায় দেহের উপর কাপড়টা টানিয়া দেয়।

মনিবের সাড়া পাইয়া ভিতর হইতে একটা কুকুর ছুটিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ সামনে অপরিচিত লোক দেখিয়া মুহূর্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল, তার পরই ঘেউ ঘেউ করিতে করিতে সামনের পা দুখানা গোকুলের দুই হাঁটুর উপর তুলিয়া দিল।

জানোয়ারটার খ্যাঁচা গড়ন, হাঁড়ির মতন মুখ ও ঘোলাটে চোখ দেখিয়া গোকুল একটু পিছাইয়া যায়। জুঁইফুল ডাকে, চ্যাং।

বারান্দায় একটা পেরেকে চামড়ার বকলস ও লোহার শিকল ঝুলিতেছিল। জুঁইফুল গোকুলকে বলিল, চ্যাং দেখতে না পায় এমনি ভাবে বকলসটা নামিয়ে এনে ওর গলায় পরিয়ে দিতে পার? দেখলে কিন্তু কামড়ে দেবে। অনেককে দিয়েছে। তবে একবার বকলস পরলেই ঠাণ্ডা। সাপের ফণায় যেন ওঝার মন্তর-পড়া জল পড়ল।

কাজটা সুখকর নয়। গোকুল প্রথমে ইতস্তত: করে। কিন্তু একটি সুন্দরীর সামনে পৌরুষ দেখাইবার সুযোগও ছাড়িতে চায় না। বিশেষতঃ সে জানে এই বকলস পরানোর উপর তার চাকরি নির্ভর করিতেছে।

বকলস নামাইয়া সে অতি ক্ষিপ্রতার সহিত চ্যাং-এর গলায় পরাইয়া দিল। চ্যাং না জুঁইফুল, কে ইহাতে বেশী বিস্মিত হইল বলা যায় না। চ্যাং পরাজিতের কাতর দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া রহিল। জুঁইফুল বলিল, তোমার বাহাদুরি আছে বলতে হবে। এমনটি আর কেউ পারে নি।

গোকুলের মুখখানা খুশিতে ভরিয়া ওঠে।

এই বার থেকে চ্যাং তোমার বশ হয়ে গেল। একটু ব'স। আমি কাপড় ছেড়ে আসছি, বলিয়া জুঁইফুল ভিতরে যায়।

গোকুলের সেই দিনই চাকরি হইল।

ঘোর সন্ধ্যায় নন্দচাকী আসিয়া উপস্থিত। তার বাঁ হাতে ঠ্যাং-বাঁধা একটা মুরগী, ডান হাতে বাঁধা কপি ঝুলিতেছে। মুরগীর কোঁকর কোঁ শুনিয়া প্রথমেই চ্যাং ছুটিয়া আসে। নন্দ বলে, স্টপ. ডিয়ার চ্যাং।

গোকুল কাছেই ছিল। নন্দ বলিল, ধর্, এই মুরগীটে এখুনি বানিয়ে দিতে হবে কিন্তু।

মুরগী বানানো যে কি বস্তু গোকুল তাহা বুঝিতে পারিল না। তার হাবভাব দেখিয়া নন্দ বলিল, হাঁ করে রইলি যে? এই বিদ্যে নিয়ে জুঁইর সার্ভিস করবি? এ হচ্ছে জজ মাজেষ্টারের আড্ডা, হেঃ হেঃ—

বাইজী-বাড়ির চাকরির স্বরূপ দেখিয়া গোকুল মোটেই খুশি হইতে পারিল না। এতদিন ছিল স্বাধীন জীবন, মুক্ত আকাশের নিচে খালে বিলে নদীতে নৌকা বাহিত। নিজেই ছিল সেই নৌকার মালিক। আর আজ?

নন্দ বলিল, কি ভাবছিস হাঁ করে? যা, বাইজীর কাছ থেকে ছুরি নিয়ে আয়।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গোকুলের পাশ হইতে জুঁইফুল বলিল, মুরগী বানাতে জান না বুঝি? এস দেখিয়ে দিচ্ছি।

সে মুরগীর কণ্ঠনালীতে ছুরির একটা পোঁচ দিয়া ছাড়িয়া দেয়। প্রাণীটা বার দুইতিন শব্দ করিয়া ডানা ঝটপট করিতে করিতে আট দশ হাত দূরে যাইয়া এলাইয়া পড়ে। তার চোখ বাহির হইয়া আসে। সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হইয়া যায়।

নন্দ বলে, যা কেটেছ মাইরি, একখানা ক্রেঞ্চকাট। আমি লাট সাহেব হলে তোমায় বরিশালের জজ করে দিতুম। নিদেন এডিশনাল। হেঃ হেঃ—

জুঁইফুলও সেই হাসিতে যোগ দেয়। নিজের হাতে প্রাণীটার ছাল ছাড়ায়; টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটে।

নন্দ গোকুলকে বলিল। দেখলি ত মুরগী বানানো কাকে বলে?

গোকুল কোন উত্তর করে না।

নন্দ জুঁইকে প্রশ্ন করিল, আজ রামপাখীর সঙ্গে পোলাউ হবে, না পরোটা?

জুঁই বলিল, তোমার যা খুশি।

গোকুল তখন ভাবিতেছিল, গোলাপী কি কোন প্রাণীর গলায় এমন করিয়া ছুরি চালাইতে পারিত? কণ্ঠনালী একটু কাটিয়া মুরগীটাকে ছাড়িয়া দেওয়া, তারপর তার যন্ত্রণা দেখিয়া হাসাহাসি!

কী নিষ্ঠুর! না, না গোলাপী ইহা পারিত না।

ভবিষ্যতে প্রায়ই তাকে এই কাজ করিতে হইবে ভাবিয়া তার মনমেজাজ খারাপ হইয়া গেল।

পাঁচ

গোকুল টাকা পাঠাইয়াছে। টাকা মাত্র নয়টি, কিন্তু উহাই তার পুরা মাসের মাহিনা। নিজের জন্য সে একটি পয়সাও রাখে নাই। সারা মাস কাটাইবে কেমন করিয়া? ধোপা নাপিত আছে, জলখাবার আছে, তার উপর তামাক না হইলে তার চলে না।

স্বামীর স্নেহে, ত্যাগে গোলাপী মুগ্ধ হইয়া যায়। বাইজীর বাড়িতে তার চাকরির জন্য ক্ষোভটুকুও মনে থাকে না

সে ভিটার খাজনা বাবদ দুইটি টাকা দিয়া মানিককে ফুটু ভুঁইয়ার বাড়িতে পাঠাইয়া দিল। ফুটুর কাকা রামনাথ টাকা দুইটি রাখিল কিন্তু রসিদ দিল না। মানিক আসিয়া বলিল, রামু ভুঁইয়া কইছে, কাল তোর লগে দেখা করবে। কি যেন দরকার আছে।

গোলাপী বলিল, দরকার আবার কি?

পরের দিন রামনাথ আসিলে সে বলিল, কাল খাজনার টাকা রাখছেন, রসিদ দেন নাই ত।

আমার তহরিটা পেলেই রসিদ দেব। লিখে এনেছি।

তহরি কি?

তুমি জান না দেখছি। জানবেই বা কি করে? ওটা আদায়ের খরচা। টাকা প্রতি দশ পয়সা।

আদায় করেন ত আপনারা—আপনি, আপনার ভাই।

তার কি খরচা নেই? খাতাপত্র কত কি!

গোলাপী বলিল, ছাওয়াল মাইয়া লইয়া বড় বেঘোরে পড়ছি। আমায় মাফ করুন।

খালি কি তহুরি? আমাদের আবও পাওনা আছে। বছরে দুদিন বেগার।

আমার ঐ একরত্তি ছাওয়াল। ও বেগার দেবে কি করিয়া?

বেশ তুমিই দাও।

আমি! আপনে এ কন কি?

এই ধর, আমাদের চাল বানিয়ে দেওয়া, মুড়ি ভাজা, ঘরের পোতা বাঁধা।

গোলাপী চুপ করিয়া রহিল। রামনাথ বলিল, সব ছাড়লে আমাদেরই বা চলে কি করে? আচ্ছা—

সে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া মানিক বলিল, আমাগো রসিদ?

রসিদের জন্য ভাবনা কি? আমার কাছে আর তোদের কাছে থাকা একই কথা।

সে রসিদ না দিয়াই রওনা হইল। মানিক বলিল, ভুঁইয়া, আপনারে দেখতে চ্যাং-এর মতন।

রামনাথ বলিল, চ্যাং! হোয়াট্ চ্যাং?

ও কিছু নয়, আপনি রসিদটা দিয়া যান, বলিয়া গোলাপী ছেলের দিকে কটমট করিয়া তাকায়।

তোমার ছেলেটা বড় বেহায়া হয়েছে। বেহায়া, ফাজিল। ছোট-লোকের লেখাপড়া করার বিপদ ঐখানে।

সে চলিয়া গেলে গোলাপী মানিককে ধমকায়—দেখ্, সব কথায় তুই থাকবি না।

মানিক বলিল, কেন বাবাই ত লেখছে, চ্যাং দেখতে রামু ভুঁইয়ার মতন।

সত্যই তুই বড় ফাজিল।

বেশ, আমার পাঠশালার মাইনা দে। কোন কথায় আর আমি থাকব না।

একটু রাগিলেই মানিক মাহিনার খোঁটা দেয়। কখনও বা বলে, ভারি ত মা, মাইনা দিতে পারে না, কাপড় দেয় না, খুদ আর শাক সেদ্ধ খাওয়ায়।

গোলাপী জানে ছেলের চাহিদা মিটাইতে না পারিলে এরূপ জবাব শুনিতেই হইবে। তবুও এক এক সময় সে ধৈর্য হারাইয়া ফেলে, রাগিয়া যায়।

কিন্তু আজ দুশ্চিন্তাই হইল বেশী। রামনাথ রসিদ দিল না। ভবিষ্যতে এই জন্য কি বিপদে পড়িতে হইবে, কে জানে?

হরিমতীর বাড়িতে সুদ দিতে যাইয়াও গোলাপীকে গালাগালি শুনিতে হইল। হরিমতী বলিল, এও এক ঢং, নতুন কায়দার জুয়াচুরি। এক বছরের সুদ পাওনা, নিয়া আইছ দুই মাসের।

তার শাপের ভয়ে আরও একমাসের সুদ দিয়া গোলাপী কোন রকমে তার হাত হইতে উদ্ধার পাইল।

পাঠশালার গুরুমহাশয়ের নাম শীতল চক্রবর্তী। লোকে ডাকে পণ্ডিত মশাই। তাঁর কাছে আর যাইতে হইল না। পিওন গফুরের নিকট মানিকের টাকা আসিয়াছে শুনিয়া তিনি নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোলাপীও তাঁর ছাত্রী। সে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলে শীতল আশীর্বাদ করিলেন, ছেলেপুলে নিয়ে সুখে থাক মা।

মানিকের পাঠশালার মাহিনা বাকী অনেকদিনের, কিন্তু দু'মাসের মাহিনা পাইয়াই শীতল খুশি মনে বলিলেন, কাল থেকে মানিক যেন পাঠশালায় যায়।

গোলাপী বলিল, আর কি পারব পড়াইতে?

দেখ চেষ্টা ক'রে। গোকলোরও ত চাকরি হ'ল। পড়াতে পারলে মানিক একদিন মানুষ হবে। মুকুন্দ-হাই ছাড়া এ রকম ছেলে আর একটিও পড়াইনি।

পরগণার হাই স্কুলের হেড মাষ্টারের নাম মুকুন্দ, লোকে বলে মুকুন্দ-হাই। ছেলের প্রশংসায় খুশি হইয়া গোলাপী গাছের কয়েকটা লঙ্কা ও বেগুন আনিয়া তাঁর হাতে দেয়।

তোমার মাচার লাউগুলো হয়েছে গাবিন গরুর ওলানের মতন— বলিয়াই শীতল লজ্জায় জিভ কাটেন।

গোলাপী তাঁকে দুইটি লাউও দিল। তিনি চলিয়া যাইতেছিলেন এমন সময় মানিক কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, লাল ফিতা কি পণ্ডিত মশাই?

শীতল কহিলেন, কাগজে পড়েছি বটে, কিন্তু মানে ঠিক জানি না।

গোলাপী বলিল, মোক্তার প্রমোদ বাবু লেখছে, আমাগো নৌকার টাকা আটকাইছে সরকারী লাল ফিতায়। কী লড়াই যে লাগল!

নৌকার খেসারত শুনলাম কেউই পায়নি। আমাদের পাঠশালা, মক্তবের সাহায্যও হয়ত ঐ ফিতায়ই আটকেছে। আমি সরকারী টাকা পাই না আজ এক বছর।

সেই দিনই অবশিষ্ট টাকা দিয়া গোলাপী ধান, নুন ও হলুদ কিনিল। সরিষার তৈল কিনিল মাত্র আধ সের। ইচ্ছা ছিল কিছু ডালও কিনিয়া রাখে। কিন্তু পয়সায় কুলাইল না।

সমস্ত খরচার হিসাব দিয়া সে গোকুলকে এক পত্র দিল। লিখাইল মানিককে দিয়া।

—মাহিনার সব টাকা পাঠাইবা না। নিজের খরচা রাখিবা। চার বেলা ভাত খাওয়া তোমার অভ্যাস। ভাত না পাও, অন্ত কিছু খাইবা। মাথার কিরা জানিবা।

মানিক নিজে লিখিল, তোমায় খুব ভালবাসি, বাবা। তোমার জন্য মন কেমন করে। কুমি বলিল, সেও বড় ভালবাসে।

চ্যাংকে আমার ভালবাসা দিও। তাকে আমি খুব ভালবাসি, প্রায় কালীর মতন। কালীর বাচ্চাগুলা দেখতে বেশ হইছে। টুকটুক করিয়া হাঁটে। তার একটা বাচ্চা অমূল্যকে দিলাম। দু'জনে মিলিয়া বাচ্চাটার নাম রাখলাম করালী। বেশ নয়, বাবা?

পণ্ডিত মশাইকে দুই মাসের মাহিনা দিয়াছি। আবার পাঠশালায় যাইতেছি।

ইতি

আং মানিক

পুঃ—পণ্ডিত মশাই সে দিন বলিলেন, মুকুন্দ-ভাই ছাড়া আমার মতন ছাত্র আর পড়ান নাই।

ছয়

গোকুলের কাজ জুঁইফুলের বাজার করা, বাবুদের ফরমাশ খাটা, মদ ও খাবার আনা, সোডার বোতল ভাঙা। কখনও গাড়ী ডাকিয়া মাতাল বাবুদের চ্যাংদোলা করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিতে হয়।

প্রথম প্রথম এই কাজ তার ভাল লাগিত না। নূতন এই জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে কিছুটা সময় লাগিল।

ঘরের ভিতর আমোদপ্রমোদ চলে। চলে গান বাজনা, হৈ হল্লোড়। সে বাহিরের প্রায়ান্ধকার বারান্দায় একলা বসিয়া থাকে, কখনও বা সঙ্গে থাকে চ্যাং। সে বসিয়া বসিয়া ভাবে নিজের অতীত জীবনের কথা, মধুমতী, ধলেশ্বরীতে নৌকা বাওয়ার কথা। বড় বড় নদীতে ঢেউয়ের উপর নৌকা ছাড়িয়া দিত, এক হাতে থাকিত হাল, কখনও আর এক হাতে হুঁকা। হাল বাহিতে বাহিতে সে গাহিত,

হালে না পাই পানিরে ভাই
হালে না পাই পানি,
চলছি তবু বাইয়া আমার
সাধের তরী খানি।

"মার জোয়ান হেঁইও" বলিয়া সে বুকে হাল চাপিয়া ধরিত।

কাজে ভুলচুকও হইত খুব। সোডার বোতল ভাঙিয়া যায়, বাবুরা দোপেঁয়াজী আনিতে বলিলে বড় বড় ছুইটা পেঁয়াজ লইয়া আসে। তারা কেহ হাসে, কেহ বা রাগ করে।

কাজটা ভাল লাগে না। কিন্তু জুঁইফুলের জন্য চাকরি সে ছাড়িয়া দিতে পারে না। খাসা মেয়ে জুঁইফুল, শ্যামবর্ণ, উজ্জ্বল শ্যাম, নিটোল গড়ন, হাসি হাসি মুখ। মদ খাইলে মুখখানা লাল হইয়া ওঠে—লালচে গোলাপী। ভাষা ভাষা চোখ দু'টি আরও বড় দেখায়। গোকুল মুগ্ধ নয়নে দেখে।

ঘরের ভিতর হইতে জুঁইফুলের কল কল হাসি ভাসিয়া আসে, উজান বাওয়ার সময় নৌকার তলায় নদীর জল যেমন ছল ছল শব্দে বাজিত ঠিক তেমনি।

মাঝে মাঝে গোকুলের ডাক পড়ে, কখনও বা চ্যাং-এর। কুকুরটার স্বাধীনতা তার চেয়ে অনেক বেশী। সে বাড়িময় ঘুরিয়া বেড়ায়, জুঁইফুল বাবুদের গান শুনাইতেছে, চ্যাং ঘরে ঢুকিয়া তার গা শোঁকে, কখনও বা তার কোলে বসে। সে আদর করিয়া ডাকে, চ্যাং, চ্যাং, চিং, চুং, চেং—যেন জলতরঙ্গের মিষ্টি বোল।

জুঁইফুলকে খুশি করার জন্য বাবুরা তাকে রুটি ও মাংসের টুকরা দেয়। নন্দ চাকী ডাকে, ডিয়ার চ্যাং বলিয়া। না ডাকিলে গোকুল কিন্তু ঘরে ঢুকিতে পারে না। কুকুরের এই সৌভাগ্যের জন্য তার হয়ত ঈর্ষা হয়।

ক্রমে ক্রমে তার চরিত্রের পরিবর্তন হয় নানা রকমে। জুঁই-ফুলের চোখে নিজেকে সুন্দর করিয়া তুলিবার জন্য সে রোজ দাড়ি কামায়, ধোপদোস্ত কাপড়জামা পরে, মাসে দু'বার সেলুনে চুল ছাঁটে, পায়ে দেয় নিউ-কাট সেলিম। ব্যয় বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে আয়ও বাড়াইয়া তোলে।

আগে দোকানীদের নিকট সে দস্তুরি নিত না। পতিতালয়ের চাকরের বিশেষ প্রাপ্য মনে করিয়া বলিত, দস্তুরটস্তুরে আমার দরকার নাই। ক্রমে ক্রমে দস্তুরি নিতে শুরু করিল, তারপর আরম্ভ করিল বাবুদের ঠকাইতে।

এর জন্য তাদেরও দায়িত্ব ছিল অনেকখানি। একটা কিছু কিনিয়া আনিলেই বাবুরা জিজ্ঞাসা করিত, দস্তুরি পেলি কত? ওজনে ঠকাস্‌নি ত, কাট্‌লেটটা চেটে এনেছিস না কি?

সে তখন চুরি করিত না অথচ বাবুরা ভাবিত চোর। গোকুল মনের ক্ষোভে এক একবার চ্যাংকে বলিত, ভ্যালারে ভ্যালা, চাকরি আমারে চোর না বানাইয়া ছাড়বে না। চ্যাং উত্তর করিত, ঘেঁউ ঘেঁউ।

সে যেন বলিত, মানুষ এমনি করেই মানুষকে চোর বানায়।

এই কুকুরটার সঙ্গে গোকুলের অন্তরঙ্গতা দিন দিন বাড়িয়া ওঠে। গোকুল তাকে আদর করে, তার গলার নিচে হাত বুলায়। কুকুরটাও আনন্দে তার গায়ে থ্যাঁদা নাক ঘষে। ঘরের ভিতর চলে গানের মজলিস আর উহারা দু'টিতে বারান্দায় এক স্বতন্ত্র জগৎ গড়িয়া তোলে।

ক্রমে ক্রমে গোকুলের বাড়িতে টাকা পাঠান বন্ধ হয়। তারপরে বন্ধ হয় চিঠি। গোলাপী কাতর ভাষায় তার নিকট অভাব-অভিযোগ জানায়। লেখে, ছাওয়াল মাইয়ারে তুমি এমন করিয়া ভোলবা, এ ত ভাবি নাই।

একখানায় লিখিল, তুমি কি বাইজীর মায়ায় পড়িয়া সব ভোলছ? শুনছি তারা মন্তর জানে, পুরুষেরে তুকতাক করে। ঐ আবাগীর মায়া কাটাইয়া তুমি ঘরে ফিরিয়া আইস। ঐ চাকরির দরকার নাই। আমরা বরং উপাস করব।

চিঠিখানা জুঁইফুলের হাতে পড়িলে সে উহা পড়িয়া একটু হাসিয়া গোকুলকে বলিল, গেরস্তের বউগুলো বড় বোকা হয়। আরে, উপোস করে কি ভালবাসা টেকে? হেঃ হেঃ।

এই হাসি গোকুলের ভাল লাগিল না। কিন্তু সে শুধু ক্ষণিকের জন্য।

একদিন জুঁইফুল নন্দকে বলিল, তুমি গোঁফ রাখতে পার না, চক্রী? গোঁফ না থাকলে পুরুষকে মানায় না।

খুশি হইলে নন্দকে সে ডাকে চক্রী বলিয়া।

সেইদিন হইতে নন্দ ও গোকুল দু'জনেই গোঁফ রাখিল। গোকুল দিনে পাঁচবার আয়নায় মুখ দেখে, গোঁফে পমেড মাখে, কাঁচি দিয়া গোঁফের ডগা ছাটে। ষ্টাইল ডি সেলুনের মালিক মাহীন এ-সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। মধ্যে মধ্যে তার মত নেয়, কি করলে গোঁফ জোড়া ভাল মানায়, কও দেখি?

মাহীন বলে, দু'দিকে উঁচু করে দাও। নাকের দু'ধারে দু'টো চুড়োর মতন।

নন্দ গোকুলের গোঁফ রাখা পছন্দ করে না। মনে করে চাকরের এই রকম গোঁফ রাখার কোন অধিকার নাই। একদিন নেশার ঘোরে সে বলিল, তুই বেটা গোঁফ রেখেছিস যে! তোকে কি কেউ গোঁফ রাখতে বলেছে?

গোকুল বলিল, এই গোঁফ বাবা তারকনাথের মানত। স্বপ্নে আদেশ হইছিল।

আদেশ হয়েছিল না হাতী—নন্দ রাগে গস্ গস্ করে।

জুঁইফুল হাসে। নন্দ চলিয়া গেলে বলে, বেশ জব্দ করেছ।

পতঙ্গের কাছে টকটকে লাল অগ্নিশিখার মতন পাড়াগাঁয়ের এই মাঝির কাছে জুঁইফুলের আকর্ষণ দিনের পর দিন দুর্বার হইয়া উঠিতে লাগিল।

গোকুলের চিঠি বন্ধ হওয়ায় গোলাপী ভাবে কি হইল মানুষটার? যে এত ভালবাসিত সে এমনি করিয়া সব মুছিয়া ফেলিল! কাজের ফাঁকে ফাঁকে তার মন এক একবার হুহু করিয়া ওঠে। রাগ হয় যুদ্ধের উপর, জুঁই বাইজীর উপর। মনে হয় কত তার বয়স, কেমন চেহারা, কি জাদু সে জানে যার বলে তার স্বামীকে এমন ভাবে বশ করিয়াছে?

মানিক ডাক-পিওনকে দেখিলেই জিজ্ঞাসা করে, গফুর দাদু, আমাগো চিঠি আইছে?

পক্বশ্মশ্রু গফুর বলে, না দাদু চিঠি আইলে আমি আগে যাব তোমাগো বাড়ি, আমার মাইয়ারে কইও।

গোলাপী গফুরের মেয়ে পরিবানুর সঙ্গে পড়িয়াছে, খেলা করিয়াছে। পরিবানু খুব অল্প বয়সে মারা যায়। সেই হইতে গফুর গোলাপীকে ডাকে 'আমার মাইয়া'।

গোলাপীও জানে তাদের চিঠি আসিলে গফুর চাচা আর এক মুহূর্ত দেরি করিবে না। তবুও এক এক দিন সে বৃদ্ধের প্রতীক্ষায় খাল-ঘাটে বসিয়া থাকে। প্রতি দিন সন্ধ্যার সময় গফুর ডাকের ব্যাগ কাঁধে ঝুলাইয়া আকালের সড়ক দিয়া পশ্চিম দিকে যায়। গোলাপী খালের ঘাট হইতে ব্যাগ দেখে। তার মনে হয়, কী রহস্যময় ঐ জিনিসটা! কত লোকের কত খবরই না উহাতে আছে, কত টাকা। নিজের অজ্ঞাতে এক এক দিন সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

গৌরীগ্রাম কিন্তু গোকুলের খবর রাখিত। বরিশাল কাছেই; এই অঞ্চলের লোক প্রায়ই সেখানে যাতায়াত করে। কেহ আসিয়া তার বাবুয়ানির গল্প করে। কেহ বা বলে, মাইয়া মানুষের পীরিতে পড়িয়া গোক্‌লা গোঁফ যা একখানা রাখছে! কিন্তু কথাগুলি গোলাপীর কানে ওঠে না।

একদিন টাকার তাগাদায় আসিয়া হরিমতী উপদেশ দিয়া গেল, বয়স ত হইল আর কেন? এখন হইতে দাঁতে মিশি দে। না হইলে দন্ত রসা হবে।

যাকে পায় তাকেই সে দাঁতে মিশি দিতে পরামর্শ দেয়।

গোলাপী উত্তর করিল, ঘরের একজনে দাঁতে মিশি দেওয়া পছন্দ করে না।

হরিমতী বলিল, কেডা, গোকুল? হেঃ হেঃ—

গোলাপী বলিল, কেন কি হয়েছে তার?

না রে হয় নাই কিছু, পুরুষের মনের কথা ভাবতেছিলাম। অমন নিমকহারাম জাত।

কিন্তু তোমার ভাইরে ত জান। অত ভাল।

গোকুল সম্পর্কে হরিমতীর ভাই। সে বলিল, পুরুষের আবার ভাল মন্দ। বিশেষ করিয়া যৈবনে। অরগো যৈবন ত পিছলা ঘাট।

গোলাপীর মনে হইল হরিমতী কি যেন গোপন করিতেছে। তবু মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, আমার কোন ভয় নাই, দিদি।

হরিমতী বলিল, না থাকলেই ভাল। সে যাওয়ার সময় আবার টাকার কথা বলিয়া গেল। গোলাপী ভয়ে ভয়ে বলিল, দেখি।

আজকাল তাদের রোজ রীতিমত ভাত জোটেনা। ভাত যদিই বা জুটিল, হয়ত বিনা নুনেই খাইতে হয়।

কিন্তু তাদেরও যুদ্ধ তহবিলে চাঁদা দিতে হইবে। যমের মত এই ফণ্ডের ক্ষমা নাই। ছোট বড় বাছবিচার নাই। চৌকীদার রহম যুদ্ধের চাঁদার জন্য আসিয়াছিল।

গোলাপী বলিল, পোড়া লড়াইর জন্য আমরা উপাস করিয়া মরি। টাকা আবার পাব কোথায়?

রহম এই গ্রামেরই লোক। সে সহানুভূতিভরা কণ্ঠে উত্তর করিল, কি করব বোন, রাজা আমাগো দুঃখের কথা শোনবে না। দুসকু কি আমারই কম?

এরপর আসিল ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হারাণ। গোলাপী অনুনয়-বিনয় করিল। হারাণ বলিল, তুমি গরিব বলেই ত কম করে ধরেছি। মাত্তর টেক্সর দুগুণ। জান, আমি কত দিয়েছি, হাজার এক টাকা?

গোলাপী বলিল, আপনারা বড় লোক।

জেলায় জেলায়, থানায় থানায় তখন সরকারী লোকেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা লাগিয়াছে, সমর তহবিলের জন্য কে কত বেশী চাঁদা তুলিতে পারে। তাহাতে পুরস্কার মিলিবে, মিলিবে পদক খেতাব।

হারাণ পীড়াপীড়ি করিলে গোলাপী বলিল, আমার নৌকার টাকা পাওনা আছে, তার থা কাটিয়া নেন।

হারাণ রাগিয়া বলিল, ওসব বাজে কথা ছেড়ে দাও। ভালয় ভালয় না দাও ত একদিন পেয়াদা এসে ঘটিবাটি টেনে বার করবে। মানিক বলিল, সে সব কিছুই নাই।

হারাণ বলিল, যা আছে তাই নিলামে চড়াবে। মানিক বলিল, ঘটিবাটি সবই বেচিয়া খাইছি।

হারাণ রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

গাছের তরি-তরকারি ও তেঁতুলের বিনিময়ে মানিক আরও কিছু

দিন শীতলের পাঠশালায় পড়িয়াছিল। হঠাৎ একদিন অপমানিত হইয়া তাকে পাঠশালা ছাড়িতে হইল। এর কিছু দিন পরেই তার এক চাকরি জুটিল, ননীদের বাড়িতে গরু-ছাগলের রাখালি।

গোলাপী শুনিয়াছিল ননীর দুষ্টু এক ষাঁড় আছে। মানুষ দেখিলেই গুঁতাইতে আসে। তার মন খুঁত খুঁত করে। আবার ভাবে গরিবের এই ভয় থাকিলে চলিবে কেন? মানিকের বাপও ত রাখাল ছিল। বিবাহের পরও গরু চরাইত। একটু বড় হইয়া প্রায়ই গোলাপীকে বলিত, গরু চরান তবু সোজা, কিন্তু তোরে চরানো, ওরে বাপ।

সে বলিল, দে বাবুদের শুনছি একটা ষাঁড় আছে, খালি গুঁতায়।

মানিক বলিল, আমারে সে কিছু করে না। আমি তার গায়ে হাত বুলাইয়া আইছি।

এর মধ্যেই চাকরি শুরু করছ? ওরা দেবে কি?

এক বেলা খাওয়া দেবে, রোজ চার পয়সা জলপানি, আর বছরে কাপড় দুখানা, গামছা একখানা।

লোভনীয় প্রস্তাব। মানিক অন্ততঃ একবেলা পেট পুরিয়া খাইতে পাইবে, দু'খানা কাপড় পাইবে, একখানা গামছা। গোলাপী বলিল, বেশ, গামছাখান একটু বড় দেইখ্যা চাইয়া নিস। দরকার হইলে পরতেও পারবি।

ননীর বাড়িতে মানিককে অধিকাংশ দিনই পান্তা ভাত দেয়, সঙ্গে নুন ও পোড়া লঙ্কা। সে ঐ ভাতই চাছিয়া-পুঁছিয়া খায়। মুক্ত মাঠে গরু বাছুরের সঙ্গে ছুটাছুটি করে। সব চেয়ে আমোদ পায় দুষ্টু ষাঁড়টাকে জব্দ করিতে।

একদিন সে আবিষ্কার করিল তার গলা মিষ্টি, চেষ্টা করিলে গান

গাহিতে পারিবে। মাঠে সেদিন সে একলা ছিল। উজ্জ্বল রোদে মুক্ত বাতাসে মনটা তার গুঞ্জরিয়া উঠিল। সে গলা ছাড়িয়া আরম্ভ করিল,

গোঠে মাঠে যাই
ধবলী চরাই
কানুর প্রেমের কিবা জানি,
গোঠে মাঠে—

সেই হইতে মাঝে মাঝে একা একা গান গাহিত।

তার আর এক আনন্দ শামুকের খোলা কুড়ান, খোলা আর শামুকের মুখের ঢাকনি, সাদা, লাল, নীল নানা রংয়ের ঢাকনি। ঐগুলি বাড়িতে আনিয়া কুমির সঙ্গে দোকান দোকান খেলে। তাদের দোকানের বেসাতি হয় বরুণ ফল, হিজল ফুল, সন্ধ্যামুণি বীজ আরও কত কি। এক একদিন গোলাপীও আসিয়া তাদের সঙ্গে খেলিতে বসে। খোলা সাজাইয়া সাজাইয়া ঘর বানায়।

মানিক বলে, এই আমাগো নীড়। কি কস, মা?

গোলাপী হাসে।

উঠানে শামুকের খোলার পাহাড় জমিয়া উঠিল। মানিক মাকে বলিল, এগুলি পোড়াইয়া চুন করিয়া দে। বেচিয়া তোর জন্য একখানা চেকের শাড়ী আনব আর কুমির ফরক।

ছেলের সারল্যে মা হাসে। তার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলে, দিবি বইকি। তুই ছাড়া আর—কথাটা অসমাপ্ত থাকিয়া যায়।

মানিক বলে, দেবই ত। একটু পরে সে জিজ্ঞাসা করিল, জাত ব্যবসাই ভাল, কি কস মা?

কেডা কইছে তোরে?

সেদিন কইল পরাণ জেঠা। আমি কইতেছিলাম পড়াশুনা আর হইল না। তিনি কইল, বাউতির ছাওয়ালের আবার লেখাপড়া কি? যা, শামুক পোড়াইয়া যাইয়া চুন কর।

কেন, তা হইলে অমূল্যরে তারা পড়াইতেছে কেন?

কথাডা মনে ছিল না। যাব, কইয়া আসব যাইয়া?

না রে না। ওসব বলতে নাই। বরং চুন বেচবি কি করিয়া ক' দেখি।

বাড়ি বাড়ি যাইয়া হাঁকব, চুন চাই, নেবা চুন? খাঁটি শামুক চুন— মানিক বলিল সুন্দর সুর করিয়া।

গোলাপী একদিন চুন পোড়াইয়া দিল। উহা বেচিয়া হইল সাত আনা। মানিক বাড়ি ফিরিল পাঁচ আনার এক ইলিশ মাছ ও দু' আনার তেল লইয়া। এ বছর ইলিশ এই প্রথম।

ঘরে নুন ছিল না। নারিকেলের মালা হাতে করিয়া গোলাপী সিধুর মা সরলার দরজায় যাইয়া দাঁড়ায়। আধ মালা নুন দিয়া সরলা বলে, তোর কাছে ডাল-তেল পাওনা ছিল। মনে আছে তো?

হ দিদি।

থাকলেই হয়। ভাবলাম ভুলিয়া গেছ।

পরের দেনা আমি ভুলি না দিদি। কিন্তু করব কি?—গোলাপীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে।

সরলা বলিল, ইলিশ মাছ খাওয়ার ত বেশ শখ আছে দেখি।

অন্যমনস্ক ভাবে বাড়ি ফেরার সময় একটা গাছের শিকড়ে হোঁচট খাওয়ায় গোলাপীর হাত হইতে নুনের মালাটা পড়িয়া যায়। ঘাস ও মাটির মধ্য হইতে নুন তোলার সময় তার চোখ জলে ভরিয়া ওঠে।

সাত

গোলাপীও এখন রোজগার করে। এই সেদিনও সে হরিমতীর ধান ভানিতে নন্দীবাড়ি যাইতে চায় নাই, সঙ্কোচ বোধ করিয়াছে। আজ বাড়ি বাড়ি কাজ খুঁজিয়া বেড়ায়। কারও ধান ভানে, কারও চিঁড়া কোটে, কারও বা ঘরের পোঁতা বাঁধিয়া দেয়। কেহ ভাত দেয়, কেহ পয়সা। পয়সা অল্প হইলে ভাতই সে পছন্দ করে। বাড়িতে আনিয়া ছেলেমেয়েকে লইয়া খায়।

কাজের খোঁজ আনিয়া দেয় পিসি। এবাড়ি ও-বাড়ি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বলে, তোমাগো কি কোন কাজ আছে? গোলাপীরে দিয়া করাবা? মাইয়াটা ভারী সতী।

গোলাপী বলে, সতীর জলুস তো খুব দেখলাম।

পিসি বলে, এ আর কি দেখলি? মানুষে কত কেলেশ পায়। সতীরাই পায় বেশী, সীতা, বেউলা—

সতী বলিয়া বৃদ্ধা গোলাপীকে খুব ভালবাসে। তার বিশ্বাস তার মৃত্যুর পর গোলাপীই তার জীবনধারা বহিয়া চলিবে।

সন্ধ্যার পর গোলাপী ঢেঁকিঘরে বসিয়া মুড়ি ভাজিতেছিল। এক ধারে বাঁশের সঙ্গে কুপি জ্বলিতেছে আর এক ধারে মুড়ির পাহাড়।

কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশে মেঘের পর মেঘ ওড়ে, হিমেল হাওয়া বয়, আলোর শিখা কাঁপে।

কাল গগনের বাড়ি কি একটা কাজ, ভোরে মুড়ি চিঁড়া পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। গগনের টাকা পাইলে কাপড় কিনিবে। একখানা কাপড়ের খুবই দরকার, কিন্তু আজ আবার সদর হইতে প্রমোদ মোক্তারের চিঠি আসিল। টাকার জন্য সে ঘন ঘন তাগিদ দেয়।

গোকুলের বাজেয়াপ্ত নৌকার খেসারতের জন্য তদ্বির করিয়াছিল, পাওনা সেই বাবদ। অথচ গোকুল বলিয়া গেল মোক্তারের এক পয়সা পাওনা নাই। এবার চিঠি আসিয়াছে গোলাপীর নামে, টু ওয়াইফ অব গোকুল বাউতি।

বারবার তোমার স্বামীর নামে পত্র দিয়াছি। উত্তর না পাইয়া তোমার কাছে লিখিলাম। তোমরা আমার প্রাপ্য কিছুতেই দিতেছ না। পত্রপাঠ টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে। তোমাদের নৌকার টাকা সরকারী লাল ফিতায় আটকাইয়াছে, ইহা আগেও জানাইয়াছি। ঐ টাকা পাইতে সময় লাগিবে, হয়ত বা কিঞ্চিৎ উৎকোচ। সেই সময় মহামান্য সম্রাটের সমর তহবিলে কিছু দিতে হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর ঐ তহবিল কমিটির সভাপতি, কমিটিতে আমিও আছি।

নৌকার ব্যাপারে কোর্ট ফি, মোহরানা, আমার ফিশ ও নানাবিধ খরচা বাবদ আমার সর্বসাকুল্যে আঠাশ টাকা নয় আনা পাওনা হইয়াছিল। তন্মধ্যে গোকুল আমার সেরেস্তায় একুশ টাকা উসুল দিয়াছে। বর্তমানে আমার পাওনা সাত টাকা নয় আনা। ইহার হিসাব তাহাকে দিয়াছি। ফিতার নটখটির জন্য আমি দায়ী নই। আমার পাওনা সত্বর উসুল দিবে। জানিবে উকিল মোক্তার ব্যারিষ্টার ও পুলিসের টাকা কাহারও হজম হয় না। ইচ্ছা হইলে তোমাদের ক্ষতিপুরণের টাকা আদায়ের জন্য আমার নামে মোক্তারনামা দিতে পার। ঐ বাবদ লাগিবে দুইটাকা পনর আনা। আশা করি ভাল আছ। অত্র মঙ্গল।

ইতি

প্রমোদ সেন

মোক্তারের বাড়ী গৌরীগ্রামে। সবাই জানে মক্কেলের কাজে সে ফাঁকি দেয়, লোককে ঠকায়। তবুও সদরে এই অঞ্চলের কোন

উকিল মোক্তার না থাকায় অশিক্ষিত চাষা-ভুষারা তার কাছেই যায়।

গোলাপী প্রমোদের চিঠিতে ভয় পাইয়াছিল। তার দুর্ভাবনার আর অন্ত নাই। স্বামী বিদেশে যাওয়ার পর হইতে চিন্তাভাবনা ছায়ার মত তার নিত্য সঙ্গী।

সে কড়াই-এর ভিতর মুড়ির চাল নাড়ে আর সাতপাঁচ কত কি ভাবে। মাঝে মাঝে উনানে শুক্‌না পাতা ও খড়কুটা গুঁজিয়া দেয়। ঐগুলি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে, আগুনের লাল আভা আসিয়া পড়ে তার মুখের উপর।

ভীম অন্ধকার ভাঙিয়া আসিয়াছিল। উঠানে আসিয়া প্রথমেই দেখিল গোলাপীর রক্তাভ মুখ, তার উপর ঘামের ছোট ফোঁটা, লাল গোলাপের উপর শিশির কণার মতন।

ভীম মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে, হয়ত চোখের কয়েক পলকের জন্য। তারপরই ডাকে, গোলাপ বৌ।

.গোলাপী হঠাৎ চমকিয়া উঠিল, পরক্ষণেই বলিল, ওঃ, ঠাকুরপো। তুমি না উলপুর গেছিলা?

হুঁ, কাল আইছি। পথে মণিদার সঙ্গে দেখা করিয়া আইলাম।

তিনি আছে কেমন?

ভাল না। বেশী দিন আর বাঁচবে না।

বড়দি?

তিনি খুব মোটা হইছে।

কি কইলেন তারা?

মণিদা আর বৌ ঠারইন দুজনেই ভিটার জন্য দুঃখ করল। মণিদা মানিকরে দেখতে চাইছে। তিনি কইল মাইনকা বংশের পিরদিম।

ভাইর কথা কইলেন না?

কইল, গোকুল উধাও হইছে, তা হৈলে ত বৌমার বড় কেলেশ। তার উপর এই বাজার।

তিনি আমার চিঠি পাইছে, যে চিঠিতে ভিটার খাজনার কথা লেখছিলাম ?

পাইছেন। মণিদা কয়, যারা ভিটা ভোগ করে, খাজনা দেবে তারা। আমি যে কিছু চাই না সেইত যথেষ্ট।

গোলাপী বলিল, ভোগ ত করি খুব। সাপ শিয়াল নিয়া বাস্তব্য করতে হয়।

মণিদা আরও কইল, তোমরা তানার ভিটার গাছপালা জল সব বেভার কর। তোমারগো উচিত ছিল ছোট রাণীরে রাখা। কিন্তু তা ত রাখলাই না, বরং তানারে খেদাইয়া দিলা।

গোলাপী বলিল, এও পারল কইতে? যাউক জলটা কিসের শুনি।

খালের যে জায়গা বাঁশ দিয়া ঘেরছ, তারও ত অর্ধেক তানার।

গোলাপী একটু হাসিয়া বলিল, রদ্দুর আর বাতাসের ভাগের কথা কন নাই ?

আজ ভাসুর ছোটরাণীর গৃহত্যাগের জন্য তাকে দায়ী করেন অথচ এই জা-টিকে সে বরাবরই সাধ্যমত সাহায্য করিয়াছে। তার চেষ্টা ছিল ছোটরাণী যাতে ঘরছাড়া না হয়।

মণিরামের এই স্ত্রীটির ইতিহাস বড় করুণ। মণিরাম রয়ানির গান (মনসার গান) গাহিয়া সংসার চালাইত। নিজে গান বাঁধিত, গাহিতও বেশ। রোজগার মন্দ ছিল না। কিন্তু প্রায় সব টাকাই শুঁড়ির দোকানে দিয়া আসিত।

প্রথমা স্ত্রীর সন্তান না হওয়ায় সে দ্বিতীয় বার বিবাহ করে। আদর করিয়া এই বৌকে ছোটরাণী বলিয়া ডাকিত। বলিত,

তালুকদারি জমিদারি না থাউক, পদ্য বাঁধতে পারি ত। সেই শক্তির ওয়ারিশান রাইখ্যা যাইতে চাই। লোকে কবে, মনিরামের ছাওয়াল গাইতেছে, বাপের বেটা।

ছোট রাণীর নামকরণের সঙ্গে সঙ্গে বড় বউরও নূতন নাম হইল বড় রাণী। দুই রাণীতে ঝগড়া লাগিয়াই থাকিত। বন্ধুরা বলিত, এই সব সহ্য কর কি করিয়া কবিদার? মণিরাম হাসিয়া বলিত, কবিরা পারে সব, বিশেষ করিয়া ইস্ত্রি ঘটিত ব্যাপারে।

ছোট রাণীও তাকে কাব্য শক্তির কোন ওয়ারিশান উপহার দিতে পারিল না। কবি স্থির করিল, তৃতীয় সংসার করিবে। পাত্রীও স্থির হইল ফেন্টু দাশের মেয়ে আলো। কিন্তু ঘরে আলো আসার আগেই মণিরামের বাতব্যাধি হয়, এক দিক অবশ।

কিছুদিন অর্ধাশনে থাকার পর ছোট রাণীকে ভিটায় ফেলিয়া সে বড় বৌর বাপের বাড়ি চলিয়া যায়। ছোটকে বলে, বড় রাণীর ভাইরা লোক ভাল। কিন্তু শত হইলেও সতিনের কুটুম। তুই এখন না গেলি, পরে নেওয়াব।

ছোট বৌ বলে, ঠিক ত?

মণিরাম বলে, তোরে কি ভোলতে পারি পাগলী? মা মনসার কিরা, তোরে আমি নেওয়াব।

ছোট বৌর যাওয়ার মত জায়গা ছিল না। ভিটায় পড়িয়া ক্ষুধায় কষ্ট পাইত। কিন্তু একটিও শব্দ করিত না।

গোলাপী তাকে ভালবাসিত। নানা ভাবে সাহায্য করিত। গোকুল উহা পছন্দ করিত না। সে বলিত, ছড়া বাঁধিয়া মণি-দা আমার জমিজমা সব উড়াইছে আর তুমি তার বৌরে চাউল দেও!

গোলাপী বলিত, অর দোষ কি? তোমার ঘরেরই ত বউ, বিপদে পড়ছে।

বছর দেড়েক স্বামীর ভিটায় থাকিয়া ছোট রাণী এক বৈষ্ণবের সঙ্গে উধাও হইয়া যায়। গোলাপীর আজকাল প্রায়ই মনে পড়ে তার একটা কথা, পুরুষ জাত ভারী বেইমান। কথাটা গোলাপীর নিজের জীবনেও কি নিদারুণ সত্যেই না পরিণত হইয়াছে।

এই সব ভাবিতে ভাবিতে সে হঠাৎ মুখ তুলিয়া দেখে ভীম সামনে নাই। উনানও কখন যেন নিবিয়া গিয়াছে। তার কোন খেয়ালও ছিল না।

মাঝে মাঝে এরকম হয়। কাজ করিতে করিতে সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। আজ সে অন্ধকারের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। বৃষ্টি বন্ধ। আকাশে মেঘ উড়িয়া যায়—মেঘের পর মেঘ, ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতন। তার ফাঁকে ফাঁকে এক একবার ম্লান চাঁদ উঁকি মারে। আসে হিমেল হাওয়া।

আকালের সড়ক দিয়া কে একজন গাহিয়া যায়—

মেঘের লগে ওড়ে পরাণ
মেঘের লগে ওড়ে,
(আবার) আগুন দেখলে তোমার লাইগা
পোড়ে পরাণ পোড়ে—

গোলাপীর পরাণও পোড়ে। তাহার পরাণও উড়িতে চায়। মেঘের সঙ্গে দূর দূরান্তরে ভাসিয়া যাইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কোথায় যে যাইতে চায় সে নিজেও তাহা জানে না।

আট

রাত নয়টা। জেলা জজ দে সাহেব জুঁই-ফুলের সঙ্গে সবে আধ বোতল মদ শেষ করিয়াছেন এই সময় আরদালী আসিয়া খবর দিল, বড় জজ রাতকো ইষ্টিমারমে আ গিয়া।

বড জজ অর্থাৎ কলিকাতা হাইকোর্টের জজের আদালত পরিদর্শন করিতে আসার কথা সকালে বরিশাল এক্সপ্রেসে। তিনি আসিয়া পৌছিলেন রাত নয়টার পর। খবর শুনিয়াই দে সাহেব রাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন, ড্যাম ইট। মোষ্ট ডিসগাষ্টিং।

জুঁইফুল সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখে হাতচাপা দিয়া বলিল, ষ্টপ ডিয়ার জজ। হাইকোর্ট।

হাইকোর্টের নাম প্রভাবেই হোক বা জুঁইফুলের জন্যই হোক দে সাহেব চুপ করিলেন। জুঁইফুলকে বিদায় আলিঙ্গন দিয়া তাড়াতাড়ি রওনা হওয়ার সময় কোর্টের বোতামে আঁটা জুঁইফুলটি আর খোলা হইল না। তাঁর বাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জুঁই গোকুলকে বলিল, দেখলে কাণ্ড! গেল ত ফুলটা বুকে করেই নিয়ে গেল! হাইকোর্ট এতে চটবে না?

গোকুল ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকায়। একটু পরে জুঁইফুল আবার বলে, বোতল আর দেকান্তগুলো (মদের পাত্র) তুলে রেখে আমার মাথাটা টিপে দাও দেখি।

এই হুকুম আজই প্রথম। তার মাথা ধরিলে বাবুরাই টিপিয়া দেয়। কখনও দেয় সরস্বতী ঝি। সে আসে নাই। জজের বার অর্থাৎ দে সাহেবের আজ আসার দিন তাই অন্য বাবুরাও কেহ এ মুখো হয় নাই।

গোকুল ইতস্ততঃ করিতেছিল। জুঁইফুল আবার বলিল, দাঁড়িয়ে রইলে যে? কি দেখছ? আমায়? দাও না মাথাটা টিপে।

গোকুল খাটের প্রান্তে বসিয়া জুঁইর মাথা টিপিতে আরম্ভ করে। কিছুক্ষণ পরে জুঁই ঘুমাইয়া পড়ে, কিন্তু গোকুলের মাথা টেপা বন্ধ হয় না। তার অবস্থা তখন রসগোল্লার রসের উপর মাছির মত, ওঠার সাধ্য নাই।

সময় কাটিয়া যায়, গোকুলের হাত বাইজীর মাথা ও কপালের উপর হইতে ধীরে ধীরে ঘাড়ের পিছনে নামিয়া আসে। তারপর সুডৌল বাহুতে। সঙ্গে সঙ্গে দুর্বার এক ইচ্ছা শক্তি তার দেহমনকে মদের বোতলের দিকে টানিয়া নেয়। সে উঠিয়া অতি সন্তর্পণে আলমারির তলা হইতে বোতলটা বাহির করিয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া খানিকটা মদ গিলিয়া ফেলে। গলা বুক জ্বলিয়া যায়। বমি আসে বমির শব্দে পাছে জুঁইফুলের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এই ভয়ে হাত দিয়া নিজের মুখ চাপিয়া ধরে বটে, কিন্তু শব্দ চাপিতে পারে না। ভিতরটা গুলাইয়া আওয়াজ বাহির হয়—ওয়াক্ ওয়াক্।

জুঁইফুল ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল, আমি সব দেখেছি।

ভারী সুন্দর হাসি। গোকুলের মাথা ঘুরিয়া গেল। জুঁইফুল বলিল, যাও শুয়ে থাক গিয়ে।

সেই হইতে সুবিধা পাইলেই গোকুল চুরি করিয়া মদ খায়। জুঁইফুল জানে। সে বোঝে গোকুল তাকে ভালবাসে, তার জন্য সে পাগল। সে চাকর বটে কিন্তু যুবক, দেখিতে মন্দ নয়। অজীর্ণ রোগগ্রস্ত অধিকাংশ বাবুর চেয়েই শ্রীমান্, স্বাস্থ্যের দীপ্তি তার সর্বাঙ্গে জ্বল জ্বল করে, তাই এই ভালবাসায় জুঁইফুল অসুখী নয় বরং তৃপ্তিই বোধ করে।

সেলুনের মালিক মাহীন একদিন বলিল, এ কি গোকুল? বাড়িতে চিঠি দেও না, টাকা পাঠাও না? এদিকে তারা যে ভেবেই আকুল। মানিক আমার কাছে চিঠি দিয়েছে।

গোকুল বলিল, আচ্ছা লেখব, ভাই। টাকাও পাঠাব।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই শেষ। টাকা পাঠানো, কি চিঠি লেখা আর হইয়া উঠে না।

কিছুদিন পরের কথা, জজ চলিয়া গিয়াছেন। ককটেইল খাইয়া জুঁইফুলের বেশ নেশা হইয়াছে, মুখে গোলাপী আভা।

যেদিন জজের আসার কথা নন্দ চাকী সেই দিনই দুতিন রকম মদের ককটেইল বানাইয়া রাখিয়া যায়। জজ আসিলে জুঁইফুল তার মুখের কাছে গেলাস তুলিয়া ধরিয়া বলে, নন্দজ্ প্রেজেণ্ট, ডার্লিং জজ, ড্রিঙ্ক ড্রিঙ্ক।

আজকাল দে সাহেবের সামনে সে অনেক সময়েই ইংরেজীতে কথা বলে, গ্লাস গিভ্, ওয়াটার ব্রিং, এই ধরনের ইংরেজী। তাঁকে প্রশ্ন করে, আই লভ মাচ মাচ। ইউ লভ ?

নেশা হইলে জজ বলেন হিন্দী। হিন্দী জ্ঞানের গর্ব করেন, সিভিলিয়নকো হিন্দী পাশ দেনে পড়তা হায়। পাশ দেকে হামকো দো হাজার তন্‌কা বখশিশ মিলা।

বিশেষতঃ ককটেইলের পর উভয়ের মধ্যে যেন হিন্দী ও ইংরেজীর প্রতিযোগিতা লাগিয়া যায়।

এই ককটেইলের উপর নন্দ চাকীর ভরসা অনেকখানি। বর্তমান সেরেস্তাদারের অবসর নেওয়ার বেশী দেরি নাই। হঠাৎ দে সাহেব বদলী না হইলে তার সেরেস্তাদার হওয়া তখন একরূপ সুনিশ্চিত।

জুঁইফুল গুন গুন করিয়া সুর ভাঁজিতেছিল। গোকুলের মনে পড়িল গৌরীগ্রামের ঝোপে ঝাড়ে পাখীর কলকাকলির ঝঙ্কার।

কিছুক্ষণ পরে জুঁইফুল ঘুমাইয়া পড়িলে সে পাত্রের অবশিষ্ট মদটা খাইল। পরিমাণে উহা একেবারে কম নয়। তাছাড়া জিনিসটা ছিল খুব ঝাঁঝাল। অল্পেই তার তীব্র নেশা হইল।

সে চ্যাং-এর সঙ্গে বাগানে ঘোরে। সুন্দর সুন্দর ফুল ছেঁড়ে। পাতাবাহার আর রাংচিতার বেড়ার উপর হাত বুলায়, লেবুর পাতা

ছিঁড়িয়া গন্ধ শোঁকে। একবার চ্যাং-এর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, কি করি বল্ ত চ্যাং?

প্রাণীটা তার মর্মকথা যেন বুঝিল। কাটা লেজ নাড়িয়া নাড়িয়া সহানুভূতি জানাইল। বার দুই ঘেউ ঘেউ করিল। কিছুক্ষণ বাগানে ঘোরাঘুরি করিয়া তারা দুটিতে জুঁইফুলের ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়ায়। সে ঘুমাইয়া পড়ার পর এই বোধ হয় চতুর্থ বার।

জুঁইফুলের গহনাগুলি আজ আরও উজ্জ্বল দেখায়। ঝলমল করে তার সারা শরীর। গোকুল সেই দেহের উপর হইতে চোখ আর ফিরাইতে পারে না।

এই রূপের মোহ অনেক দিন হইতেই তাকে পাগল করিয়াছে। কিন্তু আজিকার অনুভূতি বড় তীব্র, ভারী উগ্র। গোকুল কাঁদিয়া ফেলিল।

নয়

ভীম মণিরামের সঙ্গে দেখা করিয়া আসার কয়েক দিন পরে তার চিঠি আসিল।

কল্যাণীয়া

বধূমাতা গোলাপসুন্দরী দাস্যা।

শ্রীমান ভীম-ভাইর মারফৎ ওদিকের সব খবর পাইয়া চিন্তাকুল আছি। তুমি যে কিরূপ ক্লেশে আছ তাহা সহজেই বুঝিতেছি। মা মনসা তোমার মঙ্গল করুন।

বর্তমানে আমার শরীরগতিক আরও খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। প্রবল অরুচি ও মাথাঘোরা চলিতেছে। হয়ত দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। আজ খালি মনে পড়ে তোমাদের কথা। বিশেষ করিয়া মানিক বাবাজীবনের কথা। সে আমাদের কুলের প্রদীপ, নীলধ্বজের যোগ্য

বংশধর। তাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা করে। ইহাই বোধ হয় আমার শেষ ইচ্ছা, কবি মণিরামের অন্তিম আকুতি। শ্রীমানকে ভাল চরণদার সহ পাঠাইও। আমি তাদের রাহাখরচ দিব। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে।

ইতি

আং পত্র

মণিরাম দাস কবিদার।

চিঠিখানি আন্তরিকতায় ভরা। বৃদ্ধ রুগ্ন জেঠা মরার আগে ভাইপোকে একবার দেখিতে চান। মানিকের প্রতি তার এই টান গোলাপী আগেও লক্ষ্য করিয়াছে। ভীমও সেদিন বলিয়াছে, মণি-দা মাইন্‌কা মাইন্‌কা করল অন্ততঃ দশ বার।

অথচ গোকুলের সঙ্গে কোন দিনই তার সদ্ভাব ছিল না। মণিরাম তাকে অবজ্ঞা করিত। গোকুল মাঝি, সে কুলী, মাথায় করিয়া পরের মোট বয়। কুলীতে আর কবিদারে তফাৎ যে ঢের, সে তার উন্নতির অন্তরায়, ভদ্র হওয়ার পথের কণ্টক।

আর গোকুল ভাবে দাদাটা মাতাল লম্পট। বৌদের ধরিয়া মারে। ও আবার মানুষ! দুটা ছড়া বাঁধিতে পারে বটে কিন্তু সে ত জীবন নাপিতের বৌও পারিত। বাবুরা তাকে খাতির করে, তাও সত্য। এই জন্য বাবুদের সে বোধ হয় অনুকম্পা করে।

এঁ এক সমস্যা। তার ইচ্ছা মানিককে ভাসুরের কাছে পাঠাইয়া দেয়। আবার ভয়ও করে। স্বামী জানিতে পারিলে রাগ করিবে। বরিশাল দূরে নয়, গ্রামের কেহ না কেহ খবরটা নিশ্চয়ই তার কাছে পৌছাইয়া দিবে।

শেষ পর্যন্ত ভীমের সঙ্গে মানিককে সে জামুলায় পাঠাইয়া দিল। তারা রওনা হইল দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর। তাদের নৌকা

আকালের খাল বাহিয়া ঘাঘরের গাঙের ওপারে আর একটা খালে পড়ে। বাঁ দিকে উঁচু রাস্তা, সারি সারি বাড়ি, খালের উপরেই অনেকের ঘাট, ডাইনে বেশীর ভাগই জলাভূমি। কোথায়ও হোগলা, কোথায়ও বা নলখাগড়ায় নৌকা লাগিয়া খশ খশ শব্দ হয়। জলের ভিতর হইতে এক একবার মাছ লাফাইয়া ওঠে।

অদূরে বকের সভা বসিয়াছিল। নৌকার শব্দে সেগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া গেল। শুধু একটা গেল না, নৌকার আরোহীদের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। আধা পরিচিত মানুষের দিকে চাহিয়া মানুষ যেমন ভাবে, কে এ, কোথায় যেন দেখা হইয়াছে, তার চাহনিতেও ছিল সেই রূপ প্রশ্ন।

বৈকালের দিকে দেখা গেল ডাইনে একটা বিলে রক্ত শাপলার ছড়াছড়ি, পড়ন্ত রোদে লাল ফুলগুলি জল্ জল্ করে। উপরে আকাশ-জোড়া রামধনু। কতগুলি মহিষ জলের উপর নাক উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া। মহিষের পিঠে চড়িয়া দুইটি ছেলে রাখালি করে, পরনে ছোট ছোট ধুতি, মাথায় চেকের গামছা জড়ান, হাতে ছোট লাঠি। একজন লাঠিখানাকে আড় বাঁশীর মতন ধরিয়া মুখ দিয়া বাঁশী বাজাইতেছে। আর একজন গাহিতেছে—

রাই চলেছে রে
শ্যামের বামে—

এই দৃশ্য মানিকের মনে রং ধরায়। তার ইচ্ছা হয় সেও শাপলা ও পদ্মের মাঝখানে রাখালি করে, মহিষের পিঠে চড়িয়া মহিষের রাখালি। গরু-ছাগল চরাইতে আর ভাল লাগে না, বিশেষ করিয়া ছাগল চরাইতে। খেলার সাথীরা তাকে দেখিয়া ভ্যা ভ্যা করিয়া ডাকে। সে তখন ভিতরে ভিতরে রাগিয়া যায়।

এই রকম ছোটখাট কত বাসনাই না মনে জাগে, আবার বুদ্‌বুদের মত মিলাইয়া যায়।

মানিককে পাইয়া মণিরাম ভারী খুশি। তাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া মাথা শোঁকে, বিড বিড করিয়া কি যেন আওড়ায়, বোধ হয় আশীর্বাদ করে।

গোলাপী ভাসুরের জন্য বাড়ির শাকসবজি তরিতরকারি পাঠাইয়াছিল। মানিক চুবড়ি হইতে এক একটি নামায় আর কোন্ ফলটি কোন্ গাছের, কোন্ লতা চালায় বাড়িয়াছে তার ফিরিস্তি দেয়। গোলাপী শিখাইয়া দিয়াছিল।

মণিরাম সব চেয়ে খুশি হয় ভিটার পেঁপে দেখিয়া। বলে, ছোট বৌ বড় লক্ষ্মী, কি কও ভীম ভাই ?

ভীম লজ্জায় হাত কচলাইতে থাকে।

জ্যেঠা ভাইপোতে অনেক কথাই হয়। বাড়ির সামনের সাঁকোটা এবারও হইয়াছে কিনা ? বর্ষায় বাড়ির কোন্ পর্যন্ত জল উঠিয়াছিল, চালতা তলার মিষ্টি আম গাছে এ বছর আম কেমন ফলিয়াছে, কালী কুকুরটা আছে ত—মণিরামের প্রশ্ন সব এই ধরনের।

মানিক প্রতিটি কথার চটপট্ জবাব দেয়। কালীর বাচ্চার নাম করালী শুনিয়া মণিরাম বলে, বেশ বেশ। জিজ্ঞাসা করে, পেছনের পুকুরে মাছ হইছিল কেমন, কই, শিঙি, রুই ?

মানিক বলিল, হইছিল খুব। মা কুড়ি টাকায় পুকুর বেচছিল। মাছ ওঠল অনেক।

মণিরাম বলিল, আমারও ত ওতে ভাগ ছিল।

মানিক কহিল, আমরাও কিছু পাই নাই। ভুঁইয়ারা সব নিয়া গেছে।

পুকুর কাটাইলাম আমরা আর মাছ নিল ভুঁইয়ারা ?

রামনাথ ভুঁইয়া কইল, তোমরা মাছ বেচার কে হে? মাছ বেচা, গাছ কাটার কোন অধিকার তোমারগো নাই। কুমি মাছের জন্য কাঁদায় ভুঁইয়া শেষে এক কুড়ি মাছ দিছিল। মা রাখে নাই।

বেশ করছে বৌমা। তবে আমি থাকলে এটা ঘটত না। কবি বলিয়া ভুঁইয়ারা আমারে খাতির করে। তুই কবি হইস্।

মানিক জেঠার দিকে চাহিয়া থাকে।

সে বলে, বুঝলি না? পদ্য লেখবি। 'পাখী সব করে রব' পড়িস নাই? সেই রকম।

মানিক পরম উৎসাহে বলিল, হ লেখব, জেঠামণি।

মণিরাম কহিল, শনিবার পাঁচালি লেখবি, মন্‌সার গান বাঁধবি। শনি, মনসা তোর কণ্ঠে ভর করবেন।

সে জেঠার কাছে ছিল মাত্র তিন দিন। এর মধ্যেই প্রৌঢ় ও কিশোরে অন্তরঙ্গতা গড়িয়া উঠিল। মণিরাম তাকে নিজের কাছে শোয়ায়, অনেক গল্প বলে। তাদের গ্রামের গল্পই বেশী। একদিন বলিল, জানিস্ আমারগো বংশ কত বড়? লোকে আমার ঠাকুরদার নামে গান বাঁধছিল, ও ভাই নীলধ্বজের গুণের সীমা নাই।

মানিক প্রশ্ন করিল, কেন বাঁধছিল জেঠা?

ঠাকুরদা ছিলেন মস্ত লোক। এক বার তার মামাবাড়ির দেশে প্রজা-জমিদারে লড়াই হয়। পুলিস জমিদারের পক্ষে। ঠাকুরদা তারগো খাওয়াইয়া লইয়া গেলেন এক ক্রোশ পথ।

মানিক বলিল, মস্ত লোক ত!

মণিরাম বলিল, হ, তিনি লড়তেন গরিবের জন্য। অত বড় লাঠিয়াল এ গের্দে ছিল না।

তিনটা দিন মানিক আরামেই ছিল। খাওয়াদাওয়া বেশ ভাল হইত। তার মনে হইল, জেঠামণি আরও দু একদিন থাকিতে

বলিলে মন্দ হয় না। কিন্তু জেঠা কিছু বলিল না, জেঠীমাও নয়।

মানিক তাকে বলিল, তোমরা খুব বড় লোক? তাই না? রোজ দুধ খাওয়াও। আমি দুধ খাই না এক বছর।

জেঠিমা বলিল, কেন পৌষপার্বণেও খাস নাই?

দুধের পিঠা খাই নাই। খাইছি কলার বড়া। তোমার মতন বড় লোক হইলে তখন দুধের পিঠা খাব।

বড লোক ত আমরা না বাবা। বড লোক তোর মামারা, আমার ভাইরা।

মণিরাম ভাইপোকে কাপড়, চাদর ও রূপার একটা মেডেল দিল। সর্বশেষে একখানা খাতা দিয়া কহিল, এই মেডেলটা পাইছিলাম পিলজং নপাড়ার জমিদার মঙ্গল ঘোষের কাছে। তখন তাঁরগো দবদবা কত! আর এই খাতায় আছে কাব্য শক্তি। এখানও তোরে দিলাম।

মানিকের মুখ খুশিতে লাল হইয়া ওঠে। সে বলে, আমি তা হৈলে ভদ্দর হইতে পারব?

মণিরাম বলে, নিশ্চয়।

মানিককে বিদায় দিয়া মণিরাম ভীমকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিল, ছোট রাণীর খবর কিছু জান?

ভীম মাথা নাড়িয়া জানায়, না।

কানাঘুষা শোনছ?

ভীম শুনিয়াছিল অনেক কিছুই। কিন্তু পাছে মণি-দা দুঃখিত হয় এই ভয়ে কিছু বলে না।

বুঝ্‌ছি সবই—বলিয়া মণিরাম দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

একটু পরে ভীম উঠিয়া আসিতেছিল এমন সময় মণিরাম

আবার জিজ্ঞাসা করিল, বয়স ত তোমার কম হইল না। এখনও বিয়া কর নাই কেন?

এঁ্যা—এই—ভীম আমতা আমতা করে।

বিয়া করিয়া ফেলো। ফসলের মতন সব জিনিসেরই একটা সময় আছে।

ভীম কেমন যেন বিব্রত বোধ করিতেছিল। বাহিরে আসিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

মানিক মায়ের কাছে ফিরিল গলায় মেডেল ও চাদর ঝুলাইয়া; কবিওয়ালার মতন গলার দুই পাশে কুঁচান চাদর ও বুকের উপরে লাল ফিতায় বাঁধা চকচকে মেডেল। ছেলের মুখে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য দেখিয়া গোলাপী হাসি চাপিয়া রাখিতে পারে না। বলে, কিরে যাত্রার অধিকারী সাজিয়া আইছিস দেখি। চাদর কুঁচাইয়া দিল কে?

মানিক বলিল, দিছে জেঠিমা। জান মা, কাব্যশক্তি লইয়া আইছি? জেঠামণি খাতা, মেডেল, কাপড়, চাদর দিছে। এই মেডেল গলায় ঝুলাইয়া তিনি গান গাইত।

গোলাপী বলিল, তুইও গলায় ঝুলাইয়া গাবি নাকি?

নিশ্চয়। জান মা জেঠার আরও মেলা মেডেল আছে? একটা আছে রাজার মুণ্ডু বসানো।

সম্রাট পঞ্চম জর্জের জুবিলির সময় কোটালি থানায় এক উৎসব হয়। মণিরাম গান বাঁধিয়া, উৎসবে ঐ গান গাহিয়া সার্কেল অফিসারের নিকট সম্রাটের মূর্তি খোদিত ব্রোঞ্জের পদক পায়। আর একটা পান ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট প্রতাপ বাবু। প্রতাপ এখনও নিমন্ত্রণ বাড়িতে এবং সভা-সমিতিতে যান সেই মেডেলটা গলায় ঝুলাইয়া। বলেন, এ হ'ল রক্ষাকবচ।

মণিরামও মনে করে এই মেডেল এক অমূল্য সম্পদ। সরকারের

দেওয়া পদক, তার উপর প্রতাপ বাবুর সঙ্গে এক সভায় পাইয়াছে, রাজার দরবারে। প্রতাপ বাবু দেওয়ান লক্ষ্মীনারায়ণের ভাইপো। এই পদক অন্তত এক বিষয়ে তাহাকে দেওয়ানজীদের সমপর্যায়ভুক্ত করিয়াছে।

দশ

মানিকের শুরু হয় এক নূতন জীবন। শামুকের খোলা কুড়ানো কিংবা রাখালি কিছুই ভাল লাগে না। মাঠে গরু ছাড়িয়া দিয়া সে গুন গুন করে, গায় জেঠামণির গান। রাত্রে সুবিধা পাইলেই কুপি জ্বালাইয়া গান মুখস্থ করে।

একদিন ভীম বলিল, তুই ঘাঘরে শশীর কাছে যাইয়া গান শেখ্। সে তোর জেঠামণির সাকরেদ। শশীকে মানিক জানিত, যুবকটি মণি-রামের শিষ্য। সে থাকে ঘাঘরে। সেখানে সাব-রেজেষ্ট্রি অফিসের সামনে বসিয়া দলিল লেখে, কারও বা মনিঅর্ডারের ফরম পুরণ করিয়া দেয়। পূজাপার্বণে ধনীর বাড়ির ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে গান বাঁধে, গান গায়। লোকে বলে, কবিদার।

মানিক ঘাঘরে যাইয়া তাকে ধরিল, আমারে তোমার সাকরেদ কর, শশী-দা। জেঠামণি আমারে গানের খাতা দিয়া গেছে আর কাব্যশক্তি।

শশী বলিল, তোমার মায়ের মত আছে ত? শেষে তিনি না কন যে ছাওয়ালটারে আমি মাটি করছি।

মানিক বলিল, মা তা কবে না।

শশী বলিল, কইতে ত পারেন। ছেলেরা পদ্য লেখলে ভদ্দর লোকেরাও কয়, 'এই রে গোল্লায় গেল'।

মানিক বিস্ময় প্রকাশ করে, ভদ্দর লোকেরাও!

হ, পদ্য বাঁধছ ত অমনে লোকে কবে অকর্মা।

মানিক পরদিনই মায়ের চিঠি লইয়া গেল। তার নিজের হাতের লেখা, স্বাক্ষর গোলাপীর।

মানিকরে আপনি গান শেখাবেন। আমার মত আছে।

মানিকের মা।

সেই হইতে মানিক মাঝে মাঝে শশীর কাছে গান শেখে, সা রে গা মা সাধে।

অল্পদিনের মধ্যেই মণিরামের বহু গান তার কণ্ঠস্থ হইয়া গেল। এক এক সময় সেও তার সঙ্গে দু'এক কলি যোগ করিয়া দিত। মনের মতন হইলে শশীকে প্রশ্ন করিত, কেমন হইছে, দাদা?

শশী উৎসাহ দিত—খাসা হইছে। পারবি তুই একদিন কবিদার হইতে।

ক্রমে ক্রমে গানের নেশা যেন মানিককে পাইয়া বসে। সে আশা করে একদিন হয়ত গলায় মেডেল ঝুলাইতে পারিবে, পাঁচজনে হয়ত বা বলিবে, বাউতির ছাওয়াল হইলে কি হয়, মানিক হইছে খাসা ভদ্রলোক।

হারাণ নন্দীর ছেলে অমূল্য তার বন্ধু। এক সময় সহপাঠী ছিল, দু'জনে ভাব খুব। মানিক একদিন তাকে বলিল, জানিস্ ভাই, জেঠা আমারে কাব্যশক্তি দিয়া গেছে?

অমূল্য প্রশ্ন করে, সে কি ভাই?

মানিক বলিল, পড়ছিস্ ত—মহাবীর শিখ এক পথ বাহি যায়; আমিও সেই রকম পদ্য বানাব।

পাঠ্যপুস্তকে অমূল্যও কবিতাটা পড়িয়াছে। সে বলিল, রজনী সেনের মত? এতদিন কস্ নাই ত!

ভাবছিলাম নিজে পদ্য বানাইতে পারলে তখন কব। আজকাল আমিও বানাই, শুনবি ?

অমূল্য চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলে, তুই বানাস্ পদ্য। শোনবই ত।

শোন্ তা হইলে—বলিয়া মানিক আবৃত্তি করে,

ও মা কালী
দুঃখ দাও মা সব জনারে
তাই হইছ তুমি কালা
এবার কিন্তু আমার হাতে
তোমার কান্দার পালা।
(আমারে) গরিব করছ, করছ দুঃখী
দিছ বেয়াধি শোক
কৃপা তোমার তারগো উপর
যানরা বড়লোক
(কিন্তু) রাখবা মনে—আমার হাতে
(এবার) তোমার কান্দার পালা।

অমূল্য উৎসাহে বলিল, খাসা হইছে ভাই। সে মানিককে দীন ময়রার দোকানে লইয়া গিয়া রসগোল্লা খাওয়াইল। ফেরার পথে, মানিক বলিল, আমার বড় ইচ্ছা আমিও তোরগো মতন ভদ্দর হই।

অমূল্য বলিল, পারবি ভাই, এই কাব্যশক্তি তোরে ভদ্দর করবে।

কবিতার খাতা পাওয়ার পর হইতে জেঠার সম্পর্কে মানিকের একটা গর্ব ছিল। শশীর কাছে তার গল্প শুনিয়া উহা আরও বাড়িয়া যায়। বাপের চেয়ে বেশী করে সে জেঠার গল্প। গোলাপীর ভয় হয়, বড় হইয়া ছেলে হয়ত বাপকে ভুলিয়া যাইবে। মনসার গান বাঁধিয়া টাকা রোজগার করিবে, আর ভাবিবে, বাপ ভাসাইয়া দিয়া গিয়াছিল। তারা রক্ষা পাইয়াছে জেঠামণির জন্য।

গোলাপীও তাই স্বামীর গল্প করে, ঘর তোলার গল্প, তার দিবা-রাত্র পরিশ্রম করার কাহিনী। এক এক সময় পিসিকে সাক্ষী মানে, জানই ত পিসি, ছাওয়াল মাইয়ারে সে কত ভালবাসত।

বৃদ্ধা বলে, তা আর জানি না? নিজের চোখে দেখছি।

মানিক বলে, হ মা। আমি বাবার মতন হব, জেঠার মতন।

পিসি বলে, জেঠার মতন হইয়া আর কাজ নাই। রাণীর দল আসিয়া শরীরের উপর বাঁটোয়ারা বসাবে, বড় রাণী, ছোট রাণী।

গোলাপী বলিল, না ও তা হবে না। সে রকম মানুষের ছাওয়াল ও না—বলিয়াই হঠাৎ গম্ভীর হইয়া যায়।

এগার

জুঁইফুল ছাড়া নূতন জীবনে গোকুলের আকর্ষণ কিছুই ছিল না। এখানে অবিশ্বাস করে সবাই। একটা জিনিস কিনিয়া আনিলে বাবুরা পাঁচবার জিজ্ঞাসা করে, সত্যি দাম কত বল্ দেখি! ঠকালি কত?

গোঁফ রাখার জন্য নন্দ চাকী ডাকেন "মুষ্ট্যাচ বয়" বলিয়া।

একদিন তার সঙ্গে গোকুলের ঝগড়া হইলে জুঁইফুল বলিল, তোর আস্পর্ধা ত কম নয়। চাকর হয়ে পেশকারের সঙ্গে ঝগড়া করিস্।

উনি আমারে নাহক্ গালাগালি করছে কেন?

তাই বলে তুই রাগ করবি? রাগেরও জায়গা আছে, সময় আছে। তা ছাড়া চক্রী এমন কিছু বলে নি, শুধু দুবার পাজী বলেছে।

এইরূপ গালমন্দ প্রায়ই শুনিতে হয়। গোকুলের মন ক্রমে ক্রমে বিষাইয়া যায়। একদিন সে চ্যাঙের গলা জড়াইয়া বলিল, করতাম মাঝিগিরি। কোন শালার তোয়াক্কা রাখি নাই। আর আজ কী অপমানীই হইতেছি।

চ্যাঙ ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল।

কবে দেখিস্ তোরে ফেলাইয়া চলিয়া যাব।

চ্যাঙ এবার আরও জোরের সঙ্গে ঘেউ ঘেউ করে।

গোকুলের মনে জুঁইফুলের রূপের মোহের উপর ধীরে ধীরে একটা পর্দা নামিয়া আসিতেছিল। কিন্তু নিজের মনের খবর সে জানিত না। সে রাগিতেছিল বাবুদের উপর।

কিন্তু সব চেয়ে অসহ্য দে সাহেবের ব্যবহার। তিনি গোকুলকে মানুষই মনে করেন না, হামেশা হিন্দীতে গালি দেন, শুয়ার কি হাড্ডি, বেকুফ, বেতমিজ।

একদিন ব্যাপারটা চরমে উঠিল। বিদায়ের সময় দে রোজই বারান্দায় আসিয়া জুঁইফুলকে আদর করেন। সেদিনও যাওয়ার সময় আদর করিতেছিলেন।

গোকুল কাছেই ছিল। জুঁইফুল বলিল, দেয়ার ইজ্ গোকুল, ডিয়ার জজ।

জানে দেও, উধার কুত্তা ভি হ্যায়। তারপর দে সাহেব তর্জনী নাড়িয়া গোকুলকে বলিলেন, তুম উব্ চ্যাঙ ত একই হ্যায়।

গোকুলের চোখ দুটা জ্বলিয়া উঠিল। হাত নিশপিশ করিতে লাগিল, ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া দে'র মুখে ঘুষি মারে আর তার সামনেই জুঁইফুলকে ছিনাইয়া লইয়া দেখাইয়া দেয় যে যৌবন ও পৌরুষের দাবি তার অনেক বেশী। কিন্তু পারে না, পারে না হয়ত জুঁইফুলেরই জন্য।

দে চলিয়া গেলে সে আপন মনে বিড় বিড় করিতেছিল, ভারী জজ হইছে, মানুষরে কুকুর কবে। আর এট্টু হৈলে দিতাম দেখাইয়া।

জুঁইফুল বলিল, বিড় বিড় করে কি বকছ?

গোকুল বলিল, মানুষেরে কুকুর কয়! জজগিরি বার করিয়া দেব না একদিন।

বাজে ব'ক না। হাকিম মানুষ, চাকরকে একবার কুকুর বলেছে ত কি হয়েছে?

তুমি! তুমিও এই কথা কও?

আলবৎ বলব। চ্যাঙ-এর চেয়ে তুই বড় কিসে? তাকে জজ সাহেব আদর করে। আমি—

সন্ধ্যা হইতে মদ খাইয়া গোকুলেরও নেশা হইয়াছিল। সে ক্রুদ্ধ শূকরের মতন অস্পষ্ট শব্দ করিয়া জুঁইফুলের কাঁধ ধরিয়া ঝাঁকিতে ঝাঁকিতে বলিল, তুই কুকুরেই যুগ্যি!

জুঁইফুল ভয় পাইয়া গিয়াছিল। সে কাতরকণ্ঠে বলিল, তুমি না আমায় ভালবাস?

ভালবাসি না কচু, বলিয়া গোকুল জুঁইফুলকে এক ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয়। একটা দেরাজের কোণে মাথা ঠুকিয়া যাওয়ায় জুঁইফুল বলিয়া ওঠে, মা গো।

সেই রাত্রেই গোকুল সুটকেশ লইয়া জুঁইফুলের বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যায়। যাত্রা করে অনিশ্চিতের উদ্দেশে।

খুলনাগামী মস্তবড় দোতলা ষ্টীমার, মাল আর যাত্রীতে ঠাসা। হেড্‌লাইট নাই, ভিতরটা আধ অন্ধকার। জাপানী বোমার ভয়ে আলোগুলিতে ঠুলি পরানো হইয়াছে। একতলায় বস্তার ছোটখাট এক পাহাড়ের পাশে গোকুল বসিয়া। তার সারা দেহে অবসাদ নামিয়াছে। শরীর পাষাণের মত ভারী। এই অবসাদ দূর করার জন্য সে একটার পর একটা সিগারেট ধরায়। গোঁফ রাখা, গায়ে সাবান ঘষার মতন সিগারেট ধরারও কারণ জুঁইফুলের চোখে নিজেকে

বড করিয়া তোলার ইচ্ছা। বাবুদের, বিশেষতঃ মাতাল বাবুদের সিগারেট চুরি করিয়া সে একটা টিন ভর্তি করিয়াছিল। সকাল হইতে টানিয়া টানিয়া তার অনেকগুলি নিঃশেষ করিয়াছে।

নদীর দুই ধারে গাছপালার সারি—যেন সমান্তরালে গভীর কালো দুইটি রেখা। জাহাজ ঐ রেখা ভেদ করিয়া ছোটে, গোকুল ঐ দিকে তাকায় আর ভাবে তার মনের আঁধারের মতন এই আঁধারেরও বুঝি শেষ নাই।

আজ এক বছরও হয় নাই সে ঘর ছাড়িয়াছে। সেই দিনটা ছিল গোলাপীর প্রেমে স্নিগ্ধ, কুমি মানিকের ভালবাসায় উজ্জ্বল। সেদিন আর আজ? আজ সে চলিল মাথায় অপমানের বোঝা বহন করিয়া, মান, চরিত্র সব খোয়াইয়া। শুধু জজ নয়, জুঁইফুলও তাকে ঘৃণা করে, কুকুর মনে করে।

হঠাৎ একটা খালাসী আসিয়া ধমক দেয়, দেখ না মশায় পাশে মাল রইছে? ফেল, সিগ্রেট ফেল।

এই সময় তীর হইতে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া ওঠে। শব্দটা চ্যাঙ-এর মতন। গোকুলের আজ মনে হয় বরিশালে সে একমাত্র ভালবাসিয়াছিল চ্যাঙকে।

চাঁদ ওঠে। জলের বুকে সাদা ফেনা তুলিয়া জাহাজ ছুটিতে থাকে। দৈহারির গাঙ, শাঁখারি কাঠি, বাঁকের পর বাঁক, কোথাও সুপারি বন, কোথাও বা নারিকেল গাছের সারি। সবই গোকুলের চেনা, কতবার কত রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে, কখনও অন্ধকার রাত্রে, কখনও বা জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়া সে এই নদীপথে নৌকা বাহিয়াছে।

খানিকটা পরে তন্দ্রার মতন আসিতেছিল। সে উঠিয়া দেখিল চলমান জাহাজের পিছনে পাটগাতিবাজারের টিনের চালাগুলি জ্যোছনাভরা আকাশে একথোকা আমলকির মতন ঝুলিতেছে। তার

বুক বেদনায় টন টন করে, মনে পড়ে কুমি মানিককে, গোলাপীকে। চোখ বাঁধা অবস্থায় খালি শরীর ছুঁইয়া আর পাঁচটি নারীর মধ্য হইতে সে তার গোলাপীকে বাছিয়া লইতে পারিত। তাকে সে ভুলিয়াছিল কেমন করিয়া। আচ্ছা, তারা বাঁচিয়া আছে ত? আছে কি খাইয়া?

হঠাৎ জাহাজখানি ঝিনঝিনিয়া রোগীর মতন কাঁপিয়া ওঠে। সারা জাহাজে ঝনঝন শব্দ হয়। গোকুলের পাশেই দুই তিনটা বস্তা পড়িয়া যায়। ঘুমন্তরা হাউ মাউ করিয়া জাগিয়া ওঠে, শুরু হয় কলরব।

জাহাজ চড়ায় আটকাইয়া গিয়াছিল, ঘন ঘন সিটি দিতে লাগিল। মনে হইল অদূরের কোন ষ্টীমারকে বিপদবার্তা পাঠাইতেছে।

এই কলরবের মধ্যে গোকুল নির্বিকার। সে বাহিরের জ্যোৎস্না-লোকিত অনন্ত আকাশের দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। খানিকটা পরে দেখিল নিকটেই বালুচরে এক কুমীর শুইয়া লেজ নাড়িতেছে।

ষ্টীমার ছাড়িল পরদিন বেলা নয়টায়। খুলনায় বেলা বারটার কলিকাতাগামী গাড়ীও ধরাইয়া দিতে পারিল না।

গোকুল পাঁচটার গাড়িতে উঠিয়া বসিল। পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা বাজিল, গাড়ী ছাড়ার নাম নাই। লোকগুলি ঠাসাঠাসি করিয়া বসিয়া আছে, নিজেদের ঘামে নিজেরাই যেন বাষ্পসিদ্ধ হইতেছে। গাড়ী ছাড়িলে তবু একটু বাতাস পাওয়া যাইত।

রেলের টুপি বা কোট-পরা লোক, এমনকি কুলী দেখিলেও যাত্রীরা প্রশ্ন করে, গাড়ী ছাড়ার দেরি কত? কেহ জবাব দেয়, কেহ দেয় না। যারা দেয় তারা বলে, ঠিক বলতে পারি না।

রেলের কর্মচারীরা টিকিট বেচে, ইঞ্জিনে কয়লা দেয়, তেল দেয়। গাড়ীর সঙ্গে ইহাই তাদের সম্পর্ক। কিন্তু গাড়ীর সত্যকার মালিক সমরবিভাগ। তাদের হুকুমে ট্রেন ছাড়ে, আগে সৈন্য ও তাদের

রসদ যায় ; যায় সমরবিভাগের যত কিছু উপকরণ। তারপর সাধারণ যাত্রীর ব্যবস্থা।

অসহায় মানুষগুলি বিড়ি টানে, পান খায় ; ধোঁয়ায়, পানের পিক ও থুথুতে গাড়ীখানা ছাইয়া যায়।

আসাম সীমান্তে যুদ্ধ আসিয়া পড়ায় সব ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। রেল, ষ্টীমার সময় মতন ছাড়ে না, আলো জ্বলে না। রাত্রে শহরগুলিকে পাতালপুরীর মতন দেখায়। আতঙ্ক সর্বত্র। সকলের চোখেমুখে অবিশ্বাসের ছাপ। একজন বলিল, গাড়ী ছাড়ার কথা এরা কি করে বল্‌বে? ইংরেজও পারে না, রেল যে আমেরিকার কাছে মর্গেজ।

আর একজন বলিল, শুধু কি রেল? বাংলাও তাদের কাছে বন্ধক রেখেছে।

কে একজন আর এক কোণ হইতে প্রশ্ন করিল, কি করে জানলেন?

প্রথম বক্তা বলিল, ইউক্লিড জানেন? রেল যে মর্গেজ দেওয়া এটা ইউক্লিডের প্রমাণের মতন। আমি গোপন খবর শুনেছি, আমার ভায়রাভাই চাঁদপুরের রেলে পাটের বুকিং ক্লার্ক।

এত বড় প্রমাণের পর কেহ আর রেল সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করিল না। আর একজন আরম্ভ করিল, আসাম গেছে এবার বাংলার পালা। সুভাষচন্দ্র আসামে ইংরেজকে ভাল রকম শিক্ষা দিয়েছে। জাপানের সঙ্গে সব ঠিক। কলকাতায় পৌঁছেই স্বাধীনতা ঘোষণা।

একজন বলে, জাপানীরা বৌদ্ধ, বুদ্ধ ছিলেন ভারতবর্ষের লোক। জাপানীরা ধরতে গেলে হিন্দুই।

নিশ্চয়।

কিন্তু ওধারে রুশরা যে জার্মানদের প্রচণ্ড বাধা দিচ্ছে, নইলে—

তিন চার জন একই সঙ্গে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল! কি করে জানলেন আপনি?

ও ত রুশানদের পগ্যাণ্ডা!

পগ্যাণ্ডা নয় প্রোপ্যাগাণ্ডা। ওদের প্রচারসচিব লজভস্কি হচ্ছে এক নম্বরের মিথ্যাবাদী।

ঠিক বলেছেন, আমার ছোট শ্যালাটা মিথ্যাবাদী ব'লে শ্বশুর মশাই তার নাম রেখেছেন লজভস্কি।

রুশ-জার্মান যুদ্ধের আলোচনায় ছেদ টানিয়া আর একজন বলিল, ইংরেজ লড়াইয়ে মার না খেলে কি আর কলকাতার বড় বড় সাহেবরা সিমলা মুসৌরিতে পরিবার পাঠায়? এবার আর দার্জিলিং নয়।

একটী বৃদ্ধ এতক্ষণ চুপ করিয়া এককোণে বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, ইংরেজের পাপের ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে, এবার হবে ভরাডুবি। তাঁর কণ্ঠের গভীর বেদনা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি বলিলেন, অমন স্বার্থপর জাত আর নেই। নিজেরা রেঙ্গুন থেকে পালালো উড়ো জাহাজে ক'রে, আর আমাদের বেলায় হাঁটাপথ।

একজন প্রশ্ন করিল, আপনার কোন বিপদ হয়েছে নাকি?

হাঁা, আমার ছেলে, নাতি—

দুই তিনজন সমস্বরে বলিল, কি হয়েছে তাদের?

বৃদ্ধ একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলেন, মারা গেছে। মণি-পুরের সীমান্তে এসে পৌছেছিল। জাপানী উড়ো জাহাজ দেখে মাচার তলায় লুকোয়। তাদের একটা গুলি এসে নাতিটার বুকে বিঁধল মাচা ফুটো করে। তার হাতে ছিল একখানা জিলিপি। সেখানা সবে মুখের কাছে—তিনি যেন চোখের উপর পথশ্রান্ত ক্ষুধিত পৌত্রের জিলিপি খাওয়ার শেষ চেষ্টা প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন।

একটু থামিয়া বৃদ্ধ আবার আরম্ভ করিলেন, বাপবেটায় এক সঙ্গে ফিরছিল। ছেলে আমার ন'শ টাকার মাইনের কাজ করত। মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার। মিষ্টার পারিয়াল বললে এক ডাকে চিনত সবাই।

তিনি?—কে একজন প্রশ্ন করে।

সে গেছে ধনুষ্টঙ্কারে, হাজার মাইল হেঁটে পায়ে ঘা হয়েছিল, কলকাতায় এসে হ'ল ধনুষ্টঙ্কার।

এই সময় দুইটা ঝাঁকানি দিয়া গাড়ী ছাড়ে। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে শোকার্ত বৃদ্ধ আবার বলেন, এখন ছেলের ব্যাঙ্ক ও ইন্সিওরেন্সের টাকাগুলো পেলে হয়।

কিছুক্ষণ সকলে নীরব ছিল। তারপর একজন প্রশ্ন করিল, আপনার ছেলে বড় চাকুরে ছিলেন, তিনি উড়ো জাহাজের ব্যবস্থা করতে পারলেন না?

করেছিল। বৌমা আর কচি মেয়েগুলো তাতে ফিরেছে, নাতিটিও উঠেছিল। দেখতে তাকে বয়সের চেয়ে বড় দেখাত, তাই সৈন্যেরা নামিয়ে দিলে। অথচ জোয়ান জোয়ান সাহেবরা—

কে একজন বলিয়া উঠিল, ক্রুটাল।

বৃদ্ধ বলিলেন, তার বাবা গেল ঐ কচি ছেলের শোকে। পাপ, ঘোর পাপ।

একজন টিপ্পনী করিল, ইংরেজেরও শাস্তির ব্যবস্থা হচ্ছে। দেখবেন কি হয়। গান্ধী মহারাজ ত বলেছেন, 'ভারত ছাড়'।

কলকাতায় শুনলাম, গোলমাল বেধেছে।

বোম্বাইতে শুরু হয়েছে কদিন আগে।

গান্ধীজী নাকি গ্রেপ্তার হয়েছেন।

তাতে এবার আর আটকাবে না।

কলিকাতায় গোলমালের কথা শুনিয়া গোকুল মুখ তুলিয়া চাহিল। বোমার ভয়ে গাড়ীতে আলো নাই। ভিতরটা কেমন যেন রহস্যময়। খালি কালো কালো মাথা আর বিড়ি সিগারেটের ডগায় ডগায় আগুনের ফুলকি। মনে হয় একদল মানুষ কি যেন গোপন ষড়যন্ত্র করিতেছে।

ট্রেন এক একটা ষ্টেশনে আসে আর ভীড় বাড়ে। একজন নামে ত ওঠে পাঁচজন। যাত্রীদের অবস্থা প্যাকিং বাক্সে বোঝাই শুঁটকি মাছের মতন। কোন কোন ষ্টেশনে গাড়ী দু'তিন ঘণ্টা পড়িয়া থাকে, লাইন ক্লিয়ার পাওয়া যায় না।

ট্রেন শিয়ালদহে পৌছিল শেষ রাত্রে। কুলীরা ঝিমাইতেছিল্, গাড়ী প্লাটফরমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই তারা গা ঝাড়া দিয়া উঠিল। চলমান গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া দরজা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিল।

পাশের রাস্তায় মোটর ভোঁ ভোঁ করে। রিকশার ঠুন্ ঠুন্ শব্দ হয়। কুলী ও যাত্রীর কলরবে, গাড়োয়ানের আহ্বানে, অশ্বের হ্রেষায় ব্ল্যাক আউটের ঘুমন্ত রাত্রি যেন জাগিয়া ওঠে।

গোকুল বোঁচকা ও টিনের স্যুটকেশ হাতে করিয়া প্লাটফরমের বাহিরে আসে। এদিক ওদিক তাকায়।

পল্লীগ্রামের লোক, অন্ধকারের সঙ্গে পরিচয় যথেষ্ট কিন্তু কলিকাতায় দেখিল অন্ধকারের এক নূতন রূপ। ঠুলি-পরা বাতির ভিতর হইতে ঠিকরানো আলো না, যেন পেত্নীর হাসি। তাতে অন্ধকার আরও রহস্যময় হইয়া ওঠে।

অজানা শহর। দেশের লোক দু'চারজন আছে বটে, কিন্তু তাদের ঠিকানা জানে না। জানিলেও কারও কাছে যাইত কিনা সন্দেহ। শেষ পর্যন্ত ট্রামের লাইন ধরিয়া সে উদ্দেশ্যহীন ভাবে চলিতে লাগিল।

বার

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মহানগরী গোকুলের কাছে নূতনরূপে ধরা দিল। পিচঢালা চওড়া রাস্তা, বড় বড় বাড়ী। আকাশ-ছোঁয়া গির্জ্জার চূড়া মসজিদের মিনার সবই এখানে মহিমময়। এক সঙ্গে ঐশ্বর্যের এতটা বিকাশ গোকুল দেখিল এই প্রথম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়িল প্রাসাদের পাশে উলটানো ময়লার টব, আবর্জনার স্তূপ। দুর্গন্ধে পথচলা দুষ্কর! পথে লোক চলাচলও খুব কম, গাড়ী মোটর নাই বলিলেই চলে, দোকানঘর বন্ধ। রিক্ততার এমন রূপ দুর্লভ।

গোকুলের মনে হয়, ট্রেনে কলিকাতায় যে হাঙ্গামার কথা শুনিয়াছে এই রিক্ত নিস্তব্ধতা কি তারই ফল?

সে উদ্দেশ্যহীন ভাবে চলিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে পাশ দিয়া মিলিটারি লরী চলিয়া যায়। গোরা সৈন্যেরা এক একবার চীৎকার করিয়া ওঠে। খেলার ছলেই যেন গোকুলের দিকে বন্দুক তুলিয়া ধরে। গোকুলের ভয় হয়, মনে পড়ে গোলাপীকে, তার সতর্ক-বাণী—লোকে কৈলকাতা ছাড়িয়া পলাইতেছে, আর তুমি সেখানে যাবা? তা হবে না।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গলির মোড়ে দুই চারজন করিয়া জমায়েৎ হয়, ভীড় ক্রমে বাড়ে। জনতা ময়লার টব, মরিচাধরা কেনে-স্তারা, লোহালক্কড়, ইট-পাটকেল যাহা পায় তাহাই রাস্তার উপর আনিয়া জড় করে। এই স্তূপের পিছনে থাকিয়া পুলিস কিংবা মিলিটারী দেখিলেই আওয়াজ তোলে, ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ, লড়কে লেঙ্গে মরেঙ্গে। করে গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের জয়ধ্বনি। পুলিস ও মিলিটারির উদ্দেশে ঢিল ছোঁড়ে। তারা তাড়া করিলে ছুটিয়া

পলায়। নূতন আশ্রয় স্থান হইতে আবার লড়াই চালায়। নিরস্ত্র জনতার এই অভিনব গেরিলা যুদ্ধে রাজসরকার হিমশিম খাইয়া উঠিয়াছে।

এক জায়গায় দুটি যুবা উচুঁ মইয়ে দাঁড়াইয়া ইলেকট্রিকের তার কাটিতেছিল। হঠাৎ চীৎকার উঠিল, মিলিটারি।

নিমেষের মধ্যে রাস্তাটা ফাঁকা হইয়া গেল। যারা তার কাটিতেছিল তাদের একজন লাফাইয়া পড়িয়া ছুটিতে লাগিল। গোকুলও তার পিছু পিছু ছুটিল। শব্দ হইল গুম্, গুড়ুম্, গুম্। অপর যুবকটি মইয়ের উপর হইতে পাকা ফলের মতন রাস্তার উপর পড়িয়া গেল। কেহ তার দিকে ফিরিয়াও তাকাইল না।

গোকুলও এবার বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের মধ্যে মিশিয়া যায়। ঢেউয়ের উপরে কলার খোলার মতন ভাসিয়া ভাসিয়া চলে। এই ছোটে আবার দৌড়ায়। লোকগুলি চেনা নয়, সবাই তার মাতৃভাষায় কথা বলে না; সকলে এক ধর্মাবলম্বীও নয়, কিন্তু এক উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়াছে, সংগ্রাম করিতেছে একই আদর্শের জন্য। রণক্ষেত্রে সৈনিকে সৈনিকে যে অন্তরঙ্গতা বোধ করে, গোকুল এই লোকগুলির জন্য সেইরূপ আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিল। এরা যেন তার কত কালের পরিচিত, তার কত আপনার জন।

একবার তারা পনর বিশজন লোক ধরাধরি করিয়া ফুটপাথের উপর হইতে ট্রামের একটা রেল রাস্তার মাঝখানে রাখিতেছিল এমন সময় সৈন্যেরা তাড়া করে। তারা ছুটিয়া পালায়। গোকুলের টিনের বাক্স ও বিছানা ফুটপাথে পড়িয়া থাকে।

সারাটা দিন এইভাবে কাটে। মাঝে মাঝে বৃষ্টির জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন বন্ধ থাকে বটে আবার শুরু হয়। এই গেরিলা লড়াইর উত্তেজনা জুঁইফুলের আকর্ষণের চেয়েও তীব্র। বাক্স বিছানা নাই,

এমন কি পরার আর একখানা কাপড় পর্যন্ত নাই, গোকুল সে কথাও ভুলিয়া গিয়াছিল।

দিনে আর খাওয়া হইল না। সন্ধ্যার পর এক দোকানে কিছু পুরি তরকারি খাইল। টাকার থলেটি কোমরে ভাল করিয়া বাঁধিয়া শিয়ালদহ স্টেশনে যাইয়া একখানা ইট মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িল।

ভোরে ঘুম ভাঙিল বন্দুকের গুম্ গুড়ুম্ আওয়াজে। স্টেশন হইতেই দেখিল সামনের রাস্তায় পুলিসের তাড়া খাইয়া জনতা ছুটিতেছে। তারই মধ্যে তারা এক একবার পিছু ফিরিয়া ঢিল ছোঁড়ে আবার ছোটে।

একবার এক প্রচণ্ড শব্দে গোকুলের বুক কাঁপিয়া উঠিল। পাশের একজন বলিল, কোথায় যেন বোমা ফাটল।

যাত্রীরা নূতন নূতন খবর লইয়া আসে, কোথায় বন্দুক চলিয়াছে, জনতা কোথায় ডাকগাড়ী আক্রমণ করিয়াছে, বোমা ফাটাইয়াছে—এই সব কাহিনী।

বিক্ষোভ আজ আর এক নূতন রূপ ধরিল। সাহেবদের এবং সাহেবী পোশাক পরা ভারতীয়দের লাঞ্ছনার একশেষ হইল। লোকের রাগ নেকটাইয়ের উপরই বেশী। তারা মনে করে টাই গোলামীর প্রতীক। যাকে পায় তাকেই টাই খুলিতে বাধ্য করে। এই ব্যাপার লইয়া ছোটখাটো কতগুলি হাঙ্গামাও হইয়াছে।

জনতার সঙ্গে ছুটাছুটি করিয়া সেদিনও গোকুলের ভাত খাওয়া হইল না। ভাতের হোটেল কোথায় জানে না। সাইনবোর্ড দু'একখানা দেখে বটে কিন্তু সে সব বাড়ির দরজা বন্ধ। সে ভাত খায় নাই আজ পাঁচ দিন, পেট পুরিয়া কিছুই খায় নাই। সন্ধ্যার পর হোটেলের সন্ধানে ঘুরিতেছে এমন সময় কে একজন পিছন হইতে তার ঘাড় ধরিল। গোকুলের মনে হইল কোনও শ্বাপদ জন্তুর তীক্ষ্ণ নখর ঘাড়ে বিঁধিতেছে।

আততায়ী গর্জন করিয়া উঠিল, ড্যাম সোয়াইন। গোকুল মুখ ফিরাইলে বিড়াল চোখো লাল মুখ সৈন্যটা বলিল, শুয়ারকা বাচ্চা, রাস্তা সাফা করো। জলদি, জলদি।

আরও অনেকে রাস্তা পরিষ্কার করিতেছে, নিরীহ ভারতীয়ের দল। তাদের মধ্যে ভদ্রবেশ পরিহিতও আছে কয়েকজন। তাদের অসহায় অবস্থা দেখিয়া গোরা সৈন্যগুলি হাসে, উল্লাস প্রকাশ করে। গোকুলের ইহা অসহ্য মনে হয়, তার চেয়েও দুঃসহ ঠেকে দেশী পুলিসের টিটকারি। মানুষ নয়, তারা যেন বাঘ-ছাল পরা একদল শিয়াল। রাস্তা সাফ করিতে করিতে এই মানুষগুলার উদ্দেশে সে কয়েকবার থুথু ফেলিল।

ফুটপাথের আশে পাশে আগে হইতেই নর্দামার পাঁক জমা ছিল, তার সঙ্গে মিশিয়াছে ডাস্টবিনের আবর্জনা। সেই স্তূপ যে কত বড় ব্ল্যাক আউটের রাত্রে প্রথমে তাহা বোঝা যায় নাই। দুপুরের বৃষ্টিতে ময়লাটা আরও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আধ-আলো, আধ-অন্ধকারের মধ্যে পুতিগন্ধময় এক নরক বলিয়া মনে হয়।

সৈন্য ও পুলিসরা যাকে পায় তাকে দিয়াই ধাঙড় মেথরের কাজ করাইয়া লয়। মোটরবিহারীও বাদ যায় না। বিরাট লিমুসিন হইতে তারা হ্যাট কোট ধারী এক বাবুকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া নামাইল। তিনি রাস্তার পাঁক ঘাঁটিতে আপত্তি করিলে একটা সৈন্য পিছন হইতে তাঁকে লাথি মারিল আর একজন পাঁকে তাঁর মুখ ঘষিয়া দিল।

গোকুলের মনে হইল এই দুষ্কৃতিকারীদের কেউ এ রকম মারে না? লাঞ্ছনা করে না? বেশ হয় তা হইলে।

পরদিন সে নামিল সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া। এক বাঙালী বাবুর টাই ছিঁড়িল, ঢিল মারিয়া এক গোরা সৈন্যকে জখম করিল। শেষটায় ধরা পড়িল ডাক-বাক্স ভাঙার সময়।

বিচারের সময় হাকিমের প্রশ্নের উত্তরে বলিল, হ হুজুর, লাল ডাকের বাক্সডা আমিই ভাঙছি।

হাকিম প্রশ্ন করিলেন, কেন ?

গোকুল কহিল, গোরারা আমাগো অপমানি করে কেন ? আমারে দিয়া রাস্তা সাফা করাইছে। বড় বড বাবুরাও বাদ যায় নাই। আপনে হাকিম বটেন কিন্তু আপনারে পাইলেও রেহাই দিত না। সেই মোটরের বাবুর দশা করিয়া ছাড়ত।

অশিক্ষিত মানুষটার সোজা সরল এই কথায় হাকিম রক্তচক্ষু হইয়া উঠিলেন। আসামীর এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হইল।

গোকুল চীৎকার করিয়া উঠিল, লড়েঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।

মাস কয়েক পরে মানিক প্রেসিডেন্সী জেল হইতে গোকুলের এক পত্র পায়। সে লিখিয়াছে,

বাবা মাইনকা, ভারত ছাড়োর জন্ম আমার এক বছরের ফাটক হইছে। আমি ভাল আছি। তোমরা কেমন ? আমি মাসে একখানা করিয়া চিঠি লেখার হুকুম পাইছি। এক মাস পরে আবার পত্র দিব। তুমি ও কুমি ভালবাসা জানিবা। তোমরা সবাই জানিবে। পিসি কেমন ?

মানিক মাকে চিঠি পড়িয়া শুনাইলে সে একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকে, তার পর বলে, জেল হইছে কদ্দিন ? মার ধর করে নাই ত ? খালাস পাবে কবে ?

তুই তা হইলে কিছুই শোন নাই—বলিয়া মানিক চিঠিখানা আবার পড়ে।

মার ধরের প্রশ্ন তার মনেও জাগিয়াছিল কিন্তু সে সম্পর্কে সে কিছু বলিল না। পিতার কারাবাসের সংবাদে তার আনন্দ হইয়াছিল।

একটু পরে সে বলিল, দেখলি বাবার ফাটক হইছে স্বদেশী করিয়া। আমারে ত দিল না করতে।

সারা ভারতবর্ষের মতন কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলনে এই অঞ্চলেও সাড়া পড়িয়াছিল। মানিকের চোখের সামনেই পুলিস আন্দোলন-কারীদের উপর লাঠি চালায়, একদিন আকালের সড়কের উপরে আর একদিন থানার কাছে। শেষের দিন জনতা ডাকঘরে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করে।

পুলিসের অত্যাচার চরমে ওঠে, নিরপরাধরাও মার খায়। হাই-স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্যাম বাঁড়ুয্যে থানার সামনে দিয়া আসিতেছিলেন, পুলিস তাঁর মাথা ফাটাইয়া দেয়। আর একদিন শীতল পণ্ডিতকে তাড়া করে। মানিক সেই দিন মাকে বলে, আমি ভারত ছাড়ো হব মা।

গোলাপী বলে, সে আবার কি বস্তু?

তুই কিছুই জান না। এ হইল গান্ধী রাজার ভারত ছাড়ো। তিনি সাইবগো এ ভাশ ছাড়তে কইছে। কইছে, এ ভাশ হামারা হ্যায়, তুমকো নেই। যাও, চলা যাও। পুলিসের রাগ সেই জন্য।

গোলাপী বলিল, বেশ তুইও ভারত ছাড়ো হবি। আগে বড় হ।

মানিক বলিল, আমিত আর ছোট নাই মা।

গোলাপী ছেলেকে ভালই জানিত। বলিল, হ, বড় ত হইছই। আরও একটু বড় হ, তখন আর মানা করব না।

এরপর মাতা-পুত্রে এ সম্পর্কে আর কোন কথা হয় নাই।

চিঠি পাওয়ার পর দিনই মানিক অমূল্যকে খবরটা বলিতে গেল। তার বাবার জেল হইয়াছে শুনিয়া অমূল্য বলিল, কেন রে? জেল হয়েছে কবে, কোথায়?

মানিক বলিল, কলকাতায়। ভারত ছাড়োর জন্ম।

অমূল্য বাড়িতে বরাবরই শুনিয়া আসিয়াছে সরকারের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্য ভাল নয়, বিশেষতঃ ভারত সম্রাটের এই বিপদের সময়। সে শুধু ওঃ বলিয়াই কেমন যেন গম্ভীর হইয়া গেল।

মানিকের ভাল লাগিল না। সে ক্ষুব্ধ মনে বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

তের

পূজায় খেউড় গাহিয়া মানিক তিনটি টাকা রোজগার করে আর গুটি কয়েক নারিকেল। লোকে তার সুখ্যাতি করিল। সে একখানা গান বাঁধিয়াছিল। শশী বলিল, হইছে খাসা।

মানিকের চোখ মুখ খুশিতে ভরিয়া ওঠে। সে বলে, আমার হবে শশীদা?

শশী বলিল, হবে।

কাব্যশক্তি পাব?

পাবি রি পাগলা, পাবি, বলিয়া শশী মানিকের পিঠ চাপড়াইয়া দেয়।

মানিক মায়ের হাতে টাকা আনিয়া দিলে সে বলিল, এক টাকার রসগোল্লা কিনিয়া আন। তুই আর কুমি আমার সামনে বসিয়া খা। আমি দেখি।

মানিক বলিল, আমি ভাবছিলাম তোরে একখান কাপুড় দেব।

সে দিন পরে।

পূজার ছুটির পরে নৌকার খেসারতের টাকাও আসিল। দো মাল্লাই নৌকার জন্য গভর্ণমেণ্ট মাত্র ত্রিশ টাকা দিয়াছে। সময়

তহবিলের চাঁদা ও নিজের প্যাওনা-গণ্ডা কাটিয়া প্রমোদ মোক্তার অবশিষ্ট সামান্য কয়েকটি টাকা পাঠাইয়া দিল।

গোলাপী ঐ টাকা দিয়া হরিমতীর দেনা পরিশোধ করে। পিসি বলে, দিন কাল যা পড়ছে তা'তে সব শোধ করলি কেন? আখেরের জন্য দুই চারডা টাকা রাখলেই পারতিস।

গোলাপী বলিল, রাখব কেমনে? আর তা'তে আখেরের হবেও না কিছু। দেনাটা শোধ করছি এখন আর যা হৌক হরিমতীর গাল-মন্দ শোনতে হবে না। ছাওয়াল মাইয়া লইয়া বাস করি ত।

দেশের দুর্দিন ক্রমে ঘনাইয়া আসিতেছিল। নৌকা বাজেয়াপ্ত হওয়ায় নদীমাতৃক এই অঞ্চলে ধান চাউলের চলাচল আগে হইতেই বন্ধ হয়। এবার গুজব ওঠে লড়াইয়ের জন্য সরকার বিদেশে চাউল চালান দিবে। কলিকাতা হইতে দালাল আসিল বলিয়া।

সোনার মাস অগ্রহায়ণ, আগতোলার মাস। মাসের পয়লা গৃহস্থ সুপারি গাছের খোলায় ধানের শিষের সঙ্গে হলুদ কচু-কলা বাঁধিয়া ঘরের দরজায় টাঙায়। তার উপর সিঁদুরের পুত্তল আঁকে, আঁকে স্বস্তিক। এরই নাম আগতোলা। উৎসব ঘরে ঘরে। অগ্রহায়ণে লোকে নূতন ধান্যের নবান্ন খায়, নূতন গুড়ের পিঠা পায়েস।

এবার সেই মাসেই অভাব শুরু হইল। হাট বাজারে চাউল নাই। মোটা লাভের আশায় আড়তদার ও বড় বড় দোকানদার চাউল সরাইয়া ফেলিয়াছে। যে সব গৃহস্থ দুই চার সের চাউল লইয়া হাটে আসে, বেচিয়া তেল নুন কেনে তারাও ভয়ে চাউল আনে না, পাছে সরকারের দালালেরা অল্প দামে জোর করিয়া উহা লইয়া যায়। এরূপ ঘটনা এই থানায় ঘটে নাই বটে কিন্তু পাশের গৌর নদী ও চিতলমারিতে ঘটিয়াছে।

দিন মজুরের দল যারা হাটে হাটে চাউল কিনিয়া খায় বিপন্ন

তাদেরই বেশী। আর মজুর ত দেশের প্রায় সবাই। যাদের চাষের জমি আছে তাদেরও অনেকেরই খেতের ফসলে ছয় মাস যায় না। ঘরামিগিরি মাঝিগিরি করিয়া অন্নের সংস্থান করিতে হয়। আজকাল সে সব কাজও জোটে না। রেঙ্গুনে বোমা পড়ায় যে সব সচ্ছল গৃহস্থ কলিকাতা হইতে গ্রামে আসিয়াছিল, কলিকাতায় বোমা পড়ার পর তারা আবার সেইখানেই ফিরিয়া গিয়াছে।

একদিন মানিক হাট হইতে মুখ ভার করিয়া ফিরিয়া আসিলে গোলাপী বলিল, কিরে আজও চাউল পাইলি না?

মানিক বলিল, না মা। এরপর আর পাবাও না।

ধান চাউলও লড়াইয়ে যাবে না কি?

হ, কলকতার লোক আইছে। সাইবগো গোমস্তারা আর পাগড়ি-ওয়ালা মাড়ুয়ারা।

তোরে কইল কেডা?

লোকে হাটে কওয়া কউয়ি করতেছিল।

খবরটা গোলাপীকে চিন্তাকুল করিয়া তোলে, আজ রাতটা কোন রকমে চলিতে পারে কিন্তু কাল রাত পোহালেই যে চাউলের দরকার। সকালে ভাত খাইয়া তবে পরের বাড়ি কাজে যাইতে হইবে।

কিন্তু রাত্রেই চাউল জুটিল। আটটা আন্দাজ বাহির হইতে কে যেন ডাকিল, মাইনকা।

মানিক ঘুমাইয়াছিল। উত্তর করিল পিসি। একটু রুক্ষ কণ্ঠেই কহিল, এত রাত্তিরে ডাকে কেডা?

উত্তর আসিল, আমি গফুর মিয়া।

পিসি বলিল, ওঃ ডাকের গফুর? চাও কি?

চারডি চাউল আনছিলাম। সন্ধ্যার সময় মানিক কইল, চাউল বাড়ন্ত।

পিসি বলিল, তা এত রাত্তিরে—

গফুর কহিল, তুমি বড় খিট খিট কর বুড়ি।

পিসি গোলাপীকে জিজ্ঞাসা করিল, কিরে চাউল রাখব?

গোলাপী বলিল, কাল সকালে কাজে যাইতে হবে। আজও—

আজ ত দেখলাম আধপেটারও কম খাইছ—বলিতে বলিতে বৃদ্ধা উঠিয়া দরজা খোলে। গফুর তার পায়ের কাছে গামছায় বাঁধা সের দুই আড়াই চাউল রাখিলে পিসি জিজ্ঞাসা করিল, দাম কত?

গফুর বলিল, আমার মাইয়ার কাছে নেব দাম!

তা'তে দোষ হবে না।

আমি এতটা পথ হাঁটিয়া আইছি। আমারে ফিরাইয়া দিও না।

কথায় কথা বাড়ে। গফুরেরও জিদ চাপিয়া যায়। সে বলে, আমি পয়সা যদি নেই ত হারাম।

গফুর গোলাপীকে ভালবাসে, সে আসিয়াছে স্নেহের তাগিদে। তাকে ফিরাইয়া দেওয়া অন্যায় আবার চাউল রাখিলেও পিসি রাগ করিবে। কি যে করা উচিত গোলাপী ঠিক করিতে পারে না। এই সময় গফুর জিজ্ঞাসা করিল, কি করব মাইয়া? চাউল লইয়া ফিরিয়া যাব?

গোলাপী উঠিয়া বারান্দায় আসিয়া বলিল, চাউল আপনে থুইয়া যান, চাচাজী।

পিসি বিড় বিড় করিতে করিতে ভিতরে চলিয়া যায়। গফুর একটুক্ষণ গোলাপীর দিকে চাহিয়া বলে, পরি থাকলে ঠিক এত বড় হইত। তোমার মতন খুব সুরৎ, মাথায়ও অতখানি। কি কও?

পরি ছিল গোলাপীর চেয়ে খাটো, তার মতন সুশ্রীও নয়। কিন্তু বৃদ্ধ কি শুনিতে চায় বুঝিয়া সে বলিল, হ, চাচাজী।

বৃদ্ধ খুশিমনে চলিয়া যায়। পিসি বলে, গ্রামে যদি রটে গোকলার

বউ গফুরের কাছে বিনা পয়সায় চাউল নিছে তা হইলে কি আর রক্ষা থাকবে? টিটি পড়িয়া যাবে না?

গোলাপী কোন উত্তর করে না। হাঁ কিংবা না বলার মতন উৎসাহও পায় না। পাঁচজন লইয়াই সমাজ, সমাজকে বাদ দিয়া মানুষের চলে না। অথচ এরা কী নিষ্ঠুর, কত ছোট!

তার মন ঘৃণায় রি রি করিয়া ওঠে।

চৌদ্দ

কয়েকদিন পরের কথা। রাত আন্দাজ ন'টা। পল্লীগ্রামের পক্ষে নিশুতি রাতই বলা চলে। ঘুরঘুটি অন্ধকার। চারদিক কালোয় কালোয় ছাওয়া। ভাঁটার টানে আকালের খালের জল নদীর দিকে চলিয়াছে, জল না যেন তরল কালির রেখা। দুপাশে কাদা, মনে হয় কালির গাঢ় পলি।

খালপারে হারাণ নন্দীর বাড়ি, তাদের ঘাটও খালের উপর। প্রথমে নহবতখানা, তারপর পুজামণ্ডপ, নাটমন্দির, নারায়ণের ঘর—লোকে বলে গোঁসাই ঘর। ঘরগুলির পিছনে ধান চালের ছোট বড় কতগুলি গোলা। ঘাটের ডাইনে খালের ধার দিয়া পূর্বপুরুষদের চিতার উপর কতক সমাধি মন্দির, বা মঠ, তার মধ্যে নিধিরাজের মঠই জমকালো।

ঘাটের পাশে তিনখানা নৌকা বাঁধা। সরকারী কাজের জন্য পুলিস কতগুলি নৌকা বাজেয়াপ্ত করে নাই শুধু নম্বর দিয়া রাখিয়াছে। এই নৌকাগুলি সেই ধরনের।

এক দল মুটে নিঃশব্দে নৌকায় মাল তুলিতেছে। চোরও অত চুপিসারে কাজ করে কিনা সন্দেহ। তারা তক্তা বাহিয়া নৌকায়

খোলের মধ্যে মাল ফেলে। উপরে গাছে বাঁধা একটা হারিকেন জ্বলিতেছে। আলোটার তিন দিকই ঢাকা। খোলা দিক দিয়া শুধু মাল তোলার পথের উপর আসিয়া আলো পড়িয়াছে।

পারে দাঁড়াইয়া হারাণের ছোট ভাই পরাণ বস্তা গোনে, একনম্বর পচাঁনব্বই, দুই একশ, তিন নম্বর চুরাশি।

অদূরে জল চৌকিতে বসিয়া হারাণ, কপালে চন্দন-তিলক, গলায় তুলসীর মালা, গায়ে ফতুয়া। ভুঁড়ির বিশালতার জন্য নিচের বোতাম দুইটি লাগান হয় নাই। তার সামনে একটা লণ্ঠন, সে একখানা খাতায় নম্বর টোকে আর মাঝে মাঝে চাপাগলায় বলে, আস্তে।

এত আঁট ঘাট বাঁধিয়া কাজ, এত সতর্কতা তবু ব্যাপারটা চাপা রহিল না। কয়েকটি যুবা যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। জেলা বোর্ডের সড়ক দিয়া ফেরার সময় তারা দেখিল হারাণের ঘাটে মাল তোলা হইতেছে। পোতো বলিল, সর্বনাশ, হারু বেটা চাউল চালান দিতেছে রে।

নরেন বলিল, আমরা মরব না খাইয়া আর হারু লড়াইয়ে চাউল পাঠাবে, তা হইতে দেব না।

এই দলে ভীমও ছিল। সে মুখ দিয়া অস্পষ্ট শব্দ করিল, শব্দটা খাদ্য-শস্য চালানের প্রতিবাদ।

অমর প্রস্তাব করিল, চল সাঁতরাইয়া যাইয়া উঠি।

আপত্তি করিল জনার্দন—এই শীতে আর খালে নামিয়া কাজ নাই।

নরেন বলিল, তুমি কি কও সুকু ভাই ?

অন্ধকারের মধ্যেও অভ্যাস বশতঃ সবাই সুকুর দিকে চায়। সে বাঁ নাকে অল্প একটু নস্য গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল, বাধা দেওয়া দরকার। না দিলে লোভ আরও বাড়বে।

সুকুমার বারুইর ছেলে, তার ভাই চাঁটগায় দারোগা। সেখানে থাকিয়া সে কলেজে পড়িত পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে বেশী পড়িত সাহিত্য

ও রাজনীতি। বন্ধুরা বলিত, লেখাপড়া জানে বটে সুকু। আর তার দারোগা দাদা করিত উষ্মাপ্রকাশ, সুকু হল বংশের কলঙ্ক। আই-এ টাও পাশ করতে পারল না।

দারোগা নিজে চতুর্থবারে তৃতীয় বিভাগে আই-এ পাশ করিয়া মামা শ্বশুরের কৃপায় চাকরি পায়। ছোট ভাই একবার আই-এ ফেল করার পরই সে বলে, এখানে বসে আর অন্ন ধ্বংসে কাজ নেই। যাও, মামাদের ওখানে গিয়ে পানের বরোজ কর।

সুকুমার সেই হইতে গ্রামে গৌরী এম, ই, স্কুলে হেডমাস্টারি করিতেছে। আর করিয়াছে জনকল্যাণের প্রতিষ্ঠা। জনকল্যাণ চাষী মজুরের প্রতিষ্ঠান, এখানে তাদের পড়ানো হয়, নানারকম হাতের কাজ শিখানো হয়। চাষী মজুরেরা তাকে ডাকে সুকুদা, কেহ কেহ বলে সুকু ভাই।

যুবকরা খালে নামিল। ভাঁটার সময়, তাই সাঁতার কাটিতে হইল না। জল কাদা ভাঙিয়া, কাপড় ভিজাইয়া, হাঁটু পর্যন্ত কাদা লইয়া তারা হারাণের বাড়িতে আসিয়া উঠিল।

তাদের বিশেষতঃ সুকুমারকে দেখিয়া হারাণ বিব্রত বোধ করে। বলে, সুকু যে? তুমি—তোমরা এখানে কি মনে করে?

সুকু বলিল, আপনি দেশটাকে ডুবিয়ে দেবেন দেখছি, হারুদা।

হারাণ ব্যবসায়ী সুলভ সহজ কণ্ঠে কহিল, চাউল চালানের কথা বলছ বোধ হয়। ঢাকা ঘাটতি অঞ্চল, ভাই—

সুকুমার বলিল, এটাও বাড়তি অঞ্চল নয়।

হারাণ বলিল, ঢাকার বাঙালীও তোমার ভাই বোন। তাদের খাওয়ান আমাদেরই কর্তব্য।

পোত্তো ছেলেটা মুখফোঁড়। সে বলিয়া উঠিল, ভাইবোনদের খাওয়াতে গিয়ে মণ করা লাভ নিচ্ছেন কত?

তোমরা খালি লাভই দেখতে পাও। দেশের জন্য দশের জন্য লাভ যে অনেক সময়ই ছাড়তে হয় ভায়া।

অমর বলিল, লোকসান দিয়ে দিয়ে একটা ঘরে খালি সোনা মজুদ করেছ।

হারাণ বলিল, সেত বন্ধকি সোনা, পরের মাল। আমরা শুধু বোঝা বইছি। টাকা দিলেই ফিরিয়ে দিতে হবে।

পরের বন্ধকি সোনা ফিরাইয়া দেওয়ার সম্ভাবনাও সে যেন সহ্য করিতে পারে না।

নরেন গোঁফ চুমরাইয়া বলিল, সারা কোটালীরে তুমি না খাওয়াইয়া মারবা, সে আমরা সহ্য করব না।

এক দিকে চলে তর্ক আর এক দিকে মুটেরা তক্তা বাহিয়া সমানে নৌকায় মাল তোলে। তারা স্থানীয় চাষী, মাল টানা তাদের পেশা নয়। সুকুমার একজনের হাত ধরিয়া বলিল, ফটিক, তুমি না চাষী? তুমি বিদেশে চাল চালান দিচ্ছ, এরপর দেশের লোক যে না খেয়ে মরবে।

ফটিক বলিল, আমার ছাওয়াল মাইয়া আজই যে না খাইয়া মরে। এই মজুরি নিয়া কাল চাউল কেনবো, তবে—

সুকু বলিল, আর তুমি ইদ্রিস। ইদ্রিস বলিল, আমি তোমাদের কংগ্রেস আর গান্ধী মানি না। আমি লীগ, আমি মানি জিন্না সাহেবরে।

সুকুমার বলিল, কিন্তু তিনিও ত লড়াইতে সাহায্য করতে নিষেধ করেছেন।

ইদ্রিসের বন্ধু ইস্‌মাইল বলিল, আমরা অতশত জানি না। তোমরা বিদ্বান্, তোমাদের লগে কথায় পারবো না। কিন্তু আমারগো রাস্তা আলাদা, আমরা মোছলমানরা তোমাগো লগে ফারাক্ হইয়া গেছি।

বিশ বছর আগে দেশের মঙ্গলের কোন প্রশ্নকে হিন্দু মুসলমান এই

ভাবে পৃথক করিয়া বিচার করে নাই। সুকুমার তখন ছোট কিন্তু আজও তার মনে পড়ে গান্ধীর ডাকে ওয়াহেদ হোসেন আর এই ইস্‌মাইল আসিয়া কী ভাবে মতিবাবু আর মাখন বাবুর পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন। সেদিন পুলিসের লাঠির আঘাতও তারা সমান ভাবে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। আর আজ?

কিন্তু দোষ কী শুধু তৃতীয় পক্ষের, শুধু সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতাদের? না, এ বিষয়ে কংগ্রেসেরও দায়িত্ব আছে?

নরেন বলিল, দেশের শত্রু হইওনা ইদ্রিস ভাই।

ইদ্রিস বলিল, ঐ তো তোমাদের দোষ। পথ আলাদা বলিয়া তোমরা আমাগো দেশের দুশমন ভাবো তা কিন্তু নয়।

কথায় কথা বাড়ে, সৃষ্টি হয় উত্তেজনার। হারাণ বলে, তোমরা এবাবের মত মাফ করো, ভাই। এবার টাকা আমি আগাম নিয়ে ফেলেছি। এর পর আর চাল চালান দেব না।

পোতো আসিয়া বলিল, এর পর দেবে ধান।

হারাণ বলিল, আমি যে মাজেস্টার বাহাদুরকে কথা দিয়ে এসেছি, সেদিন ওয়ার ফণ্ডের মিটিংয়ে। এখন না দিলে—

পোতো বাধা দিয়া বলিল, তোমায় শূলে চড়াবে।

হারাণ নানা প্রলোভন দেখায়, গৌরীগ্রামের লাইব্রেরীতে, জনকল্যাণের নৈশ বিদ্যালয়ে মোটা চাঁদা দিবে—গ্রামের বারোয়ারি পূজায় দিবে একপালা যাত্রার খরচা।

এই সময় পিছন হইতে আসিয়া হরিমতী বলিয়া উঠিল, জরিমানাটা কিসের শুনি? নিজের পয়সায় করবো কারবার, হাবাজিরারা তাতেও বাদ সাধবে!

তার আকস্মিক আবির্ভাবে মুহূর্তের জন্য সকলে স্তব্ধ হইয়া যায়। মাল তোলা বন্ধ রাখিয়া মুটেরাও তার দিকে চাহিয়া থাকে।

হারাণ বলিল, তুমি, তুমি এখানে কেন, হরি ? মেয়েদের এসবে থাকতে নেই। ভেতরে যাও।

হরিমতী বলিল, যাও, হাঁসের মত আর প্যাঁকপ্যাক করিও না। মাইয়া মানুষ হইছি বলিয়াই ছোট হইছি নাকি ? তোমরা অকর্ম্মা বলিয়াই ত বাবা আমারে কর্তা করিয়া গেছে। না হইলে আমার কি ঘর বাড়ি নাই ? সোয়ামীর ভিটা ছাড়িয়া এখানে আছি ত তোমাগো জন্য।

ভাইকে কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়াই সে মুটেদের হুকুম করিল, দাঁড়াইয়া কেন তোরা ? নে, মাল তোল্।

মুটেদের কেহ কেহ ইতস্তত: করে, কেহ বা ভয়ে ধানের গোলার দিকে আগাইয়া যায়। ফটিক নন্দীদের প্রতিবেশী। হরিমতীকে সে ভয় করে, তার কাছে টাকাও ধারে। হরিমতী তাকে ধমক দিল, তোল্, মাথায় বস্তা তোল্।

ফটিক মাথার বস্তা তুলিয়া চলিতে আরম্ভ করে। পাশে চলে হরিমতী, একরূপ তার গা ঘেঁষিয়া বলিলেই হয়।

ভীম এতক্ষণে কোন কথা বলে নাই। সে এবার আগাইয়া আসিয়া বলিল, তুমি সরিয়া যাও, হরিদি।

হরিমতী বলিল, কেন রে নির্বংইশা ?

ভীম ফটিকের মাথার বস্তাটা টানিয়া ফেলিয়া দিল। পাশেই ছিল ফটিকের জ্ঞাতি ভাই আকালী। সে জোয়ান মরদ, আসিয়াছে হারাণের মাল টানিতে। সে বলিল, মাল ফেললি যে ভীমা, গায়ে তেল হইছে বুঝি ?—বলিয়াই ভীমের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। শুরু হয় মল্ল যুদ্ধ।

ভীম তাকে কাবু করিয়া ফেলিলে হারাণের দারোয়ান শুকরমন ছুটিয়া আসিয়া তার মাথায় লাঠি মারিল। ঠন্ করিয়া শব্দ হইল।

পলকের মধ্যেই ভীমদের কজনকে ঘিরিয়া ফেলিল হারাণের মনিষ-মজুররা, দারোয়ানরা। কে যেন দিল কাছের আলোটা নিভাইয়া। অন্ধকারের মধ্যে গালাগালি কিল ঘুষির শব্দ ছাপাইয়া এক একবার শুনা যাইতেছিল হরিমতীর কণ্ঠ—মারো, মারো সুরযমল, বেটাগো শিক্ষা দিয়া দাও।

এই পুরুষালি কর্কশ কণ্ঠে সুরযমল উৎসাহিত হইয়া উঠিতেছিল।

*　　*　　*　　*

রাত্রির তৃতীয় প্রহরের জোয়ারে মাঝিরা চাউল সমেত নৌকা ছাড়িয়া দেয়। তাদের সঙ্গে যায় বন্দুকধারী দুইটি পুলিশ ও লাঠিধারী সুরযমল।

ভোরে গৌরীগ্রামে রটিয়া গেল হারাণ নন্দী লড়াইয়ের জন্য চাউল চালান দিয়াছে। সুকুমার জনকল্যাণের কয়েক জনকে লইয়া বাধা দিতে গেলে হারাণের লোকেরা তাদের মারধর করিয়াছে। সবচেয়ে বেশী মার খাইয়াছে ভীম।

খবরটা বেলা দেড় প্রহরের মধ্যে আশপাশের পাঁচ সাত দশ গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল। চাষী মজুরের দল বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সুকুমার সংযত না করিলে সে বিক্ষোভ যে কতদূর গড়াইত বলা যায় না।

পরান সুকুমারদের বিরুদ্ধে থানায় ডায়েরি করিতে চাহিল। দাদাকে বলিল, দাও সার্কেল অফিসার ও এস, ডি, ও'র কাছে রিপোর্ট পাঠিয়ে। তারা ত তোমার বন্ধু, দেবে বেটাদের জব্দ ক'রে।

হারাণ বলিল, ওদের আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই। দেখি না কোথায় জল কোথায় গড়ায়।

তুমি এই ছোটলোকদের ভয় কর?

হারাণ মালা জপিতে জপিতে বলিল, শ্রীহরি, শ্রীহরি।

সে যেন আগামী যুগের এই ছোট লোকদের প্রতিরোধ শক্তিকে

নিজের চোখের উপর দেখিতে পাইতেছিল। এই শ্রীহরি বোধ হয় সেই সম্ভাবনারই ইঙ্গিত। পরান তার তাৎপর্য বুঝিল না।

গোলমাল আর কিছু হইল না বটে তবে সারা পরগনা জুড়িয়া শুধু চাষী মজুর নয় গরিব ভদ্র শ্রেণীর মধ্যেও হারাণের বিরুদ্ধে একটা চাপা অসন্তোষ রহিয়া গেল। নিজের গানের মধ্যে সেই অসন্তোষকে রূপ দিল মানিক। পীতাম্বরের জাঙাল, নিধের খাল আবার চালু হইল।

খালটা যখন কাটানো হয় সেই সময় হারাণের বাবা পীতাম্বর ধনী যুবক। সদ্য পিতৃহীন। পাশের গ্রামের এক নারীকে হত্যা করার অভিযোগে পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করে। পীতাম্বরের লোকেরা বলিত, সাজানো মামলা। ওর পয়সা আছে কি না তাই সবার চোখ টাটিয়েছে।

তারা যাহাই বলুক না কেন পীতাম্বরের জেল ছিল সুনিশ্চিত। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট খালের জন্য দশ হাজার টাকা আদায় করিয়া তাকে মুক্তি দেন। এই কৃপণ মানুষটার মোটা টাকা বাহির হইয়া যাওয়ায় দেশের প্রায় সবাই খুশি হয়। তারাই নাম দেয় নিধের খাল, পীতাম্বরের জাঙাল।

ইদানীং নাম দুইটা চালু ছিল না। মানিক পুরাতন ক্ষত আবার খোঁচাইয়া তুলিল। হারাণ জিনিসটাকে উপেক্ষা করিল কিন্তু উপেক্ষা করিতে পারিল না পরান ও হরিমতী। বিশেষতঃ হরিমতী। তার বিশ্বাস নিধিরাম ও পীতাম্বরের নাম ডাক মান মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব এখন তার।

পনর

গোলাপীর নিয়মিত কোন কাজ নাই। যখন যা পায় তাই করে। কারও ধান ভানে, কারও ঘরের পোঁতা বাঁধিয়া দেয়। ক্রিয়া কর্ম উপলক্ষে জ্ঞাতি কুটুম্ব বাড়িতে রান্না করে। দিন কোন রকমে চলিয়া যায়।

আজ কয়দিন যাবৎ সে নন্দীদের কাজ করিতেছে। কাজ চিঁড়া মুড়ি ভাজা। নিজ বাড়িতে ভাজিয়া নন্দী বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে হয়। কাজ বুঝিয়া নেয় হরিমতী।

সেদিন গোলাপীকে আধ ঘণ্টার উপর অপেক্ষা করিতে হইল। হরিমতী স্নান সারিয়া 'পতি পরম গুরু' মার্কা চিরুণী দিয়া চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে আসিয়া বলিল, কিরে মুড়ি আনছ ?

গোলাপী বলিল, হ দিদি। লণ্ঠনটাও আনছি। লবণ আর মুড়ি ভাজার ঝাঁজর কাল দিয়া যাব।

হরিমতী মুড়ি ভাজার নুন বালি সবই দেয়। এবার কাজ বেশী, রাত্রেও করিতে হইবে তাই লণ্ঠন এবং কেরোসিন দিয়াছিল। সে বলিল, কাল দিস কিন্তু মনে করিয়া। তুচ্ছ জিনিস, আমারগো মনেও থাকে না।

কুনকে করিয়া মুড়ি মাপা শেষ হইলে আবার বলিল, এ কী! আধা সের কম যে ?

গোলাপী বলিল, কাল সারা বিকাল ভাজছি। খিদা পাইছিল, ছাওয়াল মাইয়া লইয়া রাত্তিরে চারডি খাইলাম।

হরিমতী সুর করিয়া বলিল, তোরগো খিদার বলিহারি। খই, চিঁড়ার সময়ও পাইছিল বুঝি ?

কেন, খই চিঁড়াও কম হইছিল, না কি? আমরা ত একটা কণাও দাঁতে কাটি নাই।

তেমন করিয়া কি আর মাপছি? নে, একটা টাকা ধর। এই টাকা দিয়া আমার জন্ম দু' আনার তামুক পাতা আনিস। মোতিহার।

গোলাপী বলিল, আমার দু'আনা পয়সা কাটলা বুঝি? কথা ছিল এক টাকা দেওয়ার।

হরিমতী বলিল, তা যদি মনে করিস্ ত কাটলাম। আজ কাল কি আর দুই আনায় আধা সের মুড়ি পাওয়া যায়? তার উপর খই চিঁড়া আছে, চাপলাশ ধানের চিঁড়া।

গোলাপী নীরবে চলিয়া যাইতেছিল। হরিমতী ডাকিল, শোন্। কয়টা মাছ কুটিয়া দিবি? বউরা কই শিঙি কোটতে পারে না। এ বেলা খাবিও এখানে। ছোট বউর আজ ভাজা পোড়ার সাধ।

গোলাপী বলিল, বড় বেলা হইয়া গেছে দিদি। হাতে ঠেকা কাজ আছে, এখুনি যাইতে হবে।

হরিমতী টিপ্পনী করিল, তোর গো ঠেকাও বেশী।

তাকে অখুশি করিয়াই গোলাপীকে যাইতে হইল। সময় ছিল না। কয়েক বাড়ি দুধ দোহানো আছে। এক বাড়িতে আছে হাঁড়ি কড়াই মাজা, তাদের আঁতুড় উঠিবে। বাড়ির গিন্নী বলিয়াছেন, নগদ দু'আনা দিবেন এবং কুমির জন্ম পুরানো একটি ফ্রক।

গোলাপী যাওয়ার সময় হরিমতী বলিল, খাইতে আসিস কিন্তু কুমিরে লইয়া।

হাঁড়ি কড়া মাজিতে দেরি হইয়া গেল। যা কথা ছিল বাসন তার চেয়ে অনেক বেশী। প্রায় সকল বাড়িতেই এরূপ হয়। গোলাপী কোন উচ্চ বাচ্য করে না।

কিন্তু তাকে বিদায় করার সময় বাড়ির কর্ত্রী পুরানো ফ্রকটা আর খুঁজিয়া পাইলেন না। তার বাবদ দু'আনা পয়সা দিলেন।

বাড়ি ফিরিয়া গোলাপী কুমিকে তেল মাখাইয়া স্নান করাইল, তার চুল আঁচড়াইয়া দিল। কুমিকে মানাইল বেশ, ডাগর চোখ, হাসি হাসি মুখ।

ফ্রক না পাইয়া কুমি কাঁদে। গোলাপী বলে, দারোগা বাড়ি পোঁতা বাঁধা শেষ হইলে তারা একটা ফ্রক দেবে কইছে।

কুমি বলে, তুই বড মিছা কথা কও, মা।

নন্দী বাড়িতে নিমন্ত্রিতাদের বৈঠক বসিয়াছে। মেয়েদের সাধারণতঃ দেখা শুনা হয় কম, তাই একবার দেখা হইলে কথা আর ফুরায় না। নিমন্ত্রণ ভাতের, কিন্তু উপকরণ প্রচুর। সেই জন্য উঠিতে সময় লাগে।

কুমি ঘ্যান ঘ্যান করে, খিদা পাইছে, মা। আমারে খাইতে দে।

এত বেলায় ক্ষুধা পাওয়া খুবই স্বাভাবিক কিন্তু গোলাপীর লজ্জা করে। লজ্জা গরিব বলিয়া। সে মেয়ের মুখ চাপিয়া বলে, চুপ, চুপ।

বৈঠক উঠিতে লাগিল প্রায় এক ঘণ্টা। নিমন্ত্রিতারা পাত্তা ছাড়িলে হরিমতী গোলাপীকে বলিল, তুই কলস জল আনিয়া দিবি? তার পর ঘর খানা সাফ করিয়া খাইতে বসবি।

গোলাপী বলিল, জল আনিয়া দিতেছি। কিন্তু কুটুম্ব সাক্ষাতগো সামনে আঁঠিয়াটা আর তোলব না।

'আচ্ছা' বলিয়া হরিমতী চলিয়া গেল বটে কিন্তু মনে হইল যেন রাগে ফাটিয়া পড়িতেছে।

নূতন বৈঠক বসিল। বৈঠকে আত্মীয় স্বজন অনেক, চেনা প্রায় সবাই। তাদের সামনে নিজের দৈন্যে গোলাপী যেন এতটুকু হইয়া

যায়। কুমি সুশ্রী বলিয়া একটু আগেও মনে যে সান্ত্বনা ছিল ছেঁড়া কাপড়ের গ্লানি সেই সান্ত্বনাকে ঢাকিয়া দিয়াছে।

ভাজা পোড়ার পর আসে ভাত, ডাল, শুক্ত ও মাছ ভাজা। মুড়ি চিঁড়ার মোয়া তাদের পাতে ছোটই পড়িয়াছিল কিন্তু ভাতের সঙ্গে মাছ ভাজার টুকরা দেখিয়া, মনে হইল গোলাপী ও তার মেয়ের জন্যই যেন ঐ দুখানা অত ছোট করিয়া কোটা হইয়াছে।

পানতুয়া ছিল নিমন্ত্রণের বড় আকর্ষণ। উহা পরিবেশনের ভার হারাণের মামাতো বোন লীলার উপর। সে আশে পাশে সকলকে পানতুয়া দিয়া গেল। বাদ পড়িল কুমি আর তার মা। কুমি চেঁচায়, আমারে দাও।

হরিমতীর নিষেধ ছিল। লীলা বলিল, পানতোয়া তোরগো জন্য না। তোরা ঘরের লোক।

গোলাপী বোঝে এই ব্যবস্থা মাছ কুটিতে ও এঁটো পরিষ্কার করিতে না চাওয়ার শাস্তি।

লীলা এক বালতি শেষ করিয়া আর এক বালতি পানতুয়া আনে। এবারও কুমি পায় না। সে কান্না জুড়িয়া দেয়, ঐ লাল লাল মিষ্টু আমারে।

সকলের চোখ পড়ে তার উপর। গোলাপী মেয়েকে ধমক দেয়, চুপ্ কর্, রাক্ষুসী।

ভন্তু নামে একটি ছেলে চীৎকার করিয়া ওঠে, পি, পি।

ঘর ময় ওঠে হাসির লহর। গোলাপীর আর সহ্য হয় না।

'চল্ আমরা উঠি' বলিয়া মেয়েকে লইয়া সে উঠিয়া পড়ে।

হরিমতী আড়ালে দাঁড়াইয়া ওৎ পাতিয়া সব লক্ষ্য করিতেছিল। সে এবার গোলাপীর সামনে আসিয়া বলিল, কাঙাল হইলে কি সরমও থাকতে নাই?

গোলাপীর মুখ রাগে সাদা হইয়া গেল। সে বলিল, না, থাকে না, তোমরা দেও না থাকতে।

বলার সময় তার ঠোঁট কাঁপে, কথা স্পষ্ট বাহির হয় না।

... ...

হরিমতী বলিল, কী আমার মুখের উপর কথা! এত আস্পদ্দা? বাইর হ, বাইর হ। ভাতের জন্য কুকুরের মতন আবার আসবি ত লাথি মারিয়া—

উঃ উঃ—কাতর শব্দ করিয়া গোলাপী কুমিকে টানিয়া লইয়া ঘরের বাহির হইয়া যায়। নিমন্ত্রিতারা নীরবে সব দেখিতেছিল। হরিমতী তাদের দিকে চাহিয়া বলিল, মাগীর পেটে ভাত নাই, কোমরে কাপুড় নাই কিন্তু ছ্যাথলা ত্যাল। কর্ নয় আমারেই অপমানি কর্, তা না অপমান করলি অতিথগো।

কেহ কোন কথা বলে না। হরিমতী আবার বলে, আরে, পানিতোয়া কি দিত না? এট্টুও দেরি সইল না। হাবাতিয়া আবার কয় কারে?

ভক্ত বলিল, লীলাদি দেবে নাই ত কইছিল।

লীলা বলিল, আমি কইছি পান্তয়া ঘরের লোকের জন্য না। যদি থাকে ত পরে দেব।

ভক্ত আবার চীৎকার করিয়া উঠিল, পি, পি।

... ...

নন্দী বাড়ির বাহিরে আসিয়া গোলাপী কুমির গালে গোটা দুই চড় মারিয়া বলিল, লাল মিষ্টু খাবে। মর্ মর্ রাক্ষুসী।

ছেলে মেয়ের গায়ে সে কখনও হাত তোলে না তাই মার খাইয়া কুমি অবাক্ হইয়া যায়। ব্যথা সে পায় খুবই, গালে মায়ের পাঁচ পাঁচটা আঙুলের লাল ছাপ পড়ে কিন্তু সে কাঁদে না। গোলাপীও চক্ষু মুছ-

চালিতের মতন, কোন দিকে তাকায় না, কিছুই খেয়াল করে না, শুধু প্রতি পদক্ষেপে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়। মনে হয় ভিতরে ভিতরে আক্রোশে ফাঁপিয়া ফুঁলিয়া উঠিতেছে। এক একবার সে কানের কাছে যেন একটা মাছির ভন ভনানি শুনিতে পায়, কুকুরের মতন ভাতের জন্য—

মানিক বাড়ি ছিল না। সন্ধ্যার পর আসিলে গোলাপী তার মুখখানা দুই হাতের মধ্যে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, পারবি, পারবি তুই ?

কিছু না বুঝিয়াই সে বলিল, হ, পারব।

আমারে যে অপমানি করছে কুকুর কইছে তার উপর প্রতিশোধ নিবি। বুঝলি ?

অন্ধকারের মধ্যে মানিকের মনে হইল তার মায়ের চোখ দু'টা যেন জলিতেছে। কার উপর যে প্রতিশোধ সে সম্পর্কে কোন প্রশ্ন না করিয়াই সে জোর দিয়া বলিল, তুই যা কবি, তাই পারব। আমি যে বড় হইছি।

রাত্রে সব শুনিয়া সে কহিল, মা তুই অপমানি হইছ আমার জন্য।

কেন, তুই করছ কি ?

আমি পীতাম্বরের আড়ালের গান বাঁধছি। হরি কাবুল রাগছে সেই জন্য।

পিসি এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। সে বলিল, কাবুলরে তুই শুনাইয়া দিতে পারলি না গোলাপ ? আমি হইলে অর নাক কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া আনতাম।

কুমি হাসিয়া বলিল, বেশ হইত। আমরা তেল দিয়া ভাজিয়া কুড়মুড়াইয়া খাইতাম। না পিসি ?

সন্ধ্যার পর পরানের বৌ হরিমতীকে বলিল, গোলাপ তোমার তামুক পাতা দিয়া গেছে।

হরিমতী বলিল, দিল কখন ?

খাওয়ার আগে। ঘাটে যখন জল আনতে যায় সেই সময়। আমি কইতে ভুলিয়া গেছি।

দে ভাই, তাড়াতাড়ি দে। দাঁত নিয়া কী কেলেশেই না পড়ছি।

খোল

খালি নন্দী বাড়ির রোজগার দিয়াই গোলাপীর চলিত না বটে কিন্তু তারা ছিল তার প্রধান অবলম্বন। নন্দীদের সংসার বড়, চাকর বাকর কিষাণ মজুর অনেক। কাজও প্রায় লাগিয়াই আছে।

গোলাপী নরম স্বভাবের মানুষ, ফাঁকি দেয় না, দরদস্তুর করে না, বেশী কাজ দিলেও মুখ বুজিয়া করিয়া যায় তাই প্রায়ই তার ডাক পড়ে।

ঐ বাড়ির কাজ বন্ধ হওয়ায় সে অসুবিধায় পড়িল। সংসার অচল। ভাত জোটে ত নুন জোটে না। লজ্জা নিবারণ করার মতন একখানা কাপড়ও নাই।

মাস খানেক পরে একদিন উলকি পিসি বলিল, বাগানের উত্তর পাড়ে মহিম বাবুর বাড়ি কাজ আছে। করবি ? তবে জায়গাটা একটু দূর।

গোলাপী বলিল, আমার কাছে দূর আর নিকট সবই সমান পিসি। অরগো দুইটারে এখন বাঁচাইয়া রাখতে পারলে হয়।

বেশ। কাল হইতেই করতে পার। দেবে থোবে ভাল। এক মণ ধান ভানলে পাঁচ সের চাউল পাবি। খুদ, কুঁড়া, তুষ ত আছেই। তার উপর জালানিও দেবে।

অন্য বাড়িতে জালানি দেয় না। নিজের বাড়িতে ধান আনিয়া

নিজের জ্বালানি দিয়া সিদ্ধ করিতে হয়, আবার পৌছাইয়া দিতে হয়। ঝামেলা অনেক। তার উপর মণ প্রতি চার সেরের বেশী চাল দিতেও নানা ওজর আপত্তি করে।

গোলাপী জিজ্ঞাসা করিল, কাজ থাকবে কতদিন ?

তা কিছুদিন থাকবে। মহিম পুবে কোথায় যেন নায়েবী করে। ছুটিতে বাড়ি আইছে।

বেশ, আমি কাল হইতেই যাব। তুমি তানারগো খপর দেও।

পরের দিনই গোলাপী নূতন কাজে যায়। পথে সিকির বাজার। এই অঞ্চলে হাট বাজারের উপর দিয়া ঝি বউরা যাতায়াত করে না। গেলে সঙ্গে অন্তত ছোট একটি ছেলে বা মেয়ে লইয়া যায়। না হইলে লোকে নিন্দা করে।

গোলাপী নাক পর্যন্ত ঘোমটা টানিয়া বাজারের উপর দিয়া যাইতেছিল। সেখানে একদল যুবক এক চায়ের দোকানে বসিয়া জটলা করিতেছিল। তাকে দেখিয়া তারা উল্লসিত হইয়া ওঠে, কুৎসিত টিপ্পনী করে। কথাগুলি গোলাপী ঠিক শুনিতে পায় না। কিন্তু তারপর দ্রুত চলিতে যাইয়া হোঁচট খায়। ওঠে হাসির লহর।

ছেলেদের মধ্যে অনেকেই ভদ্র সন্তান। দু একজন গোলাপীর মুখ চেনা। তাদের এই ইতরামি দেখিয়া সে অবাক হইয়া যায়।

মহিমের স্ত্রী ভানুমতী পুকুরের জলে নাক ডুবাইয়া সূর্যের দিকে চাহিয়াছিল। আঁজলা ভরা জল তুলিয়া জলের উপরই চালে আর বলে, ফট। বয়স বেশী নয় কিন্তু এর মধ্যে মাথার প্রায় সব চুলই পাকিয়াছে। পিসি কালই বলিয়াছিল, সেদিন মহিমরে দেখলাম এক কৌটা ছাওয়াল, কোলে কাঁখে করলাম। মাথায় ঘি দিয়া তার বউও ক্যাশ পাকাইল। পোড়া কপাল!

গোলাপীকে দেখিয়া ভানুমতী বলিল, এসো, তুমিও একটা ডুব দিয়ে নাও।

গোলাপী তার দিকে চাহিয়া থাকে। ভানুমতী বলে, কায়েত বাড়ির কাজ, শুচি-শুদ্ধ মতন করতে হবে ত।

সারা দিন ভিজা কাপড়ে থাকব কি করিয়া?

কেন, তুমি কি এক কাপড়ে কাজ করতে এসেছ নাকি?

গোলাপী বলিল, কাপড আমার এই একখানা।

বুড়ী খুব ভাল লোক পাঠিয়েছে ত—একটু থামিয়া ভানুমতী আবার বলিল, যাক, আগে ডুব ত দাও।

অদ্ভুত ঠাণ্ডা জল। নিচে হাঁটু পর্যন্ত পাঁক, জলে নামার সঙ্গে ভুড় ভুড় শব্দ হয়। গোলাপী একটা ডুব দিয়াই উঠিয়া পড়ে। ভানুমতী বলে, দাঁড়াও, উঠে কাপড় দিচ্ছি।

উঠিল সে আরও মিনিট পনর পরে। ঘরে যাইয়া গোলাপীকে একখানা শাড়ি আনিয়া দিল। ছেঁড়া নয় কিন্তু শাড়ি খানা এত জীর্ণ যে মনে হয় শরীরের ছোঁয়া লাগিলেই ফাঁসিয়া যাইবে। গোলাপী অতি সন্তর্পণে সেখানা পরিল।

দুপুর হেলিয়া গেলে তার খাবার আসিল চিঁড়া, মুড়ি ও ঝোলা গুড়। ভানুমতী বলিল, সব এঁটো হবে বলে ভাতের কারবার আমি করি না। ছোলা চিঁড়ে চিবিয়েই কাটিয়ে দি।

দিনের বেলায় গোলাপীকেও ছোলা, চিঁড়া গুড় মুড়ি খাইয়াই কাটাইতে হয়। সপ্তাহে একদিন হয়ত ভাত জোটে। তা ছাড়া স্নান করিতে হয় দুই তিন বার। পথে হাঁটিয়া আসার জন্য একবার ত আছেই, তার উপর ভানুমতী কখনও বলে, এঁ্যা, এঁটোটা মাড়ালে! যাও চান করে এস।

কখনও বা তার মনে পড়ে, কাল বৈকালে শেওড়া গাছের নিচে,

একখানা হাড় লইয়া দুইটা শকুন কাড়াকাড়ি করিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গেই গোলাপীকে ডাকিয়া বলিল, তুমি শেওড়া তলা দিয়ে বাগানে গিছলে না? যাও একটা ডুব দিয়ে এস।

ডুব দিয়া আর জল ঘাঁটিয়া গোলাপীর সর্দি হয়। একদিন শরীর খারাপ বোধ হওয়ায় সে ভানুমতীকে বলিল, গা গতরে বেদনা, মাথা-টাও ভার হইছে। আজ আর নাব না।

ভানুমতী বলিল, সে তুমি ভেবে দেখ। এত পথ এলে এখন কাজ না করে ফিরে যাবে? না নাইলে বাড়ির কত্তা পর্যন্ত কিছু ছুঁতে পায় না, তার নিজের বাক্সও নয়।

গোলাপী বলিল, তুমি সেদিন বাগানের আগাছা কাটতে কইছিলা। আজ নয় তাই করি।

তা হলেও নাইতে হবে। কে জানে কোন্ আগাছার গোড়ায় কোন্ দেবতা বসে আছে?

স্নান না করিলে ভানুমতী কাজ করিতে দিবে না। একদিনের মজুরি নষ্ট হইবে। গোলাপী তাই পুকুরে নামিল।

ভানুমতী বলিল, ডুব দিয়ে জলের মধ্যেই বলবে, ওঁ ফট্ ফট। তোমার উপর খুশি হয়েছি তাই বললুম। নইলে এ মন্তর আর কাউকে শেখাই না।

ভানুমতীর "ওম্ ফটে" কোন ফল হইল না। দুপুরের কিছু পরে জর গায়ে লইয়া গোলাপীকে ফিরিতে হইল। শরীর বয় না, মনে হয় অপর কাহাকেও টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। পিছন হইতে কে যেন ধাক্কা দেয়, কানে তালা লাগে।

রাস্তায় কী ধুলা! দু ধারের ঘাস প্রৌঢ়ের দাড়ির মতন ধূসর। ধুলার রাশি তার চার ধারে ঘুরপাক খায়।

অনেকটা রাস্তা, পথে তিন তিনটা বাঁশের সাঁকো। কি করিয়া

যে যে এইগুলি পার হইয়া আসিল তাহা নিজেও জানে না। উঠানে পৌঁছিয়া কুমিকে ডাকিয়া বলিল, চাটাই পাতিয়া দে আর জল।

মায়ের কণ্ঠস্বরে কুমি ভয় পাইয়া যায়। চাহিয়া দেখে তার সব শরীর ধুলায় ঢাকা। চাহনি কেমন যেন অস্বাভাবিক, এমনটি সে কখনও দেখে নাই।

গোলাপী ভুগিল মাত্র আট দশ দিন। কিন্তু এই কয়দিনেই অসম্ভব কাহিল হইয়া পড়িল। শরৎ ডাক্তার কহিলেন, ভাগ্যিস ঠিক সময় ধরা পড়েছিল। ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার প্রায় সবগুলি কেসই এবার খারাপ হয়েছে।

পিসি ও মানিক সেবা করিল খুবই। বৃদ্ধা পর পর কয়েক রাত ঘুমাইল না। গোলাপী বলিল, পিসি, এবার বাঁচিয়া গেলাম তোমার জন্য।

পিসি বলিল, সারিয়া ওঠছ সতী বলিয়া।

গোলাপী বলে, সতীর কি মরণও নাই, পিসি?

কত দুঃখে যে সে ইহা বলিতেছে বুঝিতে পারিয়া উলকি পিসির চোখ ছলছল করিয়া উঠিল।

গোলাপী বলিল, তুমি না থাকলে আমরা উপাস করিয়া মরতাম, পিসি। এই তো এবারই কত করলা।

পিসি বলিল, আমি আর করছি কি? করছে ভীম চন্দর। রাত্তির জাগা, গৌরনদী যাইয়া ছুঁচের ওষুধ আনা, সবই সে করছে।

টাকা! টাকা দিছে কেডা?—গোলাপী প্রশ্ন করে।

পিসি বলে, বেশীই দিছে ভীম।

আশ্চর্য মানুষ এই ভীম। গোলাপী সুস্থ হওয়ার পর একবার মাত্র সে আসিয়াছে। অথচ তার যখন সংজ্ঞা ছিল না তখন কী পরিশ্রমই না করিল। নিজের কাজ বন্ধ করিয়া গোলাপীর বাড়িতেই কয়দিন কাটাইল।

নিজ বাড়ি হইতে সে কুমি ও মানিকের ভাত আনিত। যে কয়দিন পিসি কবিরাজ বাড়ি যাইতে পারে নাই সেই সেইদিন তার খাবারও আনিয়াছে।

তার এই অকৃপণ দানের কথা শুনিয়া গোলাপীর কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হয়। মন একটু নরমও হয়।

এই সময় একদিন মানিক কোথা হইতে যেন হন্তদন্ত হইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসে। তার চাহনি অস্বাভাবিক; ত্রস্ত চঞ্চল। জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে বলিল, মা আমি প্রতিশোধ নিছি।

গোলাপী বুঝিতে পারে না।

তুইই ত নিতে কইছিলি—বলিয়া মানিক কাপড়ের তলা হইতে একটি থলি ও একটি পিতলের ডিবা বাহির করে। দু'টাই হরিমতীর। তার টাকার থলি ও তামাকের কৌটা।

নিজের চোখকে গোলাপীর বিশ্বাস হয় না। এবার অসুখের পর মাঝে মাঝে ভুল দেখে। এই ত সেদিন। সে খালধারে বসিয়াছিল, মনে হইল গোকুল সামনে দাঁড়াইয়া। সে একগাল হাসিয়া বলিল, আইস।

পাশে ছিল কুমি। সে বলিল, কারে ডাকতেছ মা?

গোলাপীর সম্বিত ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু আজ ত ভুল নয়। সে অন্যমনস্কভাবে কৌটা নাড়িতে নাড়িতে বলে, তুই শেষটায় চোর হইলি? চোর! অমন মানুষের ছাওয়াল তুই। তারপরই চোখ তুলিয়া দেখে ছেলে সামনে নাই। কি যে করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। টাকার থলে ও কৌটা ফিরাইয়া দেওয়া অসম্ভব; তাহা হইলে বিপদ ডাকিয়া আনা হইবে।

মানিক সকালে মজুমদার বাড়িতে পান্তাভাত খাইয়াছে। কুমি আর সে খাইয়াছে আধ পেটা। ঘরে আর খুদ কণা নাই। তিনজনের

কারও পরার কাপড় নাই। তার একখানা আছে, উহাও শতচ্ছিন্ন। মানিক জেঠার দেওয়া চাদর পরিয়া কাটায়। কুমির সারাটা শীত কাটিল ছেঁড়া কাপড পরিয়া। গোলাপী তার গলায় জীর্ণ কাপড়ের টুকরা বাঁধিয়া তাকে রোদে বসাইয়া রাখিত। রোদের সঙ্গে সঙ্গে কুমি সরিয়া বসিত।

গোলাপী টাকার থলি নাড়ে আর তার মনে পড়ে এই সব কথা। টাকার ঝন্‌ঝন্ শব্দ ভারী মিষ্টি লাগে।

পাশ দিয়া পিঁপড়ার সারি উত্তর মুখো যায়! সাদা কি একটা গুঁড়া মুখে করিয়া আর এক সারি ফিরিয়া আসে।

গোলাপী ভাবে ভগবান খুদে পোকামাকড়দেরও খাবারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পিঁপড়াও খাবার জমাইয়া রাখে আর মানুষ হইয়া তারা মরে উপবাস করিয়া!

সাত পাঁচ ভাবিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া সে টাকা কয়টি বাহির করিয়া থলি ও কৌটা খালে ফেলিয়া দেয়। পরক্ষণেই দেখে, কুমি পাশে দাঁড়াইয়া। তাকে বলে, কাউরে কবি না যেন, খবরদার।

কুমি বলে, না মা। কব কেন? কটুয়াটা হরি পিসির। থলিয়াটা যেন কার? কি আছে ওতে

গোলাপী ধমক দেয়, চুপ।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া মানিক ফিরিল সন্ধ্যার সময়। গোলাপী বলিল, বা, কাজী বাড়ি যাইয়া এক টাকার চাউল নিয়া আয়। বেশী লোক টের পায় না যেন।

মানিক কহিল, তা বুঝছি মা।

ঘরে কয়েক দিনের অন্নের সংস্থান হইল। তিনজনেরই একখানা করিয়া কাপড় হইল। কুমির অতিরিক্ত একটা ফ্রক।

গোলাপীর কাজে ও কথায় গোপনতা ঢুকিল এই প্রথম। ব্যাপারটার সঙ্গে সে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিল না।

সে ভাবে, এ কী! ছেলেটা শেষটায় চোর হইল। শুধু কি মানিক, সে নিজেও ত—

আমি প্রতিশোধ নিছি।—মানিকের এই কথার মধ্যে সে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করে বটে কিন্তু মন এই গোঁজামিলে সায় দেয় না।

সতের

ফাল্গুনের মাঝামাঝি মানিক একদিন বলিল, মা আমি জমির কাজ করব।

গোলাপী বলিল, জমির কি কাজ করবি? এক রত্তি ছাওয়াল তুই।

ইদানীং মানিক হঠাৎ লম্বা হইয়া উঠিয়াছে। বয়সের তুলনায় তাকে বড়ই দেখায়।

কেন, আমি ত আর ছোট না—বলিয়া সে ঘাড় সোজা করিয়া দাঁড়ায়। পা হইতে মাথা পর্যন্ত সমস্ত অঙ্গই যেন টানিয়া বাড়াইবার চেষ্টা করে। গোলাপী হাসিয়া বলে, হ, বড় ত হইছই। আরও একটু বড় হ।

মানিক বলিল, আমার বয়সে বাবাও ত মাঠে যাইত।

কইছে কেডা?

ভীমকা। তার সঙ্গে আমি মাঠে যাব।

বেশ, যাস পরের বছর।

না মা এখনি যাই। তোর এত দুখ।

হরিমতীর সামান্ত টাকা কয়টি ফুরাইয়া যাওয়ার পর আবার অভাব শুরু হইয়াছে। দিন কালও ক্রমেই খারাপ হইতেছে। সব জিনিসের দাম বাড়ে—মাসে মাসে, সপ্তাহে সপ্তাহে। অনেক সময় পয়সা দিয়াও জিনিস পাওয়া যায় না।

হরিমতীর হাতে মায়ের লাঞ্ছনার পর মানিক প্রায়ই ভাবিত, কি করিয়া তার কষ্ট লাঘব করিবে। এইজন্য সে তার ভীমকাকার কাছে যায়। পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে। সে বলে, মাঠে নামিয়া পড়্।

মানিক সুকুমারের কাছে গিয়াছিল। সেও সেই পরামর্শই দিল। শেষ পর্যন্ত মাকে রাজী করাইয়া চৈত্রের প্রথমে মানিক একদিন ভীমের সঙ্গে মাঠের কাজে বাহির হইয়া গেল।

ভোর হইয়াছে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় ঘুমন্ত ধরণী সবে চোখ মেলিয়া চাহিয়াছে। গাছপালা লতাপাতায় কেমন যেন তন্দ্রার আমেজ।

গৌরীর মাঠ। গোলাপীর বাড়ি হইতে মাইল খানেক দূর। ভীম মানিককে লইয়া মাঠে আসিয়া দেখিল, এরই মধ্যে কোন কোন জমিতে কাজ শুরু হইয়াছে। কৃষক হালে দাঁড়াইয়া জমিতে লাঙল দেয়, তালুতে জিভ ঠেকাইয়া শব্দ করে। লাঙলের ফলা মাটির বুক চিরিয়া যেন লম্বা লম্বা ফিতা কাটিয়া দেয়।

তারা আল বাহিয়া যাইতেছিল। দু'ধার হইতে প্রশ্ন আসিল, আছ কেমন ভীম ভাই?

এটি কেডা? ওঃ, গোকলার ছাওয়াল।

তার নাকি ফাটক হইছে?

শেষ প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই মানিক বলে, হ। ফাটক স্বদেশীর জন্ত। গান্ধী মহারাজার 'ভারত ছাড়'র জন্ত।

একজন বলিল, ছাওয়ালডি বেশ।

কাজ ফুটু ভুঁইয়ার জমিতে। সেখানে বাবলা গাছের নিচে একটা

শালিক তার ছানাকে উড়িতে শিখায়। ছানাটা এক একবার ডানা মেলিয়া উপরে ওঠে, কয়েক হাত গিয়াই পড়িয়া যায়। থপথপ করিয়া ছ' চার পা হাঁটে আবার ওড়ে। পিছনে থাকিয়া ধাড়ীটা শাবকের প্রতিটি চলন লক্ষ্য করিতেছিল। ভীমের সাদা বলদটা জমিতে নামিয়াই ছানাটাকে তাড়া করিলে তার মা তাকে মুখে করিয়া উড়িয়া গেল।

পাশের জমি হারাণের। পাশাপাশি অনেক জমি। তার মধ্যে ছোট্ট একখানা একচালা ঘর। চাষীরা বলে, বাসা। এই বাসায় তারা বিশ্রাম করে, এখানে বসিয়া খাবার খায়। আকালী সেখানে তামাক টানিতেছিল। ভীমকে দেখিয়া ডাকিল, দুইটা টান দিয়া যাও ভীম ভাই, সুখ-টান।

এই সেদিন নন্দী বাড়িতে তাদের মারামারি হইয়া গেল। আকালী ও ভীম কেহই সেকথা মনে করিয়া রাখে নাই।

ভীম তার কলিকায় তিন চারটা টান দিয়া মাঠে নামে। হাল পায়ে চাপিয়া জমিতে কি করিয়া লাঙল দিতে হয় মানিককে শিখাইয়া দেয়। মানিক বলে, জানি কাকা, কত দেখছি।

সে যাইয়া হাল ধরে। একটু চলার পরেই বলদ দুইটা জোরে টান দেওয়ায় পড়িয়া যায়। খিলখিল করিয়া হাসিয়া আবার আসিয়া হালে দাঁড়ায়। বার কয়েক এইরূপ পড়ে আর ওঠে কিন্তু দমে না। দেখিয়া আকালী চীৎকার করিয়া বলে, এরেই কয় জন্ম-চাষী।

লাঙলের ফলার আঘাতে মাটির ছোট বড় চাঙড় ওঠে। মাটির ভিতর কেঁচো কিলবিল করে।

সূর্য ওঠার খানিকটা পরে স্যাঁতসেঁতে মাটি হইতে ধোঁয়ার ক্ষীণ রেখা উঠিতে লাগিল। মাটির সঙ্গে জড়ান লতাপাতা ধীরে ধীরে শুকাইয়া কোঁকড়াইয়া গেল। মাটির রূপও বদলাইল। ছিল কালো, ধরিল সাদাটে সিমেন্টের রং।

হালের পর মই দেওয়া। গরুর জোয়ালের সঙ্গে বাঁধা বাঁশের মই। চাষী তার উপর দাঁড়ায়। গরু চলে। মইর নিচের ছোট বড় মাটির চাঙড়গুলি ভাঙিয়া গুঁড়াগুঁড়া হইয়া যায়। মই দেওয়ার সময় মানিক আগের চেয়ে বেশী পড়িল, ব্যথাও বেশী পাইল। ছলছল চোখে একবার বলিল, আরেকটু বড় হইলে আর পডব না, ভীমকা।

ঋতুমতী নারীর মতন মাটিও যেন ছিল বীজের প্রতীক্ষায়। বীজ ছড়াইবার পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই মাটি ফুঁড়িয়া কচি কচি ধান গাছ বাহির হয়। চারাগুলি দ্রুত বাড়ে। সবুজে সবুজে মাঠ ছাইয়া যায়। বাতাসে নড়ে। নূতন এই প্রাণের স্পন্দন যে তারই সৃষ্টি। সৃষ্টির আনন্দে মানিকের প্রাণেও স্পন্দন জাগে।

কিছুদিন হইল সে সুকুমারের নৈশ বিদ্যালয়ে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। নতুন স্কুল। চারটি ক্লাসে পঞ্চাশজন ছাত্রছাত্রী। বেশীই ছাত্র। বিভিন্ন বয়সের চাষা মজুর, ধোপা নাপিত, কামার কুমারের দল। পড়ায় সুকুমার আর তার বন্ধু নলিন মৈত্র ও অনিল সেন।

ক্লাশ বসে নলিনের বহির্বাটীর বড় একখানা ঘরে। ছাত্ররা পড়ে মাদুরে বসিয়া। চারধারের বেড়ায় কতকগুলি মানচিত্র ও স্বাস্থ্যবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত প্রাচীরপত্র। বেড়ায় দু'খানা মাত্র ছবি। একখানা মহাত্মাজীর, বিপরীত দিকে লেনিনের।

সুকুমার একদিন মানিককে বলিল, মাঠে কতগুলি কাগজ বিলি করতে পারবি? যারা পড়তে জানে না তাদের পড়ে শোনাবি।

মানিক উত্তর করিল, আপনি যা বল তাই করব সুকুদা।

সুকুমার তার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, বেশ বেশ। তারপর একখানা পুস্তিকা পড়িয়া শুনাইল, 'হাল বলদ যার, জমি তার'। গৌরীগ্রাম অঞ্চলের চাষীমজুরের কথ্য ভাষায় লেখা কয়েক পৃষ্ঠায়

মুদ্রিত এক ইস্তাহার। উপরে চাষীর ছবি, জোংরা মাথায় এক চাষী বৃষ্টির মধ্যে হাল চষিতেছে।

সুকুমার লিখিয়াছে, যে জমি চাষ করে, ধান কাটে, হাল বলদ বীজ যার, জমিতে অধিকার তারই। সেই জমির মালিক, ফসলের মালিক। মহাজন তাকে ঠকায়, ঠকায় জোতদার. তালুকদার, মুদি, দালাল সবাই। পুস্তিকায় চাষীকে মজুরকে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে আহ্বান করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে শিক্ষিত হইতে, নিজের পাওনা গণ্ডা বুঝিয়া লইতে।

ইস্তাহারে আরও ছিল। বসতবাটীতে, বাড়ির ডোবাপুকুরে গাছ-পালায় প্রজার অধিকারের কথা।

মানিক জিজ্ঞাসা করিল, বাড়ির পুষ্করিণীর মাছ তা হইলে আমরা ধরতে পারি, বাড়ির গাছ কাটতে পারি?

সুকুমার বলিল, নিশ্চয়।

ভুঁইয়ারা দেয় না। গেল বছর মা জালিয়া দিয়া মাছ ধরাইছিল। রামু ভুঁইয়া চিলের মতন ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল। এ বছর নিছে নিজেরা ধরাইয়া।

সুকু বলিল, এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।

পারব আমরা? তানারা যে বড়লোক।

একসঙ্গে দাঁড়ালে পারব বৈকি। আমরাই বেশী।

মানিক চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, তুমি! তুমি ত চাষী না। লেখা পড়া জানা মানুষ, দারোগার ভাই।

সুকুমার বলিল, হ্যাঁ, আমি দাঁড়াব। আমিও চাষীর ছেলে। আমি গরিব। আমরা এক জাত।

কথাটা মানিকের কাছে একেবারে নতুন মনে হইল। তার সুকুদা এমনি নতুন নতুন কথাই বলে। মানিক অবাক হইয়া যায়। সে

তার দিকে একটুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আমি আছি তোমার পিছনে সব সময়।

সুকুমার খুশি হইয়া বলিল, হ্যাঁ তুই পারবি।

সুকুদা তাকে বড় কাজের উপযুক্ত মনে করে দেখিয়া মানিকের আত্মপ্রসাদ হইল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই খটকা বাধিল, এই কাজ সে কি পারিবে, তার কি নেওয়া উচিত? সে জিজ্ঞাসা করিল, আমি পারব দাদা?

সুকুমার বলিল, পারবি না কেন?

আমি যে পাপী, পাপ করছি।

কি করেছিস?

চুরি। নন্দী বাড়ির হরি পিসির টাকা ও তামাকের ডিবা চুরি করছি—মানিক এবার হরিমতীর হাতে তার মায়ের লাঞ্ছনা, নিজের প্রতিশোধ নেওয়ার কথা আদ্যোপান্ত সব বর্ণনা করে। তবে মা যে সেই টাকা দিয়া চাল ও কাপড় কিনিয়াছে, সে কথাটা গোপন করিয়া যায়।

তার ভয় হইয়াছিল সুকুদা হয়ত রাগ করিবে কিন্তু তার মুখে অপ্রসন্নতার কোন ভাবই লক্ষ্য করিতে পারিল না। সুকুমার সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠে কহিল, যা হবার হয়ে গেছে। আর কখনও একাজ করিস না। কাল সকাল থেকেই ইস্তাহার বিলি করবি।

মানিক পরের দিন ইস্তাহার বিলি শুরু করে। যারা পড়িতে পারে না তাদের পড়িয়া শুনায়। তরুণরা উৎসাহিত হইয়া ওঠে, বলে, হাচা কথাই লেখছে।

বয়স্করা করে সন্দেহ প্রকাশ, উঁহু, এসবে কোন সুবিধা হবে না। গেল জন্মে ওনারা পুণ্য করছিল, দান খয়রাত করছিল, তাই ভগবান ওনাগো জমিদার আর মহাজন করিয়া পাঠাইছে।

আকালীর মতন আর একদল পাইল ভয়। তারা মন্তব্য করিল,

পুলিস আইন আদালত ওনারা সবই কেনতে পারবে। ঐ সব লুটিশ ইস্তাহারে আমাগো দরকার নাই। যতবার গেছি খালি ঠকতে হইছে।

নরেন বলিল, তার থা আইস ভগমানরে ডাকি, তিনি সময়মত বৃষ্টি রোদ্দুর দিউন। যুদ্ধু আর অজন্মা বন্ধ হউক।

সত্তর বয়স্ক বৃদ্ধ মহেশ জমির আগাছা পরিষ্কার করিতে করিতে বলিলেন, তানারে ডাক। তিনি সবাইরে মানুষ কইরা তুলুন। তা হইলে আর দুঃখু থাকবে না।

কথাটা ধনী ও মহাজনদের কানে ওঠে—সুকুমার চাষী মজুর খেপাইয়া দেশের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছে।

তারা দীন মজুর বর্গাদার ও প্রজাদের বাড়িতে আনিয়া ধমকাইয়া দিল। ভীম রামনাথের জমি খায়। রামনাথ তাকে বলিল, পিঁপড়ার পাখা হয় কেন জানিস ত? তোদের হয়েছে সেই দশা।

ভীম বাহুর গুলি ফুলাইয়া তার উপর একটা ঘুষি বসাইয়া বলিল, এ দেহটা ঠিক পিঁপড়ার শরীর না কত্তা।

হারাণ কিন্তু কোন উচ্চ বাক্য করে না। সে গোনে কালের ঢেউ। লক্ষ্য করে দেশের আবহাওয়া কোন দিকে বহিতেছে।

মাস খানেকের মধ্যেই সে ঘটা করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের অন্নপ্রাশন দেয়। ঐ উপলক্ষ্যে কালী পুজা হয়, পুজা নাকি মানত ছিল। খাওয়া দাওয়া হয় প্রচুর। দু'পালা হয় যাত্রা গান। হারাণ লোক বাছিয়া বাছিয়া কাপড় বিলায়, গরিবরা দশ পনের জোড়া পায় আর হিন্দু মুসলমান মাতব্বর চাষীরা পায় পঞ্চাশ ষাট জোড়া।

যাত্রাগান শুনিতে আশপাশের দশ বিশ গ্রামের লোক ভাঙিয়া পড়িল। মানিক গেল না। সে সুকুমারকে বলিল, যাত্রা শোনতে আমরা, আমি, মা, বুন্নি কেউ যাই নাই। গেছিল খালি উলকি পিসি। পালাটা প্রহ্লাদ কিনা।

সুকুমার বলিল, যাই নি আমিও ভাই। লোকটা মাকড়সার জাল বুনছে। ও ফাঁদে পা দিতে নেই রে।

আঠার

জেল হইতে গোকুলের দ্বিতীয় চিঠি আসিল। সে লিখিয়াছে, আমি আর গোকুল নাই, তেরশ' পঞ্চান্ন হইয়া গেছি। আমার নম্বর তেরশ' পঞ্চান্ন। মেট ওয়ার্ডার সবাই আমারে ডাকে তেরশ' পঞ্চান্ন বলিয়া। তোমরা আছ কেমন? চলে কি করিয়া জানাবা। ছাওয়াল মাইয়ার মুখে দু'মুঠা দিতে পার ত?

স্বামীর স্নেহের এই পরিচয়ে গোলাপী দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া যায়। নিজেদের অভাব অভিযোগের কথা জানাইয়া তাকে বিব্রত করিতে তার মন ওঠে না। সে জবাব দেয়, আমারগো জন্য ভাবনা করিও না। দিন একরূপ কাটতেছে, চালান ভগবান। তুমি কেমন আছ, কয়বার খাও, কি খাও লিখিবা। তোমারে মার-ধর করে নাই ত?

গোকুল লিখিল, দিনে তিনবার খাই। সকালে লাপসি, দুপুরে ভাত, ডাল, ঘ্যাঁট। সন্ধ্যার আগে আবার ভাত, মাছ প্রায়ই থাকে। সাত দিনে এক দিন মাংস্ব।

বহুদিন পরে গোলাপী আজ স্বামীর জন্য নিশ্চিন্ত হয়। কুমি কিন্তু চিঠি শুনিয়া হাসে, বাবা ঘ্যাঁট খায়। ঘ্যাঁট লাপসি।

মানিক ধমক দেয়, খবরদার বাবার খাবার নিয়া হাসবি না।

গোকুলের এক চিঠিতে ছিল, সবই আমার কর্মফল। তোমার মতন মানুষরে আমি কেলেশ দিছি।

মানিক নিজের গান বাঁধা এবং পূজার সময় খেউড় গাহিয়া টাকা এবং নারিকেল পাওয়ার খবরও জানাইয়াছিল। গোকুল খুশি হইল।

ছেলেকে আশীর্বাদ করিয়া পাঠাইল, তুই পারবি ঠাকুরদা নীলধ্বজের নাম রাখতে।

আমিও লেখা পড়া শিখি। পড়ি এক কঙ্গরসী বাবুর কাছে আর সুতা কাটি।

ঘাঘরে গাং পারে বাজেয়াপ্ত সব নৌকা আছে। সেখানে যাইয়া আমাদের নাওখানা দেইখ্যা আসিয়া আমারে সব জানাবি। তোদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে সেই থানার কথাও মনে পড়ে।

নৌকার বাবদ টাকা পাইছ জানলাম, ঐখান তৈয়ার করতে আমার দুইশ টাকার বেশী লাগছিল। আরও নিজের শ্রম। আর তার জন্য পাইলাম কিনা তিরিশ টাকা। যাউক, স্বদেশী রাজ হইলে তানারা গরীবের খেতি পুরণ করবে।

গোলাপী বলিল, আগে কিন্তু গান বাঁধা শোনলেই রাগ করত। ছাওয়ালে গান লেখছে কিনা তাই আর রাগ করে নাই।

পরের দিনই মানিক ঘাঘরে গেল। জায়গাটি মনোরম। মাঝ-খানে জেলা-বোর্ডের সড়ক, দুইপাশে থানা ডাকঘর ডাক্তারখানা সাব রেজিষ্ট্রারের আপিস আর সারি সারি দোকান, একটু দূরে ডাক বাংলো।

রোজ সকালে রাস্তার উপরই বাজার বসে। সোম শুক্রবার বৈকালে বসে হাট। রাস্তাটা পশ্চিম প্রান্তে গাঙের উপর আসিয়া শেষ হইয়াছে। নদীর পাড় দিয়া জল কাদা বালির মধ্যে হাজারো শালের খুঁটি অজগরের মত পড়িয়া আছে। একটু উত্তরে বাহির হইয়াছে আকালের খাল। গাং ও খালের মোহানায় মানুষ প্রমাণ উঁচু ঘাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া পাটকেল রং এর একটা গাই পরম তৃপ্তি সহকারে ঘাস খাইতেছিল।

মানিক শুনিয়াছিল এই খালের উত্তরে নদীর পারে বাজেয়াপ্ত

নৌকাগুলি সব জড় করা আছে। ঠিক যে কোথায় আছে তাহা জানিত না। খাল পার হইয়া নদীর তীর ধরিয়া সে চলিতে লাগিল।

নদী বাহিয়া কত নৌকা যায়, কত ডিঙি। ঘেরাটোপে ঢাকা একখানা ডিঙিতে করিয়া একটি মেয়ে নদীর ঢেউ গুনিতেছিল। বয়সে সে মানিকের চেয়ে বছর দুইর বড় হইবে। বৃষ্টির আগের ভারী মেঘের মতন তার ছলছলে কালো চোখ দেখিয়া মানিকের দুঃখ হয়। আহা, বেচারী হয়ত মায়ের কোল ছাড়িয়া শ্বশুর বাড়ি চলিয়াছে।

কিছুটা যাইয়া ডান দিকে দেখিল তারকাঁটায় ঘেরা একটা জায়গায় কতগুলি নৌকা। দেখিতে উবুড়-করা কাছিমের মতন, দাঁত বাহির করিয়া সেগুলি যেন আকাশকে ভেংচি কাটে। বেড়ার অনেক জায়গায় তার নাই। রৌদ্র বৃষ্টিতে নৌকার কাঠ নষ্ট হইয়াছে, কিছুটা খাইয়াছে উই পোকায়। লোহায় মরিচা ধরিয়াছে—কিন্তু সব চেয়ে ক্ষতি করিয়াছে মানুষ। তারা কাঠ লোহা খুলিয়া নিজেদের ঘর সারাইয়াছে, জ্বালানি করিয়াছে। জ্বালানি করিয়াছে পুলিসরাই বেশী।

মানিক নিজেদের নৌকা খানা খুঁজিতে লাগিল, বাজেয়াপ্ত হওয়ার কিছুদিন আগে বাপের সঙ্গে সে এই খানায় গাব দেয়, ছুরি দিয়া গলুইয়ে নিজের নামের প্রথম অক্ষর খোদাই করে।

নৌকাখানা ছিল তার বড় প্রিয়। কুমির উপর রাগিলেই সে বলিত, তোর লগে আড়ি। আমার ভাব ঐ নাওর লগে।

কুমি কাঁদিয়া ফেলিত।

জীর্ণ মাঠের জঙ্গলে ঢুকিয়া নৌকা খোঁজার সময় তার কাপড়ে পেরেকের খোঁচা লাগে, পায়ে বেঁধে কাঠের কুচি। খুঁজিতে খুঁজিতে ক্লান্তি আসে। কিন্তু তাদের সেই নৌকাখানা আর পায় না।

পরদিনই সে বাপের কাছে লিখিল, আমাগো নাওখানা হারাইয়া গেছে।

গোকুল নৌকার জন্য অনেক দুঃখ করিয়া লিখিল। সেই চিঠিতে ছিল লেখা পড়ার খবর, শিখছি অনেক কিন্তু শেখার আরও অনেক কিছু আছে। আমার জীবনে তা মেটবে না, দেখি যদি তোরে দিয়া মেটে।

মানিক বলিল, দেখলা, বাবা কেমন লেখছে? হাতের লেখা সুন্দর হইছে।

ছয় মাস যাইতে না যাইতেই শুরু হয় মাস গণনা। গোকুল লেখে খালাস হব আর ছ'মাস পরে।

পরের পত্রে—বাকী আর পাঁচমাস।

এক পত্রে লিখিল, খালাস হইতে আর নব্বই দিন বাকী। মানিক মাঠের কাজে নামছে জানিয়া সুখী হইলাম। চাষীর নাতি, চাষীর ছাওয়াল সে। মাঝি গিরি করি আর ঘরামি গিরিই করি আমরা হইলাম জাত চাষী।

এবার গোলাপীও দিন গণিতে আরম্ভ করে, সে বলে, কষ্ট আমাগো ঘোচল বলিয়া। আর দিন আশি বাকী।

মানিক বলিল, তুই বড় ভুল কর মা। বাবা চিঠি লেখেছে পনর ষোল দিন আগে।

গোকুল অল্প বয়সে রোজগার শুরু করে, সেই হইতে অভাব অনটন হয় নাই। দিনের পর দিন উন্নতিই হইতেছিল। লড়াই না বাধিলে এত দিনে টিনের ঘর হইত, মানিক বড় স্কুলে যাইত। তাই স্বামীর উপর, তার উপার্জন ক্ষমতার উপর গোলাপীর আস্থা ছিল খুব। তার বিশ্বাস, সে আসিলে আর কোন কষ্ট থাকিবে না, সংসার ভালভাবে চলিবে।

এই সময় একদিন আসিল এক তীব্র আঘাত—।

দুপুর হেলিয়া যাওয়ার অনেক পরে—গোলাপী সবে ভাত

লইয়া বসিয়াছে, এমন সময় বাহিরে কে যেন বলিল, দুলানী গেল কোথায় ?

মানুষটা যে কে গোলাপী বুঝিতে পারিল না। সে ত্রস্তপদে বাহিরে আসিয়া দেখে উঠানে ভীমের মা নিস্তার দাঁড়াইয়া। তার মুখের শিথিল চামড়া আরও শিথিল হইয়া গিয়াছে। চোখ দুটি নিষ্প্রভ, চিবুকের দু'ধার হইতে দু'গাছা সাদা দাড়ি ঝুলিতেছে।

গোলাপী বলিল, কি খুড়ীমা ?

নিস্তার দন্তহীন মুখ ভেংচাইয়া বলিল, আর সোহাগ করতে হবে না, শয়তানী।

গোলাপী অবাক হইয়া যায়। বলে, এ সব কও কি ? কি করলাম আমি ?

আর করবি কি ? আমার ভীম চন্দররে জাদু করছ। ডাইনী, শাকচুন্নী।

গোলাপী বলিল, বাইর হুইয়া যাও আমার বাড়ীর থা। মিছা মিছা ঝগড়া করতে আইছ।

মিছা! ভীমা বিয়া করতে চায়না কেন ? সপ্পনে কেন তোর নাম করে ? অমন জোয়ান ছাওয়াল আমার, ফলন্ত হইল না তোর জন্য। আমাগো নির্বংশ করলি।

গোলাপীর মুখ সাদা হইয়া যায়। মুখ দিয়া আর কথা বাহির হয় না। বৃদ্ধা বলে, শোন্ হাচা কথা। আমি একটা নাতি চাই। দে' তুই দে, না হইলে ভীমারে বিয়া করতে ক'।

এই সময় নিস্তারের সামনে গোবরের একটা দলা পড়ে। সে আরও খেপিয়া যায়। বলে, গফুর আছে, নতুন ভুঁইয়ারা আছে। তাতেও সাধ মেটে নাই ? বলিতে বলিতে বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলে।

পাগলের মতন মুখভঙ্গী করে। অভিশাপ দেয়, তুই ছাওয়াল মাইয়ার মাথা খা, রাড়ি হ।

অদূরে দাঁড়াইয়া মানিক সবই শুনিতেছিল। মায়ের অনুনয়ে, তার নিজের নিক্ষিপ্ত গোবরে কোন ফল না হওয়ায় সে একমুঠা ধুলা তুলিয়া আনিয়া বলিল, চুপ কর্ বুড়ী, না হইলে তোরে কানা করিয়া দেব।

দে, দে দেখি হারামজাদা।

দেখ্ তা হইলে—বলিয়া মানিক তার চোখে মুখে মুঠার ধুলি ছড়াইয়া দেয়।

নিস্তার আর্তনাদ করিয়া ওঠে—খুন করল রে, খুন করল—

সে চলিয়া গেলে গোলাপী উঠিয়া খাল পারে যাইয়া শিরীষ গাছের তলায় বসিয়া রহিল। তার মন বিরক্তি ও ঘৃণায় ভরিয়া গেল। ঘৃণা নিস্তারের উপর, সারা জগতের উপর। বুড়ী কি না ছেলে মেয়ের সামনে তাকে অসতী বলিয়া গেল! সে ভুঁইয়াদের সঙ্গে খারাপ, খারাপ গফুর চাচার সঙ্গে। ছিঃ ছিঃ।

সময় কাটে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বিরক্তির বদলে আসে অবসাদ। গেল বার অসুখের পর হইতে শরীর আর সারে নাই। না খাইয়া আধপেটা খাইয়া পরিশ্রম করিয়াছে। প্রকৃতি আজ তার প্রতিশোধ তুলিয়া নেয়। শরীর ঝিম ঝিম করে, মাথা ঘোরে, চামড়ার তলায় মনে হয় পিঁপড়া হাঁটিতেছে।

শিরীষের পাতা তাকে অতীত দিনে লইয়া যায়, পাতাগুলি সন্ধ্যার পর জোড় বাঁধে, জোড় থাকে ভোর পর্যন্ত। গোলাপীর মনে পড়ে স্বামীর বক্ষ লগ্ন হইয়া থাকা রাত্রিগুলির কথা।

মানিক বাড়িতে নাই। নিস্তারের চোখে ধুলা ছড়াইয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। কুমি মাকে ডাকিল না। ভাতের থালা পড়িয়া রহিল। চড়ুইয়ে ঘুর ঘুর ভাত ছড়াইল।

কুমি যাইয়া বসিল রাণীকে লইয়া। লাল ছিপছিপে মাটির তৈরি এই পুতুলটি তার বড় আদরের। গেল বছর চড়কের মেলায় মানিক দু'পয়সা দিয়া কিনিয়া আনিয়াছে। কুমি রাণীকে হিজল ফুলে সাজায় আর আপন মনে বক বক করে, আজ বুঝি কাঁদিস, মা রাগ করেছে, আজ কি তুই খাবি? থাক্ খাইয়া কাজ নাই। না খাওয়াই ভাল।

রাণীকে সে দুল পরাইবার চেষ্টা করে। তার হাতে বালা বাঁধিতে চায়। "হিজল ফুল, হিজল ফুল, হাতে বালা কানে দুল" দাদার শিখানো এই ছড়া আওড়ায়। কিন্তু বহু চেষ্টায়ও গহনা পরাইতে পারে না, ধুত্তোর রাণী না পেতনী—বলিয়া পুতুলটাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সেও পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসে।

গোলাপীর পায়ের কাছে খালের জলে আকাশের ছায়া পড়ে। সে উপরের দিকে চাহিয়া দেখে নীল একখানা আয়না। গাঢ় নীল। তার বুকে সাদা সাদা তুলা ভাসিতেছে।

পাশেই একটা পালক পড়িয়াছিল। গোলাপীর মনে হইল ঐ তুলার একটু টুকরা বুঝি ছিটকাইয়া আসিয়া পড়িয়াছে।

* * *

ভীম ঘাড় নিচু করিয়া উঠানে বসিয়া বেড়া বাঁধিতেছিল। নিস্তার বক বক করিতে করিতে উপস্থিত হইল, দিয়া আইলাম হারামজাদীরে শুনাইয়া।

ভীম মুখ না তুলিয়াই প্রশ্ন করিল, শুনাইলা কারে?

ঐ হারামজাদীরে, তোর ভালবাসার গোলাপীরে।

এবার ভীম চোখ তুলিয়া চায়। বলে, এসব কও কি তুমি?

খালি কি আমি? কয় দেশের লোক, গঞ্জের লোক।

কি কয়?

কয় গোকলার বৌ তোরে জাদু করছে।

ভীম গর্জন করিয়া ওঠে, চুপ, চুপ।

নিস্তার বলিল, শাক দিয়া মাছ ঢাকতে পারবি না। আমি মাগীরে কইয়া আইছি যে গফুর মিয়া, রামু ভুঁইয়াতেও সাধ মেটে নাই, এখন পড়ছ ভীমরে লইয়া।

এ্যাঁ! গোলাপ বৌরে অপমানি করছ! কি কইছ তারে?

কইছি, ছাড়্, আমার ছাওয়ালরে ছাড়্, পেশাগরির আর জায়গা পাও নাই।

এই কথা কইছ, বুড়া শয়তান, বলিয়া ভীম মায়ের কাঁধ ধরিয়া ঝাঁকানি দেয়। তার ঝাঁকানিতে বৃদ্ধার সারা শরীর ঠক্ ঠক্ করে। দম যেন বন্ধ হইয়া আসে।

তাকে ছাড়িয়া ভীম এক বস্ত্রেই বাটীর বাহির হইয়া যায়। ঘাঘরের গাং পার হইয়া তারাশীর রাস্তা দিয়া বিল বাদাড় ভাঙিয়া সোজা পশ্চিম মুখো চলে।

* * *

সারা গ্রামে রটিল গোলাপী অসতী, খারাপ ভীমের সঙ্গে। কথাটা পল্লবিত হইয়া ছড়াইয়া পড়িল। লোকে রং চড়াইল, গোলাপীর ছেলে হইবে। তার গর্ভে আসিয়াছে ভীমের সন্তান।

উলকি পিসি শুনিল বাগান উত্তর পাড়ের সেই নায়েব গিন্নীর কাছে। সে বলিল, খুব লোক দিয়েছিলে যা হোক। অসতী, ছুঁলে নাইতে হয়। আমি ত গোবর খেয়েছি।

পিসি তার সঙ্গে তর্ক করিল, ঝগড়া করিল, গালি দিল, ও আমার কেঁচুয়ারে, বিলের পোকা।

রাত্রে শুইতে আসিয়া সে গোলাপীকে জিজ্ঞাসা করিল, ভীমার মা নাকি তোরে একদিন গাল-মন্দ করিয়া গেছে? কস নাই ত কিছু।

গোলাপী কোন উত্তর করে না।

শোনলাম ভীমা যেন কোথায় চলিয়া গেছে।

যাওয়ার সময় আমারে কইয়া গেছে।

এঁ্যা, তোরে কইয়া গেছে। তোরে কয় কেন, এ ত ভাল না, বলিয়া পিসি গোলাপীর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকায়।

গোলাপী তার মুখের উপর ডাগর চোখ তুলিয়া বলে, তুমি আমারে বিশ্বাস কর না পিসি? তোমার কি মনে হয় আমি খারাপ?

না, না। তবে ভীমা—

সে আমারে ভালবাসে, তার আমি করব কি কও দেখি?

তাও ত ঠিক। ভালবাসা এমন দোষেরও না, যদি—

বৃদ্ধা সব কথা গুছাইয়া বলিতে পারে না। তার মুখে নূতন কথা শুনিয়া গোলাপী অবাক হইয়া যায়।

উনিশ

শ্রাবণে শুরু হয় ধান কাটা। কেহ জলে দাঁড়াইয়া ধান কাটে। যেখানে জল বেশী সেখানে কাটে ডিঙি বা উবুড় করা মাটির জালায় বসিয়া।

ভীম দেশে নাই, মানিক আসিয়াছে আকালীর সঙ্গে। সে জালায় বসিয়া ধান কাটে আর হাত দিয়া জল ঠেলিয়া আগাইয়া যায়। গাছ-গুলি জলের উপর পড়িয়া থাকে।

গৌরীর মাঠে জড় হইয়াছে বহু চাষী, বহু জাতির, নানা বয়সের। পঁচাত্তর বছর বয়সের মহেশ হইতে আরম্ভ করিয়া মানিকের মতন কচি কিশোরও আছে।

চালের মণ পঞ্চাশ ষাট টাকা, অনেকেরই দিনান্তে একবার ভাত জোটে না। অথচ তিন চার বার খাওয়ার অভ্যাস। মাঠের এই

আউশ কাটিলে ঘরে কিছু খাবার আসিবে তাই তারা জোরে কাস্তে চালায়। তাদের ক্ষুধার তালে তালে কাস্তে নাচে, নাচে না যেন সূর্যকিরণে হাজারো বিজলী চমকায়।

চাষীরা চেঁচামেচি করে, গল্প করে। করে হৈ হুল্লোড়। কেহ কেহ এরই মধ্যে তামাক টানে। দু একজন টানে গাঁজা। একজন গান ধরিল—

ভোর না হইতে শয্যা ছাড়লাম
ফেলিয়া চক্ষের পানি,
ফেলিয়া আইলাম শয্যার উপর
আমার বক্ষের রাণী।
পেটের জ্বালায় ভালবাসায়
করল রাহাজানি রে ভাই,
করল রাহাজানি।

যুবক চাষী ভোর হইতে না হইতেই প্রিয়ার বাহুডোর ছিঁড়িয়া আসিয়াছে। আক্ষেপ সেই জন্য।

আকালী ধমক দেয়, রাখ্ ছেমরা, বৈরহ কি তোর একলার?

গায়ক বলিল, তুমি বুড়া মানুষ, এর রস কি বোঝবা?

আর একজন টিপ্পনী করিল, রস বুড়াগোই বেশী।

আজকাল গৌরীর মাঠের উপর দিয়া আগের চেয়েও অনেক বেশী এরোপ্লেন যায়—ঝাঁকে ঝাঁকে। মনে হয় রাজহাঁসের দল উড়িয়া যাইতেছে। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে তার শোভা হয় চমৎকার।

চাষীদের মনে বিস্ময় জাগে। কারও কারও ভয় হয়, চাঁটগাঁ কলিকাতার মতন এখানেও বোমা পড়িবে নাকি?

একদিন আকালীর প্রশ্নের উত্তরে মানিক বলিল, এটাই কলকাতার থা আসাম যাওয়ার সোজা পথ কিনা তাই এত উড়োজাহাজ যায়।

তুই জানলি কি করিয়া?

সুকুদা কইছে। কাগজেও পড়ছি।

আকালী বলিল, কাগজে এত জিনিসও থাকে। চোখ থাকতেও আমরা দেখতে পাইলাম না।

তার পরই মহেশের দিকে চাহিয়া বলিল, মহেশ খুড়া, গোকলার ছাওয়ালটা হইছে ভারী বোঝদার। কত গভীর বাক্যিই না কয়।

মহেশ বলিল, বোঝদার গোকুলও ছিল। অরগো বংশটাই।

মানিক আকালীকে বলিল, তুমিও সুকুদার ইস্কুলে গেলেই পার। সেখানে শিখায় মেলা জিনিস, নতুন চোখ ফুটাইয়া দেয়। মাইনাও লাগে না।

আকালী বলিল, বয়স হইল দু'কুড়ি, আড়াই কুড়ি। এ বয়সে আর নয়া চক্ষে দরকার নাই। চশমা নিতে হইলে তোর আকালী জেঠা আর বাঁচবে না। আচ্ছা, জাপ্পুরাও কি আমাগো আকাশ দিয়া যায়?

তা ত যায়ই।

তারা যদি গোল্লা ফেলে? বড় বড় গোল্লা, যারে কয় বোম।

তা ফেলবে না, সুকুদা কইছে।

আকালী বলিল, ফেলবে না আমিও শুনছি। তারাও এক রকম হিন্দুই।

ইদ্রিস হাসিয়া বলিল, তখন কিন্তু আমাগো পর করিয়া দিও না, আকালী ভাই।

আকালী বলিল, সে কথা আর কইতে? আমরা একস্তর চাষ বাস করি, কিষাণ মজুর খাটি, মাছ ধরি। আমরা ছাড়ব একজন আর একজনরে!

এক এক দিন আকাশে মেঘ হয়। জমিতে মেঘের ছায়া পড়ে; মেঘ ছোটে, ছায়াও ছোটে। সবুজের উপরে এক ধারে পড়ে ছায়

আস্তরণ, আর একদিকে খেলে রোদের ঝিলিমিলি। মানিকের মন মেঘ ও রৌদ্রের সঙ্গে ছুটাছুটি করে। তার আনন্দ সুরের মধ্যে মুক্তি পায়।

ও মোর আইলোকেশী
তুমি এ কোন্ বেশে আইলা?
ছাই বরণের ওড়না দিয়া
সবুজ এ মাঠ ছাইলা।
তোমার সিঁথার পাশে
আলো হাসে
জ্বলে রবির আগুন,
ও মোর আইলোকেশী।

বৃষ্টি নামে, ধানের শিসে শিসে, ঘাসের ডগায় ডগায় মুক্তার দানা ছড়াইয়া পড়ে। ব্যাঙ ডাকে। পাখীরা ধরে নব নব সুর। মানিকের মনে জাগে নূতন এক অনুভূতি। যারা ধান কাটে তারাই ত দেশকে খাওয়াইয়া রাখে, তারা দেশের মূল। এ সব শেখা তার সুকুদার কাছে। তিনি নূতন নূতন কথা শেখান, কত দেশ বিদেশের গল্প করেন।

আজ সেও একজন চাষী। তার বাবা চাষ করিত, ঠাকুরদা চাষী ছিল। তারা ত ছোট নয়। সে নূতন গান বাঁধিল—

চাষী মজুর আমরা কিসে কম?
ভাত রুটিতে তোমরা বাঁচো,
(আমরা) যোগাই ধান আর গম।
তোমরা থাকো দালান কোঠায়
আমরা খড়ের চালায়,
তোমরা পর শান্তিপুরি
(মোরগো) কাপড় যোগায় জোলায়

আমি ছোট, তুমি বড
কিন্তু দুটি ভাই,
রাখবা মনে গোকুল দাসের
ছাওয়াল এ গান গাই।

এক এক বার নিজে নিজে গায়—

গোলাপ রাণীর ছাওয়াল এ গান গাই।

কিন্তু প্রকাশ্যে গানের মধ্যে মায়ের নাম যোগ করে না।

ছত্র কয়টি চাষীদের মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়িল। মাঠে মাঠে পথে ঘাটে, নৌকার মাঝির কণ্ঠে। চাষীরা গাহিল, আমরা কিসে কম?

... ...

শেষ হইল আউশ ধান কাটা। চাষীদের মধ্যে যারা জমির মালিক তারা ধান কাটিয়া নিজ নিজ বাড়িতে লইয়া গেল। তবে তাদের সংখ্যা কম। বেশীর ভাগই জমিহীন কৃষাণ, তারা জমিদার জোতদারের জমি চষে। ধানের ভাগ পায়।

বীজধান চাষীর, হাল বলদ পরিশ্রম সবই তার। মাঠ হইতে ধান কাটিয়া সে মালিকের বাড়ি পৌঁছাইয়া দেয়, ধান ঝাড়িয়া মালিকের অংশ তার গোলায় তুলিয়া দিয়া নিজের ভাগ লইয়া আসে। সামান্য অংশ, কোথায়ও ছয় আনা, কোথায়ও বা অর্ধেক।

এই সময় জমিদার মহাজন জোতদার নিজ নিজ পাওনা কাটিয়া রাখে। এই পাওনা নানা রকম। কারও কাছে ভিটা বাড়ির খাজনা। কেহ থালা ঘটি বাটি বন্ধক দিয়া ধার নিয়াছে, তার সুদ।

চাষীদের কাছে হারাণের পাওনার ফর্দই সব চেয়ে দীর্ঘ। অন্য পাওনা ত আছেই তার উপর তার দোকান বাকীর হিসাব। বাড়িতে ও ঘাঘরের হাটে তার দোকান। একটা দোকান সিকির বাজারে। লোক ধারে মাল নেয়। আউশ ও আমন ধান কাটার সময় সে চাষীদের

নিকট সুদ সমেত সমস্ত পাওনা কাটিয়া রাখে। চাষী ঘরে শস্তের সামান্ত অংশই লইয়া যাইতে পারে। কেহ কেহ একেবারেই পারে না।

তবে পাওনা কাটার সঙ্গে সঙ্গে সে আবার নূতন দেনা দেয়। ধান চাল কাপড় গামছা লঙ্কা নুন—গরিব গৃহস্থের প্রয়োজনীয় সব কিছুই। হারাণ গম্ভীর ভাবে বলে, এই করেই ত দেশকে বাঁচিয়ে রেখেছি।

আর গরিবরা বলে, নন্দীরা মাকড়সার জাল বোনছে। আমাগো বাইর হওয়ার আর উপায় নাই।

এবার চাষীরা এক জোট হইয়া হারাণের কাছে দাবি পেশ করিল। আমরা চাই ফসলের অর্ধেক ; বীজ ধান সুদ সমেত ফেরত চাই।

হারাণ বলিল, আশমানের চাঁদ চাই না?

পোতো বলিল, চায়না আর কেডা? কিন্তু চাঁদ আর চাঁদি দুইই যে আপনারা সিন্দুকে তোলছ।

কথা কাটাকাটি হয়। হারাণ কখনও কড়া হয়, আবার নরম। কিন্তু রাগে না। চাষীরা রাগ করে, কটু কথা বলে।

উত্তরে হারাণ মাঝে মাঝে শুধু বলে, শ্রীহরি, শ্রীহরি।

শেষ পর্যন্ত তারই জয় হইল।

মাতব্বররা তার পক্ষ লইল। চাষীদের সঙ্ঘ শক্তিকে তারা ভাঙিয়া দিল। যারা বর্গাদারদের মুখপাত্র ছিল ঠকিল তারাই বেশী। হিসাবের সময় দেখা গেল অমর নরেন ও পোতোর কিছুই পাওনা হয় নাই। পোতো দাড়ি মোচড়াইয়া বলিল, তোমার জমি চষছি বলিয়া কিছু দিয়া যাইতে হবে না?

হারাণ বলিল, আগে যে ধার খেয়েছিলে বাপু। এ যে হিসেবের কড়ি, তবে দরকার হলে মালপত্তর ধান চাল আবার নিয়ে যেতে পার।

পোতো বলিল, কোন্ শালা আর এ মুখো হয়? কালী পুজা দিয়া

কাপড় বিলাইয়া ঘুষের জোরে মাতব্বরগো কেনছ কিন্তু এ জারি জুরি আর বেশী দিন না।

মানিক ভীমের সঙ্গে ফুটু ভুঁইয়াদের জমি চষিয়াছিল। সে দেশে না থাকায় ধান কাটিল আকালীর সঙ্গে, আকালী তার ধানের ভাগ লইয়া গেল। নিস্তার মানিককে বলিল, ভীমার ধান আনতে আমার লগে যাবি ?

মানিক বলিল, তা যাব ঠানদি।

... ...

ছেলে দেশ ছাড়ার পর নিস্তার প্রথম কয়েক দিন খুব কাঁদিল, গোলাপীর উপর আরও রাগ করিল। কিন্তু পুত্রের অভাবজনিত বেদনায় মন ধীরে ধীরে নরম হইয়া আসিল।

ছেলের কথা ভাবিতে ভাবিতে তার ভালবাসার পাত্র গোলাপীকেও ভাল লাগে। তার উপরও মন নরম হয়। ছেলে নিরুদ্দেশ হওয়ার মাস খানেক পরে নিস্তার একদিন গোলাপীর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। পাওনাদার দেখিয়া মানুষের যেরূপ হয় তাকে দেখিয়া গোলাপীর মুখ তেমনি বিবর্ণ হইয়া গেল।

নিস্তারের চোখ আগে হইতেই খারাপ ছিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া আরও খারাপ হইয়াছে। ঝাপসা দেখে। গোলাপী তার সামনে দাঁড়াইয়া, তবু সে প্রশ্ন করে, তুই কি গোলাপ ?

তার প্রশ্নের ভঙ্গীতে গোলাপী আশ্বস্ত হয়। বলে, আইস খুড়ীমা, তুমি কি মনে করিয়া ?

তোরে সেদিন বড় কটু কইছি, মন সেই হইতে খারাপ হইয়া আছে, তাই আইলাম এট্টু দেখতে।

তোমার শরীর কেমন?

আর শরীর! ভীমা কি আর সুস্থ থাকতে দেবে? পেটের

ছাওয়াল না শত্তুর। এইত ঘরে চাউল নাই, হাতে একটা কানাকড়ি নাই। সে থাকলে কি এমন হয়? আউশ চারডি পাব, তাও শ্রাবণ মাসে।

তোমারে চারডি মুড়ি দেব?

দে, তা দে। তবে দাঁত নাই, খাব কি করিয়া? ভিজাইয়া দে।

গোলাপী মুড়ি আনিয়া দিলে উহা মুখের মধ্যে নাড়িতে নাড়িতে নিস্তার জিজ্ঞাসা করিল, ভীমার ঠিকানা কইতে পার, সে আছে কোথায়?

গোলাপী একটু রুক্ষ কণ্ঠেই কহিল, তা হইলে তুমি আইছ ছাওয়ালের ঠিকানা জানতে?

নিস্তার বলে, না না। আইছি এমনে। মনে হইল পুরুষের কাণ্ড ত। হারামজাদা তোরে হয়ত চিঠি দিছে। তাই ভাবলাম, আইছি যখন একবার শুধাইয়া যাই।

বিশ্বাস কর খুড়ীমা। আমি কিছু জানিনা। সে আমারে কিছু লেখে নাই।

বিশ্বাস করিইত। পিসি তোর কত সুখ্যাত করে, কয় এমন সতী সারা কোটালীতে নাই।

একটু থামিয়া নিস্তার আবার বলিল, পুরুষ জাতটাই বেইমান। আগে জ্বালাইত বাপ, এখন জ্বালায় পেটের শত্তুর। তাও যদি সব কয়ডা থাকত।

এর পর হইতে সে প্রায়ই আসে। নিজের দিন চলে না তবুও গোলাপী বৃদ্ধাকে মাঝে মাঝে গাছের লাউ লঙ্কা বেগুন দেয়। দুইচার দিন চাল এবং চালের খুদও দিয়াছে।

আজ কাল নিস্তারের মুখে তার প্রশংসা আর ধরে না। সে বলে, মাইয়া বটে গোলাপী।

আউশ ধান কাটা হইলে মানিকের সজে বৃদ্ধা একদিন হুটু ভুঁইয়ার

বাড়িতে ধান আনিতে গেল। রামনাথকে বলিল, ও একরত্তি ছাওয়াল, আমি বুড়া মানুষ, অন্ধ। দেইখ্যো ঠকাইয়ো না যেন, বাপ মায়ের কিরা।

মানিক বৃদ্ধার ধান তার বাড়িতে পৌছাইয়া দিলে সে আশীর্বাদ করিল, তুই গ্রামের মোড়ল হইস্, যেমন ছিল হারাণের ঠাকুরদা, তার আগে ছিল তোর বাপের ঠাকুরদা।

একটু থামিয়া বৃদ্ধা আবার বলিল, ভীমার বাপরেও সগলডি মোড়লই কইত। তুই তারগো মতন হইস।

মানিকের নিজের ধানের বেলায় রামনাথ বলিল, তুই মজুরি পাবি অর্ধেক।

মানিক বলিল, আধা কেন? আমি জোয়ানগো প্রায় সমানই কাজ করছি। ইচ্ছা হইলে কিছু কম দাও। ষোল আনায় দুআনা কম।

আচ্ছা, নে চার ভাগের তিন ভাগ। কিন্তু বেগার ও ত ছিল, বছরে দু'দিন। এই ক বছর বেগার পাই না। তার বদল—

মানিক বাধা দিয়া বলিল, বেগার আর পাবাই না।

রামনাথ মনে মনে রাগিয়া যায়, কিন্তু নন্দী বাড়ির সেদিনকার ঝামেলার কথা মনে করিয়া বেগারের ধানের জন্য আর পীড়াপীড়ি করে না।

মানিক মাথায় করিয়া একধামা ধান আনিয়া মায়ের পায়ের কাছে ঢালিয়া দেয়। সোনালী ধান, গোলাপীর মনে হয় যেন এক একটা মোহর। পুত্রের চাষী জীবনের রোজগারের দিকে সে অপলক নয়নে চাহিয়া থাকে।

মানিক বলে, শুধু কি এই? আরও আছে, মা। তার পর সুর করিয়া গায়—

চাষী মজুর আমরা কিসে কম?

গায় আর পা ঠুকিয়া ঠুকিয়া তাল দেয়।

... ...

কয়েক দিন পরে আসিল মণিরামের মৃত্যু সংবাদ। খবর শুনিয়া মানিক কাঁদিল, তার দেখাদেখি কাঁদিল কুমি।

বাউতিরা জলাচরণীয় নয় কিন্তু কিছু দিন যাবত বাউতি সমাজে আন্দোলন চলিতেছে তারা বৈশ্য। শামুক পোড়াইয়া চুন করে তাই ব্রাহ্মণরা তাদের শম্বুক বৈশ্য বলিয়া পাতি দিয়াছেন।

গোকুল এ দলের নয় কিন্তু মণিরাম নিজেকে শম্বুক বৈশ্য বলিত। সামাজিক ক্রিয়া কর্মে গলায় পৈতা ঝুলাইত।

মানিক বৈশ্যাচারে পনর দিন মৃতাশৌচ পালন করিয়া জেঠার শ্রাদ্ধ করে। শ্রাদ্ধের আসনে বসে গলায় পৈতা ঝুলাইয়া। আসনের একধারে রাখে মণিরামের গানের খাতা।

পুরোহিত জিজ্ঞাসা করেন, ও খাতা কিসের?

জেঠার গানের খাতা।

এখানে কেন?

জেঠা খুশি হবে, তাই রাখছি।

শ্রাদ্ধের সংবাদ পাইয়া মানিকের বড় মা লিখিল, তুই জেঠার শ্রাদ্ধ করছ জানিয়া আমি আর তোর ছোট মা খুশি হইলাম। আমরা তোরে আশীর্বাদ করি, তুই একদিন জেঠার মত কবিদার হবি।

মানিক মাকে খবরটা বলিল, জান ছোট মাও আমারে আশীর্বাদ করিয়া পাঠাইছে?

গোলাপীর চোখ দু'টা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, ছোট মা আবার আইল কোথায় থা? কি যে কও।

মানিক চিঠি খানা আগাইয়া ধরিয়া বলিল, পড়তে ত জান। এই দেখ পড়িয়া।

কুড়ি

গোকুলকে পুরা এক বৎসর জেল খাটিতে হইল না। মুক্তি মিলিল প্রায় দেড় মাস আগে। একদিন সন্ধ্যায় জেলের এক বাবু বলিলেন, উপর থেকে হুকুম এসেছে আপনি কাল খালাস পাবেন, গোকুল বাবু।

গোকুল 'বাবু' হইয়াছে জেলে আসিয়া। সবাই তাকে আপনি বলিয়া সম্বোধন করে, মানুষ বলিয়া মনে করে। সে বোঝে, ইহা স্বদেশের মুক্তি আন্দোলনে যোগদানের পুরস্কার। পুরস্কার আরও মিলিয়াছে, সে লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে, জানিয়াছে অনেক কিছু।

পরদিন সকালে তার সঙ্গে খালাস পাইল আরও কয়েক জন। সকলেই তারা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের আসামী নয়।

প্রায় একটা বছর যাদের সঙ্গে কাটিল, পুলিসের নির্যাতন ও কারা-ক্লেশ যাদের সহিত সমানে ভাগ করিয়া লইয়াছিল তাদের অনেকের কাছেই বিদায় লইয়া আসিতে পারিল না বলিয়া গোকুলের মন খারাপ হইয়া গেল। বেশী খারাপ হইল সুধীর দাসের জন্য।

জেলের রুগ্ন, শীর্ণ এই তরুণটি ছিল তার শ্রেষ্ঠ বান্ধব। তার কাছে সে পড়িত। সব চেয়ে বেশী শিক্ষা লাভ করিয়াছিল তার নিকট। তাকে দেখিয়া গোকুলের প্রায়ই মনে পড়িত নিজেদের গ্রামের সুকুমারের কথা।

গোকুল এবার দেখিল কলিকাতার আর এক রূপ। উলঙ্গ অর্দ্ধ নগ্ন নারী পুরুষে রাজপথ ছাইয়া গিয়াছে। মানুষ না যেন কতগুলি নর কঙ্কাল। শিশু, বৃদ্ধ, যুবা আছে সবই, তারা গৃহস্থের দরজায় দরজায় করুণ কণ্ঠে ভিক্ষা চায়, ফেন দেও মা, একটু ফেন।

অনেকের সে শক্তিও নাই। তারা পথের উপর পড়িয়া থাকে, কুকুর বিড়ালের সঙ্গে ভাগা ভাগি করিয়া ডাষ্টবিনের উচ্ছিষ্ট খায়।

দু' ঘণ্টার মধ্যে সে মৃতদেহ দেখিল চার পাঁচটা। দুইটা শব হইতে উৎকট গন্ধ আসিতেছিল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, পাশের জীবিত মানুষগুলির সেই ঘ্রাণ সম্বন্ধেও যেন কোন চেতনা নাই।

শুধু সর্বহারাদের নয়, কলিকাতার মানুষ মাত্রেরই বুঝি চেতনা লোপ পাইয়াছে। নতুবা ইহা সম্ভব হয় কেমন করিয়া?

বিশাল প্রাসাদের পাশেই এক বৃদ্ধ হাঁ করিয়া মরিয়া আছে। জীবনের শেষ মুহূর্তেও বিধাতার কাছে সে হয়ত খাবার চাহিয়াছিল।

কমণ্ডলু হাতে দুইটি প্রৌঢ়া ঐ পথ দিয়া গঙ্গা স্নান করিয়া ফিরিতেছিলেন। তাঁদের এক জনের পরনে গরদের কাপড় আর একজনের নাকে চন্দনের ফোঁটা। শেষোক্ত মহিলাটি কমণ্ডলু হইতে শবের উপর গঙ্গাজল ছিটাইয়া বলিলেন, শিব শিব।

তাঁর সঙ্গিনী বলিলেন, যাক্, বেচারার কৈলেসে যাওয়ার ব্যবস্থা তুমি করে দিলে।

কথাটা গোকুলের কানে গেল। সে একটুক্ষণ দাঁড়াইয়া ভাবিল, এই কৈলাস কোথায়?

জেলে বসিয়াই সে এই দুর্ভিক্ষের খবর শোনে। কাগজেও পড়ে। কংগ্রেসী বাবুরা বলাবলি করিতেন, এই দুর্ভিক্ষ মানুষের সৃষ্টি। এর জন্য দায়ী তার লোভ। সুধীর বাবু জিনিসটা বুঝাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু তখন গোকুল এর বিশালতা কল্পনা করিতে পারে নাই। আজ প্রত্যক্ষ করিয়া মন ঘৃণায় ভরিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গেই আসে ভীতি। ভয় গোলাপীর জন্য, কুমি মানিকের জন্য। নিজের বিপদের কল্পনা পাশের জলন্ত দৃশ্যগুলিকেও যেন নিষ্প্রভ করিয়া দেয়।

বেলা এগারটা আন্দাজ একটা সেলুনে ঢুকিয়া সে চুল ছাটিল, দাড়ি কামাইল। আয়নার সামনে বসিয়া মনে পড়িল টাইল-ভি-সেলুনের

কথা, নিজের গোঁফ রাখার কাহিনী। নন্দ চাকী, জুঁইফুল, চ্যাং আর দে সাহেব।

সেলুন হইতে সরাসরি গেল আদি গঙ্গায়। বহুদিন পরে নদীতে অবগাহন করিয়া শরীরটা যেন জুড়াইল। খাইল এক পাইস হোটেলে।

গোকুল 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের জন্য জেল খাটিয়াছে। তার থাকার আর কোন জায়গা নাই শুনিয়া হোটেলের মালিক বলিলেন, আপনি ক'দিন আমার এখানেই থাকুন। ভিতরের এই রোয়াকে।

পরদিন গোকুল দেশে চিঠি দিল।

আমি কাল হঠাৎ খালাস পাইয়াছি। কথা ছিল পরে পাওয়ার। কিন্তু আমার শাস্তি কিছুদিন মকুব হইল। ভাল ভাবে থাকিলে সবারই হয়।

হাতে টাকা নাই। থাকিলে দেশে যাইতাম। শুধু হাতে যাইয়া তোমাদের কষ্ট আর বাড়াইতে চাই না।

জেলেই দুর্ভিক্ষের কথা শুনিয়াছিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি ছেলে বুড়ার দল দরজায় দরজায় ভিক্ষা চায়; ফেন দাও মা এট্টু ফেন। মানুষ না যেন কতগুলি কাঁকলাস।

পথের উপর অগুন্তি মড়া পড়িয়া আছে। শেষরাত্রি হইতে আমাদের হোটেলের দরজায় একটি মেয়ে লোক বসিয়া আছে। তার কোলে বছর দেড়েক বয়সের মরা ছেলে। তার মুখে শুকনা কুলের বীচির মতন মায়ের দুধের বোঁটা। মরার সময় ছেলেটি কামড়াইয়া ধরিয়াছিল, এখন টানাটানি করিয়াও লোকে ছাড়াইতে পারিতেছে না।

এই পর্যন্ত লিখিয়া গোকুলের চোখের পাতা ভিজিয়া যায়, কলম আর চলে না। খানিকটা পরে আবার লেখে,—

সব দেখিয়া শুনিয়া আমার ভয় ভাবনা আরও বাড়িয়াছে। কি

ভাবে তোমরা আছ, ছেলে মেয়েদের কি খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছ বুঝিতে পারিতেছি না।

সত্বর উত্তর দিবে, হাতে আমার কিছুই নাই। কয়েক মাস চাকরি করিয়া টাকা লইয়া আমি তোমাদের কাছে যাইব। তুমি মানিককে ভালবাসা দিবে, তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

আং

গোকুল।

গোকুল সারাটা দিন কাজের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ায়। বড়লোকের বাড়ির ফটকে, আপিসের দরজায় দরজায় যাইয়া দারোয়ানদের জিজ্ঞাসা করে, চাকুরি খালি আছে?

দারোয়ানরা কেহ জবাব দেয়, কেহ বা দেয় না। দু'চার জন দেয় ধমক—ভাগো হিঁয়াসে।

একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে সে একটা রাস্তায় আসিয়া পড়িল। রাস্তাটা চওড়া নয় কিন্তু ট্রাম বাস গাড়ী মোটরের ভীড় লাগিয়াই আছে। সে আগেও দেখিয়াছে, এখানে সকাল বিকাল যেন মানুষের জোয়ার ভাঁটা লাগে। রাস্তার বাঁয়ে একটা গির্জার রেলিংয়ে কয়খানি বিজ্ঞাপন ঝুলিতেছিল। মোটা মোটা অক্ষরে লেখা বড় একখানা কাগজ তাকে আকৃষ্ট করিল।

চার আনায় চৌদ্দ হাজার টাকা। প্রথম পুরস্কার পাইয়াছেন মন্নুসেন, মুকুল রেডিও, চাটগাঁ।

লটারির পুরস্কারপ্রাপ্তদের সম্পর্কে মানুষের মনে স্বতঃই কৌতূহল হয়। তাদের সৌভাগ্যের জন্য হয়ত একটু ঈর্ষাও করে। অপরিচিত এই ভাগ্যধরের প্রতি গোকুলের মনের ভাব হইল সেই রকম। সে ভাবিল, কে এই মন্নুসেন? খাসা বরাত ত লোকটার।

রেলিংয়ের পিছনে একটা টেবিল, তার উপর অনেকগুলি রসিদ বই ও খাতা। পাশেই একটি প্রৌঢ় বসিয়া।

গোকুল রেলিংয়ের সামনে যাইয়া চার আনার একখানা টিকিট চাহিল।

মোটে একখানা? বেশী নিন না, তাহলে চান্সও বেশী, বলিতে বলিতে প্রৌঢ় একখানা টিকিট বই বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নাম?

শ্রীগোকুল চন্দ্র দাস।

নম্-ডি-প্লুম?

সে কি?

নম্-ডি-প্লুম কি তাহা বুঝাইয়া দিয়া টিকিট বিক্রেতা কহিলেন, ফল ফুল ঠাকুর দেবতা যে কোন একটা নাম দিতে পারেন।

গোকুল মনে মনে আওড়ায়, গাঁদা জবা মালতী গোলাপ জুঁই। শেষটায় বলে, নানা গোলাপই লেখেন। ফুলের সেরা।

টিকিট হাতে পাইয়া তার মন বেশ প্রফুল্ল হয়। ভাবে, দাঁড়াইবার মতন একটা অবলম্বন হয়ত এবার জুটিবে। টাকা পাইলে কি করিবে, পথ চলিতে চলিতে মনে মনে তারও ফিরিস্তি করিল। মানিককে ভাল জুতা জামা দিবে, কুমিকে রঙিন ফ্রক্। ব্যাগ হাতে সুন্দরী এক তরুণীর পরনে আজ সকালে যেরূপ শাড়ী দেখিয়াছে গোলাপীকে সেই রকম বাহারি শাড়ী দিবে। তারাইলের জমি কিনিবে, ঘাঘরের পাং পারের এই জমি—মাটি না যেন সোনা, মা ভগবতী।

আর, আর একদিন বরিশালে ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া জুঁই ফুলের বাড়ির সামনে দিয়া যাইবে। বাড়ির সামনে ঘন ঘন হর্ণ বাজাইবে।

পর মুহূর্তেই 'আরে ছিঃ' বলিয়া ভাবনাটা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেয়।

কয়েক দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটা চাকরি প্রায় জোগাড় হইয়াছিল—কোন ব্যাঙ্কের বরাহনগর শাখায় পাহারাগিরি। ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সঙ্গে কথাবার্তা সব ঠিক, এমন সময় ম্যানেজিং ডিরেক্টর আসিয়া বলিলেন, নগদ জামিন চাই পাঁচশ টাকা।

গোকুল বলিল, পাঁচশ টাকা দিতে পারলে ত আমি কারবারই খোলতাম, একটা পানের দোকান।

আর একদিন এক বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কাজ জান ছোকরা ?

আমি নৌকা বাইতে জানি, কত ঝড় তুফানে নৌকা চালাইছি।

আমারও একজন ভাল বাইচাই চাই তবে নৌকার নয় মোটর গাড়ীর। পারবে ? বলিয়া ভদ্রলোক নিজের রসিকতায় হাসিতে লাগিলেন।

গোকুল মাঝে মাঝে গঙ্গাস্নান করে। সেদিন দুপুরে স্নান সারিয়া সবে জলের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পাশেই হাওড়ার নূতন পুল, যেন সাদা ইস্পাতের এক বিশাল জঙ্গল। ঐ দিকে চাহিলে চোখ ঝলসিয়া যায়। গোকুল ভাবে, মানুষ ইহা গড়িল কেমন করিয়া।

এই সময় পিছন হইতে কে যেন ডাকিল, গোকুল মামা।

গোকুল মুখ ফিরাইয়া দেখে ভিজা কাপড়ে বারিবালা দাঁড়াইয়া।

এই মেয়েটি তার প্রতিবেশী সিধুর বোন, দূর সম্পর্কে গোকুলের ভাগনি। এদের বাড়ির বাবুইর বাসা দেখিয়াই সে নিজের নীড় বাঁধিয়াছিল।

গোকুল অনেকদিন পরে তাকে দেখিল। এই কয় বছরে বারিবালা বেশ মোটা হইয়াছে, তবে চেহারা এখনও বেমানান হয় নাই। গায়ের রং আগের চেয়েও উজ্জল, তার শরীর হইতে

দামী সাবানের সুগন্ধ আসিতেছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি জেল থেকে বেরুলে কবে ?

গোকুল বলিল এই ক'দিন। আমার জেলের খবরও তুমি জান দেখতেছি।

শুনেছি মানিকের কাছে। বাড়ি গিছলুম ত।

গোকুল বলিল, ওঃ, মাইনকার কাছে শোনছ। দু'বছর তাদের দেখি নাই। তারা আছে কেমন ?

আছে ভাল, খাসা ছেলে হয়েছে তোমার মানিক।

মাথায় কতখানি হইছে ?

বেশ ঢেঙা, টপ করে বেড়ে উঠেছে বলে একটু রোগা দেখায়।

অসুখ টসুখ নাইত কিছু ?

না।

কুমি ? সেও বেশ বাড়ছে ?

বারি বলিল, তুমি গোলাপ মামীর কথা জিজ্ঞাসা করলে না ত। লজ্জা করছে বুঝি ?

বুড়া হইতে চললাম। এখন আর লজ্জা কি ?

বাড়ি যাওনি কেন ?

যাই নাই টাকার জন্য, গোকুল মুখে এই কথা বলিল বটে কিন্তু টাকার অভাবটাই সব নয়। কারণ আরও ছিল। তার ধারণা তার বরিশাল জীবনের কাহিনী, জুঁই ফুলের কথা গোলাপী সবই শুনিয়াছে। তার সামনে যাইয়া দাঁড়াইতে কেমন যেন লজ্জা করে। তবে বেশ কিছু টাকা লইয়া যাইতে পারিলে এতটা সঙ্কোচ থাকিত না।

সে বারবার বালুর উপর হইতে পা তুলিতেছে দেখিয়া বারিবালা কাপড়ের খুঁট নিংড়াইয়া তার পায়ের উপর জল ছিটাইয়া দেয়।

গোকুল বলে, এরেই কয় মাইয়া মানষের চক্ষু।

বারিবালা হাসে—গোকুলের প্রথম যৌবনের পরিচিত সলজ্জ সেই হাসি।

এর পর দু'চারটা কথাবার্তা যা হয় সবই তাদের বাড়ির সম্পর্কে। বারিবালা বলে, তোমাদের গাছে এবার অগুন্তি আম হয়েছিল, কাঁঠালও ঢের।

ছেলে মেয়ে অন্তত প্রচুর আম কাঁঠালও খাইতে পাইয়াছে জানিয়া গোকুল খুশি হইল।

বারিবালা বলিল, আমাদের সীমানার কাফলো গাছটা পড়ে গেছে।

গোকুল বলিল, গাছটা গেল! ওর আঠা দিয়া কত ঘুড়ি বানাইছি, মনে নাই?

ছেলেবেলায় এই ঘুড়ি ওড়ানোয় বারিবালা ছিল তার প্রধান সঙ্গী। কখনও লাটাই ধরিত, কখনও ঘুড়ি উড়াইয়া দিত। কতবার গোকুলের কাছে চড় চাপড় খাইয়াছে। একদিন সে বলে, ঘুড়ির সঙ্গে আমারেও উড়াইয়া দেও গোকুল মামা, আমি ঐ আকাশে চলিয়া যাই।

গোকুল সেদিন তার উপর রাগিয়াছিল। সে বলিল, তুই উড়িয়া গেলে বাঁচতাম। একটা বোঝা কমত।

বারিবালা হাসিয়া বলে, বাঁচতা?

মনে হয় এই সেদিনের কথা। তারপর দুই দুইটা যুগ অতীত হইয়া গেল।

বারিবালা বলিল, আমি এখন যাই, উনি অনেকক্ষণ গাড়ীতে বসে আছেন, হয়ত রেগে যাবেন। বড় লোকের মেজাজ না যেন আন্দরের রদ্দুর, এই মেঘে ঢাকা পড়ল, এই আবার চড়ল।

গোকুল জিজ্ঞাসা করিল, উনিও নাইতে আইছেন বুঝি?

না। গঙ্গাস্নান উনি করেন না। বলেন, ডার্টি ওয়াটার, অথচ

আমাকে রোজ গাড়ী করে গঙ্গা নাইয়ে নিয়ে যান। আজ আমি যাই, মাঝে মাঝে এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'র, তোমার ইচ্ছা হলে—বলিয়া বারিবালা চলিয়া যায়। পিছন হইতে গোকুল তার দিকে চাহিয়া থাকে।

খেলার সাথী, সম বয়সী এই মেয়েটি এক সময় ছিল তার কাছে হেঁয়ালির মতন।

বারিবালার বিবাহ হয় বেশী বয়সে, কুমারী অবস্থায় সে গোলাপীকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিত, মামা কেমন আদর করে রে?

গোলাপীর ভাল লাগিত না। সে বলিত, চুকা মিঠা, আছে একরকম।

বিবাহের রাত্রে বারিবালা বিধবা হয়। সেই হইতেই সে কেমন যেন গম্ভীর হইয়া গেল।

শ্বশুরবাড়ি চিতলমারি হইতে কেমন করিয়া কার সঙ্গে সে যে কলিকাতায় গেল গৌরীগ্রামের কেহ তাহা জানিত না। বছর কয়েক পরে মায়ের কাছে আসিল সোনা দানায়, শাড়ী ব্লাউজে শোভিত হইয়া।

এর পর হইতে বছরে সে একবার করিয়া মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া যায়। কোন বার সিধুকে একখানা ঘর তুলিয়া দেয়, কোন বার তার নামে জমি কেনে। বোনের দয়ায় সিধু বেশ সচ্ছল গৃহস্থ হইয়া ওঠে, তার ঢেঁকিশাল হয়, হাল গরু লাঙল হয়। গাভীতে দুধ দেয় রোজ দু'সের তিন সের করিয়া।

সিধু লোকের কাছে বড়াই করিয়া বেড়ায়, দিদি আমার কলকাতায় রূপচাঁদ মিত্তিরের অন্দরের ম্যানেজার। তানার পরিবার নাই, দিদির হাতেই সব। খাওয়া দাওয়ার খা আরম্ভ করিয়া সিন্দুকের চাবি পর্যন্ত।

বারিবালার জন্য সিধুরা কিছুদিন একঘরে ছিল। তার জন্য

স্বজাতীয়দের ভেকচি ভেকচি কাছিমের মাংস খাওয়াইয়া তবে জাতে ওঠে। গোপনে মোড়ল নবকুমারকে দেয় দশটা টাকা।

এরপর আর এক ঘরে হয় নাই, তবে মাতব্বররা কেহ অসন্তুষ্ট হইলে কিংবা তাদের কারও দু'পাঁচটা টাকার ঠেকা হইলে সে অমনি ধুয়া তোলে, সিধুরে লইয়া বাস্তব্য করা চলে না।

সিধুর মা ঘুষ দিয়া তার মুখ বন্ধ করে।

সবই প্রায় শোনা কথা। গোকুল ইদানীং বারিবালার কোন খবর রাখিত না। তার দুর্নামের জন্য গোলাপীও সিধুর বাড়ি যাতায়াত প্রায় বন্ধই করিয়াছিল।

বারিবালা যখন গৌরীগ্রামে আসিত গোকুল হয়ত তখন নৌকা লইয়া পদ্মা মেঘনা মধুমতী পাড়ি ধরিয়াছে। গ্রামে থাকিলেও ছেলেমেয়ে স্ত্রী লইয়া সে এতটা ব্যস্ত থাকিত যে অন্য কারও খবর রাখার সময় পাইত না।

আজ তাকে লাগিল বেশ। বাড়ির খবর দেওয়ার জন্যই ভাল লাগিল, না অতীতের স্মৃতির জন্য—গোকুল ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

একুশ

শুধু কলিকাতায় নয়, বাংলার গ্রামে গ্রামে দুর্ভিক্ষ, মহামারী। গৌরীগ্রাম গচাপাড়া প্রভৃতিও বাদ যায় নাই। খুব কম লোকেরই দু' বেলা ভাত জোটে, অনেকেই এক বেলা খায়, তাও আধ পেটা।

হেঁশেল হইতে প্রায় রাত্রেই ভাত চুরি যায়। গৃহস্থ ভিক্ষার ঝুলি লইয়া বাহির হয়। কিন্তু সেই ভিক্ষাও মেলে না। যে দু' একজন

ভিক্ষা দেয় তারাও দেয় পয়সা, ভাত নয়। লোকে চায় ভাত, খুদের জাউ, ফেন।

অনেকেই শাক পাতা সিদ্ধ খায়। কেহ খায় ব্যাঙের ছাতা, তেঁতুল বীজ। সব চেয়ে বেশী কষ্ট গরিব ভদ্র গৃহস্থের। সংস্থান নাই, সঞ্চয় নাই কিন্তু মর্যাদা বোধ আছে। না খাইয়া থাকে তবু লোকের নিকট হাত পাতিতে পারে না। কাপড়ের অভাবে তাদের ঘরের মেয়েরা লজ্জায় বাহির হইতে পারে না।

একদিন রহম চৌকিদার থানায় যাইয়া খবর দিল, অটুবাবুর ছেলে চপু না খাইয়া মারা গিয়াছে।

দারোগা ধমক দিলেন, ইউ ষ্টুপিড্। না খেয়ে মারা গেছে কি রকম? এতদিন চৌকিদারি করছিস আর রিপোর্ট দিতে শিখিসনি? কি হয়েছে ঠিক ঠিক বল।

রহম ভয়ে ভয়ে বলিল, ভাতের অভাবে চপু কাঁঠালের ভুষা খাইত। কাল ভুষা বেশী খাইয়া ফেলছিল। মরছে পেট ফুলিয়া।

দারোগা কহিলেন, তাই বল্, বেশী খেয়ে মারা গেছে।

উপরেও রিপোর্ট গেল সেই রকম। শুধু চপু নয় অতিরিক্ত আহারের ফলে এক গৌরীগ্রামেরই ফটিক, গফুর পিওনের নাতি এবং আরও পাঁচ সাত জন মরিল। নাতির শোকে গফুর কেমন যেন হইয়া গেল। ডাকের ব্যাগ কাঁধে করিয়া ঘোরে আর বলে, দাদু অ দাদু, ও আমেদ। দশ বছরের নাতিটিকে সে যেন চোখের সামনে দেখিতে পায়।

কখনও বা কোন পথচারীকে জিজ্ঞাসা করে, মা মাটি এত নিদয় হইছে কেন, কও দেখি।

একদিন তার প্রশ্নের উত্তরে সুকুমার বলিল, মাটি নিদয় হননি, চাচা সাহেব। আকাল লাগিয়েছে মানুষ।

গফুর বলিল, ইয়া আল্লা। মানুষ লাগাইছে আকাল! তারা মানুষ না আর কিছু?

সুকুমার বলিল, তারা আপনার আমার মতই হাত পা ওলা মানুষ, শুধু তাই নয়, তারা বড় মানুষ, গাড়ী মোটর চড়ে, লাট বেলাটের কাছে খাতির পায়।

গফুর বলিল, ইয়া আল্লা—

শুধু চাউল নয়, নুন চিনি কাপড় কেরোসিনও বাজার হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। লোকের ঘরে আলো জ্বলে না। শবের আচ্ছাদন পাওয়া যায় না। বয়স্করা বলে, গেলাবার লড়াইর পর ডেঙ্গু আইছিল। এবার তার সঙ্গে সঙ্গেই আইছে মড়ক।

মানিক গান বাঁধিল—

(ওরে) কে এমন লড়াই বাঁধাইল?
দেশটা দিয়া ছারে খারে
নিজের ভুঁড়ি বাড়াইল।
সিন্দুকে সোনা বাড়াইল।
মানুষ মরে ভাত না পাইয়া
তেঁতুল বিচি ভূষা খাইয়া।
সেই শ্মশানে চেরাগ জ্বালিয়া
(রাত্তিরে) কোঠা বানাইল।

হারাণ নন্দী হ্যাসাগ জ্বালিয়া রাতকে দিন বানাইয়া একটা নূতন দালান তুলিয়াছিল। এই গান শুনিয়া সে মনে মনে বলে, আচ্ছা সময় আসুক, কুত্তার বাচ্চাকে তখন জব্দ করে দেব।

আর মুখে বলে, শ্রীহরি শ্রীহরি।

দেশের এই অবস্থা। অন্নের সংস্থান করিতে জোয়ান মরদরা হিম শিম খাইয়া যায়। গোলাপী কিন্তু তার মধ্যেই ছেলে মেয়ে লইয়া কোন

রকমে টিকিয়া আছে। পরিশ্রম করে ভূতের মতন। সকালে কয়েক বাড়িতে দুধ দোহায়, দুই গৃহস্থের বাসন ধোয়, দুপুরে করে ঢেঁকির কাজ, বাগান ঝাঁট দেওয়া, লোকের পোঁতা বাঁধা। সন্ধ্যার দিকে আবার দুধ দোহাইতে হয়।

মানিকও কাজ করে, যখন যা পায় তাই, তবে বেশীই করে জমির কাজ, তাছাড়া প্রায়ই খাল হইতে মাছ ধরিয়া আনে। গোলাপীও এক একদিন খাল ধারে বঁড়শি লইয়া বসে।

একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে গোলাপী গড়াপাড়ার বাঁড়ুয্যে বাড়ির কাজ করিয়া ভাত লইয়া বাড়ি ফিরিতেছিল। মজুমদার বাড়ির কাছে রাস্তাটা নির্জন, অন্ধকার। মাথার উপরে ঝোপ, বাঁশ ঝাড়। অন্য দিনের মতন এখানে আসিয়া সে গতিবেগ বাড়াইয়া দেয়। ঠিক এই সময় একটা লোক ঝোপের মধ্য হইতে ছুটিয়া আসিয়া তার হাত হইতে খাবারের থালা বাটি ছিনাইয়া লইল। গোলাপী তার দিকে চাহিয়া দেখিল, মানুষ না যেন প্রেত মূর্তি। না খাইয়া খাইয়া এত শীর্ণ হইয়া গিয়াছে যে মাটিতে তার ছায়া পড়ে কিনা সন্দেহ।

গোলাপী শুনিয়াছিল ভূতের ছায়া থাকে না। এটাও ভূত না কি ভাবিয়া তার ভয় করে।

সে জোরে হাঁটিতে আরম্ভ করিলে মূর্তিটা বলে, দাঁড়াও, তোমার থালা বাটি নিয়ে যাও।

গোলাপী হয়ত দাঁড়াইত না। কিন্তু তার মনে পড়িল বাসনগুলি তার নয়, যে বাড়ি কাজ করে তাদের। সে অগত্যা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া লোকটার খাওয়া দেখে। খাওয়া না যেন উনানে জ্বালানি ঠেলিয়া দেওয়া। লোকটা কাঁটা ও হাড় সমেত মাছ গেলে। সজনের ডাঁটা চিবাইয়াও ছিবড়া ফেলে না।

খাওয়া শেষ হইলে সে পাশের নালায় নামিয়া থালা বাটি ধোয়।

সেগুলি গোলাপীর হাতে দিয়া বলে, কাল আসব এই সময়, ভাত দেবে ত মা? দিও দিও, বলিয়াই কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া হন হন করিয়া চলিয়া যায়।

গোলাপী ভাবে, মানুষটা কে? কথাবার্তা ধরন ধারন বেশ ভদ্র। তবে তাদের গ্রামের লোক নয়। হইলে চিনিতে পারিত।

সে বাড়ি ফিরিল ঠিক সন্ধ্যায়। কুমি ছুটিয়া আসিয়া বলিল, বাবার চিঠি আইছে, মা। গফুর দাদু দিয়া গেছে।

এঁ্যা চিঠি! কই কই? গফুর চাচা আর কিছু কইল?

না, আর ত কয় নাই কিছু,—কুমি মায়ের হাতে একখানা চিঠি দিয়া বলে, ভাত কই মা?

ভাত একজন মানুষে খাইয়া গেছে।

মায়ের মুখের দিকে একটুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কুমি কাঁদিয়া ফেলে।

ঘরে কেরোসিন নাই। অব্যবহার্য অবস্থায় পড়িয়া থাকায় টিনের কুপিটায় মরিচা ধরিয়াছে। আলোর অভাবে সন্ধ্যার আগেই তারা রাত্রের খাওয়া সারিয়া নেয়। চাঁদিনী রাতে এক একদিন উঠানে বসিয়া খায়।

মানিক আসিলে শুকনা পাতা জ্বালিয়া চিঠি খানি পড়া হইল। জেল হইতে বাহির হইয়া গোকুল প্রথমে যেখানা লেখে সেই চিঠি।

দীর্ঘ দিন পরে গোকুল ও গোলাপীর বাবুইর বাসা হাস্যোজ্জ্বল হইয়া ওঠে।

পিসির শরীর খারাপ। কিছুদিন যাবত অনেক সময়ই শুইয়া থাকে। গোকুলের খবর শুনিয়া সেও উঠিয়া বসিল। বলিল, এঁ্যা! গোকলার পত্তর আইছে? আমি ত কইছি গোলাপী যে তোর একদিন জল জলাট হবে। অমন সতী তুই।

রাত দুপুর পর্যন্ত তারা গোকুলের গল্প করিল, সে কি খাইতে ভাল

বাসে, হাসে কেমন করিয়া, নৌকা বাহিতে বাহিতে কোন গানটা সে বেশী গাহিত এই সব আলোচনা। মানিক বলিল, বাবা মেস্তরীও ছিল ভাল, নৌকা খান ত নিজেই গড়াইছে।

পরের দিন সকালে পিসি বলিল, মাচায় আমার ঝাঁপিটা আছে। দে দেখি মাইনকা।

মানিক ঝাঁপিটা আনিয়া দিলে বৃদ্ধা একটা টাকা বাহির করিয়া বলিল, তুই এই দিয়া ইলিশ মাছ নিয়া আয় আজ, এমন আনন্দের দিন।

বৃদ্ধার স্নেহের এই পরিচয়ে গোলাপীর চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল। পিসি বলিল, তোরগো লইয়াই ত আমার বাঁচিয়া থাকা।

গোলাপী স্বামীর পত্রের উত্তরে লিখিল, রোজগার পরে হবে। তুমি বাড়ি আসবা। তোমার কি একবার কুমি মানিকরেও দেখতে ইচ্ছা করে না?

পরপর গোকুলের কয়েকখানা চিঠি আসে। প্রতি চিঠিতেই থাকে কলিকাতার মহামারীর খবর। তাদের সংসার কি ভাবে চলে সেই সম্পর্কে প্রশ্ন। আর লেখে, টাকা কড়ি কিছু লইয়া বাড়ি যাব।

এক খানিতে ছিল, মাঝিগিরির চেষ্টা করিলাম। গঙ্গার মাঝি মাল্লারা সব দেশোয়ালী। তারা আমাকে রাখিতে চায় না। বলে, বাঙালীরা মাছ খায়। তাদের দিয়া মাঝি মাল্লার কাজ চলে না।

মাছ খাওয়া যেন মস্ত পাপ। পশ্চিমারা বোধ হয় ভাবে যারা মাছ খায় তারা কোনও কাজই করিতে পারে না।

বেটারা ত জানে না যে জলের দেশেই আমরা বাস করি। হামাগুড়ি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৈঠা টানি, লগি বাই।

আর কিছু দিনের মধ্যে কাজের জোগাড় না হইলে আমি দেশেই যাব।

পরের চিঠিতে ছিল, বাবির সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। হইলে চাকরির সুবিধা হইত।

বাইশ

পূজার পর হইতেই গোকুলের কোন খবর নাই। গোলাপীর মন খারাপ। তবুও নিয়ম রক্ষার খাতিরে সে নবান্ন করে। কুল পুরোহিত আসেন। পিতৃপুরুষ ও দেবতাদের উদ্দেশে নূতন চাল ও নূতন গুড়ের নবান্ন নিবেদন করা হয়।

দুপুরের কিছু পরে। খাল ধারের শিমুল গাছের ছায়া গাছতলা ছাড়াইয়া পুবে হেলিয়া গিয়াছে, সেখানে পিসি ও কুমি দাঁড়াইয়া তাদের হাতে দু'টা নারিকেলের মালায় খানিকটা করিয়া নবান্ন মাখা। তারা সুর করিয়া বলে,

কাউয়া কোঁ কোঁ কোঁ
আমাগো বাড়ি শুভ নবান্নো-ও-ও
তোমাগো নেমতন্নো-ও-ও।

কুমি শশার কুচি চিবাইতেছিল বলিয়া তার কথা গুলি জড়াইয়া যায়। অদূরে মায়ের পাশে দাঁড়াইয়া মানিক মুচকি মুচকি হাসে। পিসি বলে, হাসিস না মাইনকা, কাউয়ারে নবান্ন দিলে আশীর্বাদ করবে। আর বছর বেশী ধান পাবি। নবান্ন করবি বাবারে লইয়া।

গোলাপী কহিল, সেই আশীর্বাদই কর পিসি। এবার মানিকের ধানে নবান্ন। সে ঘরে থাকলে কত সুখই না হইত।

গোকুলের জন্ম পিসিও বেদনা বোধ করিত। তার কণ্ঠ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিল কিন্তু আগামী শুভ দিনের আশায় সে তখনও ধীরে ধীরে আওড়াইতেছে,

কাউয়া কোঁ কোঁ কোঁ।

এই সময় খাল ঘাটে নৌকা হইতে দুইটি স্ত্রীলোককে নামিতে দেখিয়া মানিক তাদের দিকে আগাইয়া গেল। একটু যাইয়াই ডাকিয়া বলিল, মা, বড়মা আইছে আর—আর—

আর তোর ছোট মা, আমারে চিনলি না?—বলিয়া ছোট রাণী মানিকের মাথা নিজের কোলের মধ্যে চাপিয়া ধরে।

সে যখন স্বামীর ভিটা ছাড়িয়া যায় মানিক তখন ছোট ছিল। আর ছোট রাণীও ছিল সুন্দরী। আজ ছোট মা বলিয়া যে নিজের পরিচয় দিল তার মুখ খানায় বসন্তের দাগ, বাঁ চোখের মণির পাশে সাদা রেখা। মানিক একটুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, ও তুমি ছোট মা?

বড়রাণীর চেহারাও বদলাইয়াছে। সে ছিল রোগা এখন মোটা হইয়াছে।

গোলাপী আগাইয়া গিয়া বড়রাণীকে প্রণাম করিলে সে তার চিবুক ধরিয়া বলিল, তোর বাড় বাড়ন্ত হোক।

ছোটরাণী গোলাপীর সমবয়সী; হয়ত বা কিছু ছোট। সে হাসিয়া বলিল, আমারে সেবা দিলি না যে? যাউক না দিলি।

ঠাকুরপো কোথায়? সে আসে নাই. কলকাতায় চাকুরী করে বুঝি?

সে শুনিও পরে, এখন ঘরে চল।

ছোটরাণী বলিল, খাঁচার পাখী একবার ওড়লে আর ধরা দিতে চায় না।

কথাটা গোলাপীর ভাল লাগে না। সে চুপ করিয়া থাকে। কিন্তু ছোটরাণীর কথার উত্তর দেয় তার সতিন। কেন, তুইও ত খাঁচার পাখী, উড়িয়া আবার ধরা দিছ।

ধরা কি নিজে দিছি? দেওয়াইছে রোগে।

বড়রাণী বলিল, পোড়া কপালী।

ছোটরাণীকে দেখিয়া পিসির সর্বাঙ্গ যেন জলিয়া যায়। সে আপন মনে বিড় বিড় করে, মস্ত পাখী আইছে।

রাত্রে শুইয়া জা'দের মধ্যে অনেক কথা হইল। ভিটার খাজনা, ডোবার মাছ, মালিকের বেগার—বড়রাণী অনেক বিষয়েই প্রশ্ন করিল। মানিককে বলিল, ছড়া বাঁধিয়া তোর খুব নাম হইছে, শোনলাম।

কইল কেডা?

কইছে ভীম।

ভীমকা! সে কোথায়?

কেন, তোরা জান না? সে আমার ভাইদের চাকুরি করে। তোর ছোট মামার সঙ্গে তার খুব ভালবাসা হইছে।

মানিক বলিল, নিস্তার ঠান্‌দিরে আমি সকালেই কইয়া আসব।

বুড়ী জানে না?

তার লগে ঝগড়া করিয়াই ত ভীমকা উধাও হইছে।

বড়রাণী গোলাপীকে তার আসার উদ্দেশ্য বলিল, সে আসিয়াছে স্বামীর ভিটায় ঘর তুলিয়া ছোটরাণীকে এখানে রাখিয়া যাইতে।

পিসি এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। সে বলিল, ও থাকলে সারা দেশে গণ্ডগোল বাধবে। এই বেচারীরা একঘরিয়া হবে।

বড়রাণী বলিল, কেন? ও ত বরাবর সোয়ামীর সঙ্গে আমার বাপের বাড়িতে থাকত। তিনি চলিয়া যাওয়ার পরও দুই বোন একস্তর আছি।

পিসি বলিল, মিছা কথা।

গোলাপী জায়ের মিথ্যা কথাই সমর্থন করিল। বলিল, ও ত জামুলায়ই ছিল।

মিথ্যুক তোরা সবাই। কবিরাজ ছাওয়াল বাঁচিয়া থাকলে আমি আর এ পুরীতে বাস্তব্য করতাম না।

গোলাপী বলিল, তুমি রাগ করিও না, পিসি।

সমাজ ঘোঁট পাকাইতে পারে এই আশঙ্কায় বড়রাণী পরদিন সকাল হইতেই কথাটা রটাইতে লাগিল। যাকে পায় উপযাচক হইয়া তাকেই বলে, ভদ্দরা এতদিন আমার বাপের বাড়িতেই ছিল।

ঘর তোলার জন্য সে মানিককে ভাল একজন মিস্ত্রী আনিতে বলিলে মানিক বলে, যোগানদারের কাজ করব আমি। আমারে পয়সা দেবা ত?

নিস্‌রে, পাগলা নিস্‌।

গোলাপী বলিল, তুমিও এইখানে থাক দিদি।

বড়রাণী বলিল, ইচ্ছা ছিল থাকবার। কিন্তু মা বুড়া হইছে সে আমারে ছাড়তে চায় না।

মানিকের কাছে ছেলের খবর পাইয়া লাঠি ঠক ঠক করিতে করিতে পরদিন বেলা ন'টা আন্দাজ নিস্তার আসিয়া উপস্থিত। তাকে দেখিয়া ফুমি বলিয়া উঠিল, লাল দাড়ি।

শোন্‌লা, শোন্‌লা, শয়তানের কথা—বলিয়া নিস্তার তাকে তাড়া করে। তার চিবুকের দু'পাশের দাড়ি দু'গাছা লাল হইয়া গিয়াছে, উহা লইয়া ছোটরা ঠাট্টা করে আর বৃদ্ধা খেপিয়া যায়।

বড়রাণী বলিল, অর কথায় কি হয়? তুমি আইস খুড়ীমা।

বৃদ্ধা বলে, তোরগো লগে দেখা করতেই ত আইলাম। আমার হারামজাদা নাকি তোর বাপের বাড়ি আছে?

হ। শোনলাম সে নাকি ঝগড়া করিয়া গেছে?

অরগো কথা আর কবি না। বংশটাই ঐ রকম। আগে জ্বালাইত বাপ, এখন জ্বালায় ছাওয়াল। ছাওয়াল না পেটের শত্তুর। তাই মাইন্‌কার কাছে মাঝে মধ্যে যশোদা-বিলাপ শুনি।

বড়রাণী বলিল, ভাল কর। দেবতার কথা শোনলে দুই কালেরই কাজ হয়। যশোদার গান বাঁধছে কেডা রে, মানিক?

বাঁধছে জেঠা। আমি শশীদার কাছে শিখছি।

আমারে শুনাইস।

ছোটরাণী বলিল, তুমি যশোদা-বিলাপ দিয়া করবা কি? তুমি শোনবা অন্য গান।

কেন রে?

যশোদা কাঁদতেন তার ননী-চোরার জন্য। তোমার ননীচোরা ছিল না বলিয়াই ত আমারে আনলা।

সে কথার কোন উত্তর না করিয়াই বড়রাণী নিস্তারকে প্রশ্ন করিল, ভীমের টাকা পাও ত খুড়ীমা?

ভীমার টাকা! মাসে সাত আট টাকা পাই। সে কি ভীমা পাঠায়? নাম ত থাকে আমার মামাত ভাই সরলের।

পাঠায় কিন্তু ভীম ঠাকুরপো।

আমার ভীমা, ভীমচন্দর?—বৃদ্ধা আনন্দে যেন ফাটিয়া পড়ে। একটু পরে আবার বলে, ওরে হারামজাদা। তুই হইলি পেটের কাঁটা। তুই ক্ষ পাঠাবিই। আমার যাওয়ার ক্ষ্যামতা নাই, তুই তারে আসতে লেইখ্যা দে, গোলাপ।

গোলাপী বিব্রত বোধ করিয়া বলিল, আমি কেন খুড়ীমা?

তুই লেখলে আসবেই। তোর কথা ফেলতে পারে তার বাপেরও এমন সাধ্য নাই—এইটুকু বলিয়া নিস্তার আপন মনেই যেন আওড়ায়, পুরুষ হইল কাঙালের জাত। যুবো মাইয়া একটু ডাকলে আর কথা নাই।

গোলাপী এবার জাঁদের মুখের দিকে তাকায়। বড়রাণীর মুখে কোন বৈলক্ষণ্য দেখিতে পায় না কিন্তু তার মনে হয় ছোটরাণীর বাঁ চোখটা দিয়া কৌতুক যেন ফাটিয়া পড়িতেছে।

বৃন্দার কথা গোলাপীর মনকে একটু দোলা দেয়। সত্যই ত ভীম ঠাকুরপো তার কোন কথা ফেলে না। সামান্য অনুরোধটুকু রক্ষা করিতে পারিলেও যেন ধন্য হইয়া যায়।

আর সে নিজে? নিজের মনের দিকে গোলাপী কখনও চোখ মেলিয়া তাকায় নাই। জিনিসটাকে বরাবরই এড়াইয়া চলিয়াছে। তাকে নীরব দেখিয়া ছোটরাণী ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, ভাবিস্ কি রে?

কিছু না।

ছোটরাণী বলিল, ভীম ঠাকুরপোর কথা বুঝি?

গোলাপী অবাক হইয়া যায়। এ কে? তার জা, তার বন্ধু ভদ্দরা (ভদ্রা), না জাদু জানা আর কোন মেয়ে? গোলাপী ভয়ে ভয়ে বলে, না না।

* * * * *

মণিরামের ভিটায় ঘর উঠিবে। মানিক ভিটার জঙ্গল পরিষ্কার করিতেছিল। আধা আধি পরিষ্কার করার পর একটা গোলাপ গাছের সামনে আসিয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বড়রাণী বলিল, কিরে মাইনকা?

গোলাপ গাছটা কাটতে ইচ্ছা করে না।

অমন ফলন্ত শশা কুমড়ার মাচা ভাঙলি, বোম্বাই লঙ্কার গাছ সব উপড়াইয়া ফেললি, ফাঁপুয়া গাছটারে কাটলি, আর মায়া একটা ফুলগাছের জন্ম?

কেমন সুন্দর সুন্দর ফুল ফোটছে। গন্ধে চারিদিক ম ম করে। কাটতে কষ্ট হয়, বড় মা।

বড়রাণী বলিল, পাগলা ছাওয়াল আমার।

বৈকালে সে গোলাপী ও ছোটরাণীর কাছে এই গল্প করিল্লে

ছোটরাণী বলিল, এ হইল তোমার সোয়ামীর দেওয়া কাব্যশক্তির ফল।

বড়রাণী রাগের ভান করিয়া বলিল, সোয়ামী কি খালি আমার একলার, না তোরও?

ছোটরাণী বলিল, ধরিয়া নেও তোমারই।

একথা আগে জানলে তোরে কি আমি বাঁচাইয়া তোলতাম?

আমার জন্য কিছু কর নাই, দিদি। নিজেরে ভালবাস, বাঁচাইছ সেই জন্য।

ছোটরাণী নিরুদ্দেশ হওয়ার দীর্ঘ দিন পরে বড়রাণী একদিন খুব ভোরে উঠিয়া দেখে তার বাপের বাড়ির খালঘাটে একটি নারী পড়িয়া আছে। গায়ে উৎকট গন্ধ, বসন্তের পাকা পাকা গুটিতে সর্বাঙ্গ ফুলা। মুখখানা কুমারের ছানা মাটির পিণ্ডের মত, নাক মুখ কিছুই চেনা যায় না। বড়রাণী জিজ্ঞাসা করিল, কে রে? কে তুই?

রোগিণী বলিল, অঃ দিদি?

কার দিদি আমি? তুই কেডা?

চেনলা না? আমি ভদ্রা—ছোট—

ওঃ ছোটরাণী পোড়ার মুখী! সোয়ামীর মাথা খাইয়া আজ এই চেহারায় ফিরলি!

ছোটরাণী কাঁদিয়া ফেলে। শব্দও ঠিক মতন বাহির হয় না। বড়রাণী তাকে বহির্বাটির এক ঘরে রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিল। খরচা দিত ভাইয়েরা। সেবা করিত সে নিজে। মধ্যে মধ্যে তার মা সাহায্য করিত।

ভদ্রা ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিল। প্রথম যেদিন সে বুঝিতে পারিল যে তার একটি চোখ খারাপ হইয়া গিয়াছে, সেদিন সে কী তার কান্না! কাঁদে আর বলে, এই জন্য তুমি আমারে সারাইয়া তোললা?

বড়রাণী বলিল, সতিনের কাজ করছি।

ভদ্রা কহিল, যে দেখবে, সেই মুখ ফিরাইয়া নেবে।

বড়রাণী বলিল, বিধবার আবার অত দেখাদেখি কিসের? সুন্দর হওয়ার শখ তোর এখনও মেটল না!

তুমি কিছুই বোঝ না।

ছোটরাণীর অজ্ঞাতবাসের ইতিহাস বড়ই করুণ। মণিরাম ও বড়রাণী জামুলায় যাওয়ার পরও বহুদিন সে স্বামীর ভিটায় ছিল। অনেক কষ্ট পাইয়াছে কিন্তু ঘর ছাড়ে নাই। গোলাপী কিছু কিছু সাহায্য করিত। গোকুল উহা পছন্দ করিত না।

এই সময় গ্রামের নকুল বারুই বৈষ্ণবের ভেক নেয়। খঞ্জনি বাজাইয়া কণ্ঠে মধু ঢালিয়া ছোটরাণীকে সে গান শুনাইয়া যাইত। গাহিত বিরহের গান, মানভঞ্জন।

ছোটরাণী বলিল, মানভঞ্জনের দরকার নাই। তুমি আমারে খাইতে দিতে পারবা কিনা কও। আর এক কথা, আমারে কখনও ছোটরাণী ডাকতে পারবা না।

বৈষ্ণব নকুল বলিল, তুমিই ত আমার রাণী। রাধারাণী।

অন্নদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া ভদ্রাকে সে কুলের বাহির করে। কিছুদিন পরেই ভদ্রা দেখিল, নকুলের বৈষ্ণবী সে একা নয়, আরও আছে। স্বামীর শয্যা সে অপর একজনের সঙ্গে ভাগ করিয়া লইয়াছিল, উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু নকুলকে সেইভাবে গ্রহণ করিতে পারিল না। তার আশ্রয় ছাড়িল। ঘুরিল বৈষ্ণবের আখড়ায় আখড়ায়।

কিন্তু এরপর সে আর কাহাকেও দেহ দান করে নাই। মন ত নয়ই।

একদল বৈরাগীর সঙ্গে সে গঙ্গাছানা গ্রামের বিখ্যাত আখড়ায়

যাইতেছিল। পথিমধ্যে বসন্ত হওয়ায় সহযাত্রীরা তাকে জামুলায় ফেলিয়া গিয়াছে।

তেইশ

নিস্তার প্রায়ই আসে। জামুলায় ভীম কি করে, লোকে তার সম্পর্কে কি বলে, সে কি খায়, মণিরামের স্ত্রীদের সঙ্গে এইসব বিষয় আলোচনা করে।

একদিন সে গোলাপীকে বলিল, পরের কথায় আমি তোরে মিছামিছি গালমন্দ করছিলাম, কিছু মনে করিস না।

গোলাপী বলিল, আমার তখনই সন্দ হইছিল। কার কথায় রাগছিলা খুড়ীমা?

নিস্তার বলিল, কাবুলের কথায়।

হরিমতীকে সে বলে কাবুল।

গোলাপী বলিল, ওঃ। এখন বোঝলাম চপিরে ফিরাইয়া দেওয়ার ফল।

বড়রাণী বলিল, কোন্ চপি, যে কাঁঠালের ভুষা খাইয়া মরছে?

গোলাপী বলিল, হ।

তাকে অপমান করার কয়েকদিন পরেই হরিমতী চপিকে দিয়া গোলাপীকে ডাকিয়া পাঠায়। গোলাপী বলে, না, আমি যাব না।

চপি বলে, বড় মানষের মাইয়া, একবার নয় রাগ করছেই। গরিবের কি তাতে গোসা করা চলে?

হরিমতীর স্বভাব গোলাপী ভাল জানিত। আজ সে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে কিন্তু এরপর পান হইতে চুন খসিলেই আরও বেশী

অপমান করিবে। মানুষকে পায়ের তলায় পিষিয়া সে অদ্ভুত আনন্দ পায়। সে মনে করে, গরিবরা মানুষ নয়, পশু। কুকুরকে লাথি মারিয়া আবার তুঃ তুঃ করিয়া ডাকিলেই সে যেমন লেজ নাড়িতে নাড়িতে ছুটিয়া আসে, হরিমতী আশা করে, গরিবরাও সেই রূপই ছুটিয়া আসিবে।

গোলাপী না যাওয়ায় সে বলিল, মাগী কী বজ্জাত। ছাওয়াল মাইয়া লইয়া উপাস করবে তবু মানের মাস্তুল নিচা করবে না।

* * *

ছোটরাণীর ঘর উঠিল, শণের চালা, বেড়া দরমার। একদিকের বারান্দায় হইল ঢেঁকিশাল।

বড়রাণী নূতন ঘরে আসিয়া ছোটর সংসার বাঁধিয়া দিল। দু'জনে ভাব খুব অথচ তারা যে সতিন একথাও যেন ভুলিতে পারে না। কথায় কথায় কোঁদল করে। একে অপরকে খোঁটা দিয়া কথা কয়।

বড়রাণী ছোটর জন্য কত করিয়াছে, এখনও কত করে, অথচ ছোটর বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা নাই।

একদিন গোলাপী তাকে বলিল, দিদি তোমারে অত ভালবাসে। কিন্তু তুমি ত কটু কইতে ছাড় না।

আমি ভোলতে পারি না যে সোয়ামীর ছাওয়াল হওয়ার জন্য ও আমারে আনছিল।

কথাটা গোলাপীর কাছে একেবারে নূতন। সে জিজ্ঞাসা করিল, তাতে দোষটা কি? মাইয়া লোকের জন্মই ত ঐ জন্য। আসল কথা, ভাসুর ঠাকুর বুড়া ছিল, তুমি তানারে ভালবাসতা না।

ভাল হয়ত বাসতে পারতাম যদি সে আমারে একটা যন্তর মনে না করত। ছাওয়াল মাইয়া হওয়ার কারখানা।

এ যেন আরও রহস্য। ব্যাপারটা গোলাপীর কাছে ধোয়াটে

হইয়া উঠে। সে বলে, মাইয়া লোকে মা হবে না ত ছাওয়াল মাইয়া কি বাহির হবে গাছ আর মাটি ফুঁড়িয়া ?

ছোটরাণী বলিল, তুই এসব বুঝবি না।

গোলাপীর মনে হয় ছোটরাণী হয়ত সত্য সত্যই বেশী বোঝে। সে চুপ করিয়া যায়।

বড়রাণী প্রায়ই মানিকের গান শুনিতে চায়। মানিক শুনায় রাধা কৃষ্ণের গান, কালী কীর্তন, মনসার রয়ানি। তু' একদিন নিজের লেখা গানও শুনায়।

বড়রাণী বলিল, একদিন তোর খুব রোজগার হবে। জেঠার মতন। এখন কেমন হয়?

গান গাইয়া এবার পুজায় চারডা টাকা রোজগার করছি আর বারটা নারকোল।

জেঠার মেডেল আর খাতা করলি কি?

মানিক মণিরামের প্রদত্ত মেডেল আর খাতা আনিয়া দেখাইল। একখানি দেখাইল নিজের গানের খাতা।

বড়রাণী বলিল, তানার চাদরখানা প্যাটরায় আছে বুঝি?

না, সেখান মা আর আমি পরছি।

তানার অমন মাক্তের চাদর!—বলিয়া বড়রাণী চাদরের জন্ম আক্ষেপ করে।

মানিক একদিন বলিল, নতুন গান শোনবা? খুব ভাল গান।

ছোটরাণী বলিল, বন্দে-মাতরম্ এর মতন স্বদেশী?

এও স্বদেশী। তবে আর এক রকম।

বড়রাণী বলিল, বেশ ত, শুনা।

মানিক আরম্ভ করিল, ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা।

গান থামিলে বড়রাণী বলিল, ঝাণ্ডা ডাণ্ডার গান আবার কি ?

মানিক বলিল, ও আমাগো নিশানের গান, বন্দে মাতরম্ যেমন ভারতমাতার গান।

তার মা এবং বড় মা এই ব্যাখ্যা যে কিভাবে গ্রহণ করিল বোঝা গেল না। ছোটরাণী বলিল, এই রকম গান আরও শুনা।

মানিক ধরিল, খর বায়ু বয় বেগে,

চারি দিক ছায় মেঘে

ওগো নেয়ে নাওখানি বাইও,

আমি তুলে ধরি পাল,

তুমি কষে ধরো হাল,

হাঁই মারো, মারো টান হাঁইও।

শ্রোতাদের মুখভাবের পরিবর্তন হয়। তাদের ভাল লাগিতেছে বুঝিয়া মানিক সুর আরও চড়ায়—

শৃঙ্খলে বার বার

ঝনঝন ঝঙ্কার

নয় এ ত তরণীর ক্রন্দন শঙ্কার—

গানের মধ্যে মানিক সমস্ত প্রাণ মন ঢালিয়া দেয়। বড়রাণী, ছোটরাণী, গোলাপী তিনজনেই উন্মুখ হইয়া শোনে।

গান শেষ হইলে বড়রাণী বলিল, শত হইলেও ছাওয়াল নৌকার গানই গায়। শরীলে মাঝির রক্ত ত।

মানিক মুচকি হাসে।

ছোটরাণী বলিল, খাসা গান, এ তোরে শিখাইছে কে ?

শিখছি জনকল্যাণে, মহারাজদার কাছে।

তুইত রাত্তিরে সেইখানেই পড়তে যাস। অরা নাকি নতুন নতুন অনেক কিছু শিখায় ?

হ, নতুন গান শেখায়। নতুন অনেক কথা।

কয়েক দিন পরে বড়রাণী জামুলায় রওনা হইয়া গেল। যাওয়ার সময় ছোটর হাতে কয়েকটি টাকা দিয়া বলিল, কিছুদিন এতে চলবে, এর পর নিজে চালাবার চেষ্টা করিস্।

তা করব, দিদি।

নবকুমার কি কোন মাতব্বর এক ঘরিয়া করার কথা তোললে তারে নগদ চার পাঁচটা টাকা দিস্। সব মিটিয়া যাবে। বেশী লোকে গোলমাল করলে তারগো কাছিমের মাংস খাওয়াইয়া দিবি।

ছোটরাণী বলিল, সে ভয় আর নাই। তোমার আর গোলাপীর কথায় লোকের বিশ্বাস হইছে আমি জামুলায় ছিলাম।

বড়রাণী বলিল, আর কারেও ডরাই না। ভয় করতাম শুধু পিসিরে।

গোলাপী বলিল, বুড়ী সতী সতী করিয়া পাগল কিন্তু মরিয়া গেলেও পরের কোন খেতি সে করবে না।

তাই ত জানতাম। কিন্তু দেখলা রাগে রাগে কেমন শুকাইয়া গেছে।

গোলাপী বলিল, রাগে না। শুকাইছে না খাইয়া।

ছোঁয়াছুয়ি বাঁচাইতে যাইয়া উলকি পিসি প্রায়ই খাইত না। এক বারের জায়গায় পাঁচ বার স্নান করিত, আর আপন মনে সতীদের নাম আওড়াইত,

গৌরী সতী, সীতা সতী, সতী মা বেউলা।

বড়রাণীর নৌকা ছাড়িয়া দিলে ছোটরাণী গোলাপীর দিকে চাহিয়া বলিল, দিদির ভাইদের দয়া আর কতদিন নেব? এখন একটা কাজ জোটাইতে পারলে হয়।

গোলাপী বলিল, তা পারবা। আর দাসীগিরি রাঁধুনি গিরির পথন্ত আমি খুলিয়া দিছি।

তুই আর আমি? তোর ছাওয়াল আছে, সে বড় হইছে। তোরে কেউ কিছু কবে না। কিন্তু আমি পরের বাড়ির কাজ করলে ছিঃ ছিঃ পড়িয়া যাবে।

কথাটা সত্য। ছোটরাণী তা বোঝে অথচ ছেলের মা হওয়ার জন্য ভাসুর তাকে আনিয়াছিলেন বলিয়া তাব এত রাগ। গোলাপী ইহার সামঞ্জস্য করিতে পারে না।

কয়েকদিন পরে ছোটরাণী মানিককে জিজ্ঞাসা করিল, সুকুমারের স্কুলে অত ভাল গান হয়। আর শিখায় কি রে?

শিখায় অনেক কিছু লেখাপড়া, গান, সেলাই, মুখে মুখে দেশ বিদেশের গল্প করে। গান্ধীজীর গল্প, সুভাষ বাবুর গল্প আরও অনেকের। তানারা সব বিদেশী লোক।

গোলাপী প্রশ্ন করে, তাদের গল্প করে কেন?

সে এক কথায় কইতে পারব না। গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের মতন তানারাও মস্ত মস্ত লোক।

ছোটরাণী বলিল, জনকল্যাণে মাইয়া লোকে পড়তে যায়?

যায় ছোটরা। বড় কেউ নাই। সুকুদা কয়, কয়টি মাইয়া লোক পাইলে কল্যাণের অনেক উন্নতি করতে পারত।

আচ্ছা, আমি যদি যাই, আমারে নেবে?

মানিকের মনে হয় ছোট মা যোগ দিলে জনকল্যাণের উন্নতি হইবে। সে বলিল, আমি কালই সুকুদারে শুধাব।

পরদিনই সে সুকুমারকে বলিল, আমার ছোটমা জনকল্যাণে আসতে চায়। তারে নেবেন?

কে, মণিরাম কবিরাজের ছোট বউ? তিনি এলে ত ভালই হয়।

চব্বিশ

আমন ধানের ফসল ভালই হইয়াছিল। চাষীর ঘরে, বর্গাদারের ঘরে কিছু ধান উঠিল। চাষী আশা করিল কচি কাচ্ছা লইয়া কোন রকমে হয়ত টিকিয়া থাকিতে পারিবে।

কিন্তু ধান ছাড়াও ত অনেক কিছু চাই, তেল নুন কাপড় দেশলাই। দেনার সুদ দিতে হইবে, ছেলে মেয়ের খুব বেশী অসুখ করিলে দু' এক-বার অন্তত: ডাক্তার বদ্যিও ডাকিতে হইবে।

হারাণের দালালরা ধান কেনার জন্য বাড়ি বাড়ি ঘোরাঘুরি করে। শুধু ধানের দামই নগদ নয়, আগামী ফসলের জন্যও জায়গা বুঝিয়া দাদন দিতে চায়।

একদিন নন্দী বাড়িতে কলিকাতা হইতে হলদে পাগড়ি পরা এক মারবাড়ী আসিল, সঙ্গে এক বাঙালী ভদ্রলোক।

পাগড়ি মাথায় লোকটি হারাণের পরিচিত, আগেও তারা একসঙ্গে কারবার করিয়াছে। হারাণ পরম সমাদরে তাকে অভ্যর্থনা করিল, রাম রাম, আইয়ে ভগওয়াতি বাবু।

ভগওয়াতী অর্থাৎ ভগবতীর বপুটি যেমন বিশাল, কারবারও অনুরূপ জোরালো। তিনি বলিলেন, রাম রাম নুন্ধী বাবু। সব আচ্ছা?

হ্যাঁ, সঙ্গে ইনি কে?

পোকা মাকড়কা বাবু, মিস্টার চাটুরজি।

হারাণ দীর্ঘ, ক্ষীণকায়, মাথায় বিরলকেশ মিষ্টার চাটুরজির স্বরূপ ঠিক বুঝিতে পারিল না।

ভগবতী বুঝাইয়া দিলেন, সরকার খাদ্যশস্য পরীক্ষার জন্য ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত করিয়াছেন। এদের কাজ শস্যে পোকা মাকড় আছে কিনা পরীক্ষা করা।

ভগবতীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে চাউল সংগ্রহের কাজ আরও জোরে শুরু হয়। বেশীর ভাগ গৃহস্থই অভাবে পড়িয়া ধানচাল বেচে, দুচারজন বেচে লোভে পড়িয়া।

ধান চালের বিরুদ্ধে জনকল্যাণ দাঁড়াইল বটে কিন্তু দুচারদিন যাইতে না যাইতেই দেখা গেল সুকুমারের দলেও ভাঙন ধরিয়াছে। মুকুল বলিল, ধান না বেচিয়া কবব কি? আমার ডিক্রি ঠেকাইতে হবে। ভিটা যে নিলামে ওঠছে।

নরেন গোঁফ চুমরাইয়া বলিল, তোমার পেছনে আছি সর্বদাই, সুকুদা। কিন্তু বউটির যে যক্ষে। কবিরাজের সোনা কস্তুরীর দাম আগাম দিলে তবে সে ওষুধ বানাইয়া দেবে।

সুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, বউর অসুখ করল কবে?

রক্তই পড়তেছে আজ তিনমাস। কাউরে কই নাই। ছিলাম ধানের মুখ চাইয়া। এইবার লাগাব সোনা কস্তুরীর গুলি।

মানিক বরাবরই সুকুমারের দলে ছিল। বাউতিদের মাতব্বর নবকুমার তাকে বলিল, তুই বাউতি হইয়া বারুইর দলে গেলি যে? জানিস, আমরা সব ধান বেচার দল?

মানিক বলিল, আমি হইলাম সুকুদার সৈন্য। সেনাপতি যা কবে তার জন্য জান কবুল করব।

ধুত্তোর তোর সেনাপতি।

আমারে যা খুশি কও। সেনাপতিরে কিছু কবানা কিন্তু, নবাই জেঠা।

নবকুমার রাগে গস্ গস্ করিতে লাগিল।

সুকুমারের দলে মানিকের মতন সৈনিক ছিল খুবই কম।

সে ধান চালানের বিরুদ্ধে গান বাঁধিল। তার বিপক্ষে লিখিল শশী। মানিক তাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি শেষটায় চাউল চালানের গান লেখলা?

লেখলাম টাকার জন্য।

জেঠা কিন্তু লেখত না।

তিনি লেখতেন এক ভাঁড় সরাপের জন্য।

মানিক জানে জেঠা মন্তপ ছিল। তার মুখখানা কালো হইয়া গেল।

শম্ভু, অসীম, খোকা মহারাজ ছাড়া দলের একে একে সকলেই চলিয়া যায়। সুকুমার তাতেও দমে না। সে একদিন ছোটরাণীকে বলিল, দেখবেন শেষ পর্যন্ত আমরাই জিতব।

ছোটরাণী বলিল, বোঝলেন কিসে?

বুঝলাম দেশের আবহাওয়া থেকে। এই যে আপনি এসেছেন এটা কত বড় সুলক্ষণ। এর পর দলে দলে মেয়েরা আসবেন।

আর আপনারা পুলিসের লাঠির নিচে তাদেরই আগে ঠেলিয়া দেবেন।

দরকার হলে দেবই ত। আপনাদের সাহস দেখে পুরুষরাও সাহসী হয়ে উঠবে।

ছোটরাণী হাসিয়া বলে, সাহসী হওয়ার জন্যও আপনাদের ভরসা সেই অন্দর মহল?

সুকুমারও এই হাসিতে যোগ দেয়।

মাস দেড়েকের মধ্যে কোটালি থানার ধান চাল সব উজাড় হইয়া গেল। লাভ হইল হারাণের, ভগবতীর আর কিছুটা রামনাথের।

এ চাল পোকায় কাটা সম্ভব, পোকা ধরল ব'লে এই সব বুকনি দিয়া পোকা মাকড়ের বাবুও চাষীদের নিকট হইতে বেশ কিছু শুষিয়া লইল।

দেশী দালালেরাও বাদ পড়িল না। কয়াল অর্থাৎ ওজন কারীর সঙ্গে যোগসাজে চাষীরাও ঠকাইল। যারা বেশী চতুর তারা সরাসরি বন্দোবস্ত করিল হারাণের ও ভগবতীর সঙ্গে। দেশে ঢুকিল চোরা-কারবার, সৃষ্টি হইল কালো বাজারের। লোকে হতাশ হইয়া গাহিল,

বল্ মা তারা—দাঁড়াই কোথা?
দেশের সবাই চোর হইল
কালো বাজার যথা তথা।

ইহাও মানিকের লেখা গান।

গোলাপী প্রায়ই বলে, দে বাবা মানিক, কলকাতায় আর একখানা চিঠি দে।

মানিক বলে, কত আর দেব? অনেকত দিছি।

দে আর একখান্।

বাবার কি একটু গরজ নাই, ভালবাসা নাই? যত গরজ আমাগো?

নিশ্চয় তার কোন বিপদ হইছে, না হইলে খবর ঠিকই দিত।

মানিক বলিল, আচ্ছা, এবার চিঠি দেব, এই শেষ কিন্তু।

কিন্তু সে চিঠি দেওয়ার আগেই হোটেলের মালিকের এক চিঠি আসিল—

শ্রীগোকুল দাসের পরিবার মহাশয়া, আপনার স্বামী শ্রীগোকুল চন্দ্র দাসকে আমি আশ্রয় দিয়াছিলাম। বিনা ভাড়ায় রোয়াকে শুইতে দিতাম। (সেখানে রোদ বৃষ্টি আসে না)। তিনি খাইতেন আমার বিখ্যাত তৃপ্তি হোটেলে। (এখানে ভম্বল যাদুকর আর কুস্তিগির হাবড়া বাবু খান)।

আমি এত উপকার করিলাম আর আপনার স্বামী কিনা এক হপ্তা হোটেলের পয়সা বাকি রাখিয়া দে-চম্পট। এক হপ্তার খাদ্য-মূল্য পাঁচ টাকা দুই আনা মাত্র।

তিনি দেশে আছেন কিনা জানাইবেন। দয়া করিয়া খাদ্যমূল্য

সত্বর পাঠাইবেন। দোহাই আপনার স্বামী-ঋণ রাখিবেন না। ইতি

বশংবদ

ভোলা পাণিগ্রাহী

একমাত্র মালিক ও ম্যানেজার, তৃপ্তি হোটেল।

পুনশ্চ—তিনি দেশে থাকিলে জানাইবেন। গোপন করিবেন না।

হোটেলের দেনা রাখিয়া তার স্বামী আবার উধাও হইয়াছে। খবরটায় গোলাপী ভাঙিয়া পড়ে। ভাবে, কি হইল তার? তবে কি বারিবালার কুহকে পড়িয়া আবার সব ভুলিল?

স্বামীকে সে ভালই জানে। সে লোক ভাল, ছেলেমেয়েকে ভালবাসে, ভালবাসে তাকেও কিন্তু মানুষটার আর একটা দিক আছে। সে তার যৌবন—কালবৈশাখীর মতন প্রচণ্ড যৌবন। একদিন এই ক্ষুধা গোলাপীকে কী তৃপ্তিই না দিত! আর আজ তাহাই তার কাল হইল।

এক একবার মনে হয়, এ তার নিজের পাপের শাস্তি নয় ত?

পাপটা যে কি তা বোঝে না। কিন্তু পাপের কথা মনে হইলেই মনে পড়ে ভীমকে। আজকাল ভীমকে লইয়া মাঝে মাঝে এইরূপ দ্বন্দ্ব বাধে। পরক্ষণেই সে চেষ্টা করে উহা ঝাড়িয়া ফেলার।

তার পরদিনই মানিককে দিয়া সে ভোলা পাণিগ্রাহীর নিকট চিঠি লিখাইয়া দিল,

মাননীয় মহাশয়, আপনার চিঠি পাইলাম। আমার বাবা শ্রীগোকুল চন্দ্র দাস মহাশয় বাড়ি নাই। বাড়ি আসেন নাই। তিনি এখানে থাকিলে আমরা তার ঠিকানার জন্য আপনাকে মিছামিছি বিরক্ত করিতাম না। আমরা সেরূপ নহি।

বাবার দেনা আমি দিব জানিবেন। তবে কিছুটা দেরি হইতে পারে। বাবার সঙ্গে দেখা হইলে কিংবা তাহার ঠিকানা জানিতে পারিলে

দয়া করিয়া জানাইবেন। ভবিষ্যতে চিঠি দিতে হইলে আমার নামে দিবেন।

মানিক দাস, জনকল্যাণ, গৌরীগ্রাম এই ঠিকানায়।

দুই একদিন পরেই গোলাপী বারিবালার বাড়িতে গেল। উভয়ে সমবয়সী, তাদের এক সময়ে ভাব ছিল খুব। গোকুলকে কেন্দ্র করিয়া একটু ঈর্ষাও ছিল। সেই ঈর্ষা পরস্পরের সম্পর্ককে হয়ত বা মধুর করিয়া তুলিত।

বারিবালার নতুন জীবন শুরু হওয়ার পর গোলাপী যাতায়াত কমাইয়া দেয়। ইলিশ মাছের জন্য নুন ধার আনার পর হইতে আর একটি বারও যায় নাই। তাদের পাওনা তেল ও নুন মানিককে দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে।

বারির মা সরলা বলিল, কিরে গোলাপ বৌ, কি মনে করিয়া ?:

গোলাপী বলিল, আইলাম দেখা করতে। ভাগনীর চিঠি পত্তর পাও ?

তা পাই। কেন রে ?

গোলাপী ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, বারিরে লেইখ্যা দেও তোমার ভাইর খোঁজ লইতে। সে কলকাতায় আছে অথচ চারমাস চিঠি দেয় না।

সে ত তার অভ্যাস।

সরলার এই টিপ্পনী গোলাপীকে পীড়া দেয়। উহা লক্ষ্য করিয়া সরলা আনন্দ বোধ করে। একটু পরে বলে, দেব লেইখ্যা। মামা ভাগ্নীতে কত ভালবাসা ছিল। বারি খোঁজ করবেই। তার বাবু না পারে এমন কাজ নাই।

সিধু ঘরের এক কোণে বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে দ্বিতীয়া স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করিতেছিল। ঘরের ভিতর হইতে সে বলিয়া উঠিল,

শহরে রূপচাঁদ মিস্ত্রিরের মান্য মানত কত। কত হাজার টিকি বাঁধা তানার কাছে। লড়াইতে কারবারে যা ফলাও করছে। লাট সাহেবও চোঙা দিয়া ডাইকা কয়, ও মিস্ত্রির মশায়, হলো। ও হলো। সাবধান আপনার চাউলের গুদামে পুলিস যাইতেছে। সাবধান। বে-আইনি মাল থাকলে সরাইয়া ফেলো, হলো।

সরলা বলিল, তুই থাম্ বোকাডা। তার পর গোলাপীকে বলিল, তুমি যাও ভাই। আমি বারিরে পত্তর দেব গোকলার খোঁজ করতে।

এরপর গোলাপীকে সিধুর বাড়িতে ঘোরাঘুরি করিতে হইল অনেক দিন। সে জিজ্ঞাসা করিলেই সরলা বলে, লেখছি ত কিন্তু জবাব পাই নাই। বারি খোঁজ করতেছে ঠিকই তবে তার কাজ অনেক। রূপচাঁদ মিস্ত্রিরের সংসার সামলানো ত দুটি খানি কথা না।

কিছুদিন পরে সিধু কলিকাতায় রওনা হইয়া গেল। সে যাওয়ার সময় গোলাপী খাল ঘাটে তার নৌকা পর্যন্ত আগাইয়া আসিয়া বলিল, মামার খোঁজ নিও কিন্তু।

সিধু কহিল, নিচ্চয় নেব। এক ডোবার দুই পারে বাস্তব্য করি, রক্তের সম্পর্কও ত আছে।

সে কলিকাতা হইতে ফিরিলে গোলাপী যাইয়া ধরিল, কি রে মামার খোঁজ করতে পারছ?

সিধু বলিল, খোঁজ প্রায় হইছিল এই সময় দিদির বাবু চাউল আনতে বিলাত চলিয়া গেল। লাল-মুখা সিপাইরা খাবে, তারগো বিলাতী খানা দিতে হবে ত।

গোলাপী বুঝিল, সিধুর এই খানার গাদায় আর সবই চাপা পড়িয়াছে। মনে হইল, এদের নিকট সাহায্য চাহিতে আসিয়া কোন লাভই হয় নাই। শুধু নিজের দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র।

পঁচিশ

ছোটরাণী আসার সঙ্গে সঙ্গেই উলকি পিসি নিজেকে গুটাইয়া নেয়। সব-সময় ছোঁয়াছুয়ি, বাছ বিচার, এই বুঝি খাবার নষ্ট হইল, জল নষ্ট হইল।

সময় মত খাওয়া হয় না। এক একদিন উপবাসীও থাকে। অনিয়ম শুধু খাওয়ার নয়, ঘুমেরও। ঘুম প্রায় বন্ধ। গোলাপী বলে, এ রকম করলে বাঁচবা কতদিন? ঠিক মতন খাওয়া দাওয়া কর, ঘুমও হবে।

পিসি বলে, খাব কি? ঘেন্নায় আমার কিছু তলই হয় না।

প্রায়ই বৃদ্ধার মাথা ঘোরে। মনে হয় পায়ের তলা হইতে শক্ত মাটি যেন সরিয়া যাইতেছে।

পাশের সমাজ-পতি বাড়ির একটি ছেলে একদিন বলিল, গোকুলের ঘরে থাকতে তোমার বাধল না, যত দোষ করল মণিরামের ছোট বউ?

পিসি বলিল, গোকুলের কি ঘাট হইছে?

কেন, বরিশালে—

ওঃ, এই বুদ্ধি নিয়া তোমরা নেকাপড়া শেখো? পোড়া কপাল। গোকুল ঘরে থাকলেও কোন দোষ হইত না। পুরুষ হইল শালগ্রাম, চোনা দিয়া সেনান করাইলেই পবিত্র হইয়া যায়।

পুরুষকে তোমরাই ত বাড়িয়েছ পিসি। তাই তারা অত্যাচার করতে সাহস পায়।

বাড়াবার আমরা কেডা? বাড়াইছে ভগবান ছিরিকেষ্ট। পুরুষরা বটগাছ আর মাইয়ারা লতা। লতা গাছ জড়াইয়া ওঠে, তাতেই তার ছিরি ছাঁদ।

বৃদ্ধা বড়দের নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে দূরে সরিয়া যায়। মেশে কুমির সঙ্গেই বেশী। তার কাছে বিগত আশি বৎসরের গল্প করে। বাইচের নৌকার গল্প, নড়াইলের বাবুদের সঙ্গে নীলধ্বজের লড়াইয়ের গল্প।

আরও বলে, দেশে চিনি ছিল না, দেশলাই ও আলু ছিল না। লোকে চকমকি ঘষিয়া আগুন জ্বালিত। বামুন বৈদ্যের বিধবারা কাগজে করিয়া আনা জিনিস খাইতেন না।

পিসি সবচেয়ে বেশী বলিত, সর্ব সেনের ঠাকুরমার সতী হওয়ার কাহিনী।

কুমি জিজ্ঞাসা করে, ও সতী কি পিসি?

মনে নাই? সেদিনও ত কইছি। সতীরা সোয়ামীর লগে চিতায় ঝাঁপাইয়া পড়ে।

মা-ও পড়বে? শরীর জ্বলিয়া যাবে না?

মা পড়বে না। পোড়া পুলিস সতী হওয়া বন্ধ করিয়া দিছে।

কুমি আবার প্রশ্ন করে, সতীর শরীর জ্বালা করে না?

না, তারগো কোন ক্লেশ হয় না। তারা যে সতী।

কুমি চোখ বড় বড় করিয়া কহিল, আমিও সতী হব পিসি? একটু পরে আবার প্রশ্ন করিল, সতী দেখছ?

পোড়া কপাল! আমি দেখব সতী?

ওঃ, তুমি দেখ নাই?

দেখি নাই। শুনছি। কইছে সর্বর মা।

কুমিও বুড়ীর কাছে গল্প করিত। তার বউ—পুতুলের বাপের বাড়িতে কালী-মন্দির আছে। সেখানে কত ভোগ পড়ে, কত পাঁঠা।

এইভাবে দু'জনে একটা স্বতন্ত্র জগৎ গড়িয়া তুলিল।

ছোটরাণী বলিল, পিসির দেখবা আয়ু বাড়বে। ছোটর সঙ্গে খেললে বুড়াদের মন কচিও হয়, তাজা হয়।

মানিকও মধ্যে মধ্যে পিসিদের গল্পে যোগ দিত। সে করিত মুকুর কাছে শোনা দেশ-বিদেশের গল্প। একদিন বলিল, তুমি কোন্ কোন্ দেশ দেখছ, পিসি?

পিসি বলিল, দেশ! ঘাঘরের গাঙের ওপার যাই নাই। আমরা হইলাম গাছের মতন, শিকড় গজাইয়া যেখানে উঠছি সেইখানেই একদিন কাত হইয়া পড়িয়া থাকব।

মানিকের জ্যাঠাই মায়েরা তাদের ঘরে চলিয়া গেলে গোলাপী পিসিকে বলিল, এইবার নিয়ম মত খাও দাও।

পিসি বলিল, হ খাব।

নিয়মিত খাইলও দু' চারদিন কিন্তু রক্তাল্পতার জন্য তার তীব্র অরুচি জন্মিয়াছিল। কোন জিনিসেই স্বাদ পায় না। কখনও সব তেতো লাগে, কখনও মিঠা। আগ্রহ শুধু দুইটি জিনিসে। তেঁতুলের কাঁচা অম্বল ও মাছের তেলের বড়া।

তেঁতুল গোলা জলে লেবুপাতা কচলাইয়া কাঁচা অম্বল তৈরি হয়, যেমন সুঘ্রাণ, তেমনি সুস্বাদু। গোলাপী বৃদ্ধাকে কাঁচা অম্বল করিয়া দেয়। সে আশীর্বাদ করে, তোর সিঁথায় সিঁদুর অক্ষে হউক। তুই সতী, দেখবি তোর পুণ্যের জোরে গোকলা ফিরিয়া আসবে। একটু পরে আবার বলিল, আমারে তুই তেলের বড়া দিবি কবে?

রতন কবিরাজ যে মানা করছে, পিসি।

ও কিছু জানে না।

মনে নাই, দু বছর আগে তোমার কবিরাজ ছাওয়ালও কইছিল যে, তেলের বড়া তোমার সহ্য হবে না, মা।

তা তা—সেও কিছু জানত না—বলিয়া পিসি কাঁদিয়া ফেলে। তেলের বড়া, তেলের বড়া, বলিয়া ছেলে মানুষের মতন বায়নাক্কা ধরে।

শেষটায় একদিন গোলাপী মাছের তেল ভাজিয়া দেয়। খাইয়া

বৈকালেই পিসির পেট কামড়ানো শুরু হয়। কুমি ছাড়া কেহ ঘরে ছিল না। ছোট রাণীও জনকল্যাণে সেলাই শিখিতে গিয়াছিল। পিসি কুমিকে বলিল, আমার পেটের উপর জল-ভরা একটা ঘটি চাপাইয়া দে দেখি।

কুমি ঘটি চাপাইয়া দেয়।

পিসি একটু আরাম বোধ করিয়া বলে, দে, আর একটা ঘটি দে।

বেদনা আবার বাড়িল। গোলাপী বাড়ি ফিরিয়া দেখিল বৃদ্ধা কাতরাইতেছে। তার পেটের উপর দুইটি ঘটি বসানো। সে কাতরায় আর সতীদের নাম জপে,

গৌরী সতী, সীতা সতী
সতী মা বেউলা।

গোলাপীকে দেখিয়া বলিল, উঃ উঃ পেটে বড় জ্বালা গোলাপ, বড় জ্বালা।

গোলাপী বলিল, একটু সহ্য কর। মানিক আইলেই রতন কবিরাজের বাড়ি পাঠাব।

এবার আর বৈদ্যের কর্ম না। পেটের মধ্যে যেন জাঁতায় করিয়া ডাইল ভাঙতেছে।

সন্ধ্যার পর মানিক আসিলে গোলাপী বলিল, ছোটমার লণ্ঠনটা নিয়া রতন কবিরাজের বাড়ি যা। তানারে লইয়া আসবি। আসার সময় হাটের থা একটু কেরাসিন তেল আনিস্।

হাটে বাজারে কেরাসিন নাই। শীগ্‌গির পাবাও না।

কেন কেরাসিনও লড়াইতে গেছে নাকি? সেদিন শোনলাম মরিচের দাম চড়ছে, সরকার সৈন্যগো জন্য মরিচ সব কিনিয়া নিছে।

মানিক বলিল, আমাগো মতন সৈন্যদেরও ত সব চাই। তার গো বিদা আবার রাক্ষসীয়া।

সে চলিয়া গেল। পিসি গোলাপীকে বলিল, মিছামিছি পাঠাইলি। আমি আর সারব না। আমার বেতের ঝাঁপিতে পুরানো দু'খানা কাপুড় আছে, শীতল পণ্ডিতের বউরে দিস্।

কেন?

তার দরকার। ভদ্দর লোকগো কষ্ট আরও বেশী। তানরা লজ্জায় ঘরের বাইর হইতে পারে না, মুখ ফুটিয়া কইতেও পারে না। দেমাক আছে ত, আমি বামুন, আমি কাহেস্ত।

দু'তিন দিন আগের কথা। পিসি শীতল পণ্ডিতের উঠানের উপর দিয়া ফিরিতেছিল। শীতলের স্ত্রী তাকে দেখিয়াই ঘরের মধ্যে ছুটিয়া পালায়। তার পরনে শতছিন্ন এমন কাপড় যাহা পরিয়া কোন নারী নারীর সামনেও বাহির হইতে পারে না।

শীতলের স্ত্রী সন্তানহীনা, বাড়িতে অন্য কোন লোক নাই। পিসি একটুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, ও ঠাকুরের বৌ, আমি পুরান কাপুড় পাঠাইয়া দেব, পরিও।

ঘরের বেড়ার আড়াল হইতেই শীতলের স্ত্রী বলিল, দিও, দিও। ছাত্ররা মাইনা দেয় না, সরকারী টাকা আসে না আজ আট মাস।

পিসি বলিল, শীতলরে পাঠশাল ছাড়িয়া দিতে কবা। তার থা বরং নন্দীগো লগে গিয়া দুইটা পয়সা আনুক।

তা উনি করবে না। উনি কয়, বিদ্যাদানের মতন জিনিস কি আর আছে?

করুক যার যা ইচ্ছা। নেকাপড়া কাজটা ভাল, কিন্তু বউর কোমরেও ত নেতা দিতে পারা চাই।

পিসি সেইদিনই তার কবিরাজ ছেলের বাড়ি যাইয়া পুরানো দু'খানা কাপড় চাহিয়া আনে। নরুন পাড় ধুতি। তার ইচ্ছা ছিল নিজেই

কাপড় দু খানি দিয়া শীতলের স্ত্রীকে বলিয়া আসিবে, এ কাপুড় তুমি পরিও, ঠাকুররে পরতে দিও না। সে যেন তালপাতা পরে।

মানিক প্রতিবেশী রহমকে লইয়া রতন কবিরাজকে ডাকিতে গিয়াছিল। পথ অনেকটা, তাই ফিরিতে দেরি হইল। তারা যখন কবিরাজ লইয়া ফিরিল, পিসির গলা দিয়া তখন ঘড় ঘড় শব্দ হইতেছে। কবিরাজ নাড়ী পাইলেন না।

পিসি এক একবার নিজের চোখের কাছে বাঁ হাত তুলিয়া ধরে, মনে হয় কি যেন খুঁজিতেছে।

কবিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, উনি হাতে কি খুঁজছেন?

গোলাপী বলিল, বোধ হয় উলকি।

কোন ঠাকুর দেবতার মূর্তি বুঝি?

না ওনার নিজের আর সোয়ামীর।

বেশ, হাতখানা একটু তুলে ধর।

গোলাপী হাত তুলিয়া ধরিলে পিসি বলিল, সব আঁধার হইয়া গেছে, একাকার। কই, কইরে?

তার পরই কহিল, হ পাইছি। দেখছি গোঁফ চুমরানো।—

গোলাপী পিসির কানের কাছে মুখ নিয়া বলিতে লাগিল, সীতা সাবিত্রী সতী বেউলা।

মানিক জোরে জোরে আওড়াইতে লাগিল, গৌরী সতী, সীতা সতী।

কুমিও দেখাদেখি বলিল, সতী, সতী।

পিসি একটু হাসিল, সতীর নাম শুনিতে শুনিতে সেই ক্ষীণ হাসি ওষ্ঠ প্রান্তে মিলাইয়া গেল। পড়িয়া রহিল দেহ-খানা। মহাকাল সমুদ্রের বুকে হালবিহীন আর একখানি ভেলা ভাসিল।

গৌরীগ্রাম শব সৎকার করিল সাড়ম্বরে। জড়ো হইল ছেলেবুড়ো

সবাই। মানিক মুখাগ্নি করিল, আকালী নরেন ভীম শবে জ্বলন্ত পাট কাঠি ছোঁয়াইল। ঘন ঘন হরি ধ্বনিতে আকাশ যেন চিরিয়া গেল।

প্রভাতে চিতা ধোয়ানো। কলসী কলসী জল আসে। অন্য জাতির লোক বলিয়া যারা সতীর দেহ আগুন দিয়া স্পর্শ করে নাই, তারাও ঘড়া ঘড়া জল ঢালিল। জল দিল সুকুমার।

গোলাপীর কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। বুড়ী তাদের কোন আত্মীয় নয়, অথচ ছিল কত আপন। শুধু তার নয়, আপন ছিল সকলের। আশি বছর ধরিয়া পরের উপকার করিয়া চলিয়া গেল। বৃদ্ধার পাথেয় ছিল শুধু স্বামীর প্রতি প্রেম ও ভক্তি।

দুপুর হেলিয়া গিয়াছে। বাড়িটা নিঝুম নিস্তব্ধ। সমস্ত রাত্রির ক্লান্তির পর গোলাপীও কাজে যায় নাই। ঘরে ঘুমাইতেছে।

বাড়ির নিচেই খাল পারে পিসির চিতা। পাশ দিয়া ঝির ঝির করিয়া খাল বহিয়া যায়—জলের বুকে কলার খোলা, কচুরি পানা, কাঠখড় আর কত কি।

উপরেই হিজল গাছ, চিতায় কতগুলি হিজল ফুল ছড়ানো, তাছাড়া দু'চার খানা আধপোড়া কাঠ কয়লা ও ভাঙা পাট কাঠি।

কুমি ধীরে ধীরে চিতার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়। একটু ক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ডাকে, পিসি, অ পিসি।

পিসি সাড়া দেয় না।

কুমি একটু পরে কাপড়ের তলা হইতে মাটির একটি পুতুল বাহির করিয়া চিতার উপর রাখিয়া বলে, অর লগে খেলিও, পিসি। খেলিও কিন্তু। অর নাম সাবি—সাবিত্রী। ও একজন সতী।

যাওয়ার সময় পুতুলটাকেও বলিয়া গেল, খেলিস কিন্তু—

ছাব্বিশ

গোকুল কোন কাজ যোগাড় করিতে পারিল না। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ায় আর লোকের কাছে শোনে, এখানে কিছু হবে না, কাজ খালি নেই, উধার দেখো।

হাতে সামান্য যাহা ছিল তাহাও প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। এক একবার ভয় হয় এরপর কিভাবে চলিবে। তবে কি কুকুর বিড়ালের মতন পথের পাশে··?

না, না। সে ঐভাবে মরিবে না। দোকানের খাবার কাড়িয়া খাইবে, কাপড় লুঠ করিবে।

ভাবে আর বাহুর গুলি টিপিয়া টিপিয়া দেখে, নিজের অজ্ঞাতে হয়ত শক্তি পরখ করিয়া লয়।

ঘুরিতে ঘুরিতে এক একবার শহর ছাড়াইয়া যায়। বেশ লাগে শহরতলীর শ্যাম স্নিগ্ধ রূপ, আকাশের বুকে নীল ও সবুজের ছোঁয়া-ছুঁয়ি। বড় বড় গাছের সবুজ পাতা আকাশে দোল খায়—মনে হয় নীলে সবুজে ইশারায় কত কথাই না হইতেছে।

দু'ধারে গাছের ছায়া পিচের রাস্তাকে আরো কালো করিয়া তুলিয়াছে। দূর হইতে লম্বা কালো গালিচার মতন দেখায়।

এই রকম একটা রাস্তা দিয়া পিঁপড়ার সারির মতন মোটর গাড়ীর সারি চলে, কত রকমের গাড়ী, কত বিচিত্র আকার।

এগুলিতে সৈন্য যায়, যায় লড়াইর মাল মশলা। সৈন্য নানাজাতির, নানাবর্ণের, সাদা কালো তামাটে পীত। এক একদল দেখিতে দানবের মতন লম্বা চওড়া, কোন দল বা বেঁটে। গোকুল ভাবে এরা কারা, কোন্ দেশের লোক? এদেরও কি নৌকা ও সাইকেল কাড়িয়া লইয়াছে, এরা কি এখানে জড় হইয়াছে ক্ষুধার তাগিদে?

যুদ্ধ মানুষকে ঘর ছাড়া করে, আনে দুর্ভিক্ষ, চলে মরণের মিছিল। শুধু সৈন্যেরা নয়—চাষী মজুর শিশু বৃদ্ধ নারী না খাইয়া মরে। বোমার ঘায়ে গ্রাম নগর ঘর বাড়ি পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়। গোকুল যুদ্ধের দেবতাদের উদ্দেশে বলে, তোমাগো কি ছাওয়াল মাইয়াও নাই যে এই রকম করিয়া মানুষ মারো? কখনও বা অভিশাপ দেয়।

হোটেলওয়ালা একদিন বলিল, আমি নাচার গোকুলবাবু। একদিন দু'দিন করে আজ ছ'দিন হয়ে গেল, আপনি পয়সা দেন নি। কাল হপ্তা পুরবে।

গোকুল বলিল, তা ঠিকই কর্তা। আমি আর খাব না। এই রোয়াকে রাত্তিরে একটু থাকতে পারব ত?

তা পারবেন বৈকি? আপনাকে ছাড়ছেই বা কে? আমার পাওনাটা উশুল করতে হবে ত।

সে ভয় নাই। গোকুল মাঝি কাউরে ঠকাবে না। তেমন বাপ মা—

সে কী মশাই! মাঝি? মাঝি-টাঝি আর মুখে আনবেন না। পাঁচটা বামুন-কায়েত খায়। ভাগ্যিস্ কেউ কাছে নেই।

গোকুল সেদিন সকাল হইতেই ঘুরিতেছিল। বেলা সাড়ে এগারটার সময় শ্যামবাজারের মোড়ে পৌঁছিয়াছে এমন সময় হঠাৎ সাইরেন বাজিয়া উঠিল।

বিকট শব্দ। সে আগেও শুনিয়াছে, কিন্তু আজকের এই গর্জনে তার বুক কাঁপে, কানের পর্দা যেন ছিঁড়িয়া যায়। ছুটিয়া ধাক্কাধাক্কি করিয়া সেও আর পাঁচজনের সঙ্গে এক আশ্রয়স্থলে যাইয়া ঢুকিল।

দেয়ালের বাহিরে এক চায়ের দোকানের সামনে একটা বিড়ালী সদ্য চোখ ফোটা চার পাঁচটা ছানা লইয়া খেলা করিতেছিল। সাইরেনের শব্দে ছানাগুলিকে তাড়া করিয়া সে দোকানের ভিতর লইয়া গেল।

এ আর পির আশ্রয়স্থলে অর্থাৎ লম্বা একটা দেওয়ালের আড়ালে জড়ো হইয়াছে শ'দেড়েক মানুষ, কালো রোগা মেছোনির পাশে হলদে পাগড়ি পরা মারোয়াড়ী, ছিন্নবস্ত্র মুটের পাশে আদ্দির পাঞ্জাবী পরা ফুটফুটে বাবু। মুসলমানের দাড়ি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের টিকিতে ছোঁয়া-ছুঁয়ি হইয়াছে। একজন বিড় বিড করিয়া ইষ্ট দেবীর নাম জপিতেছে।

বাহিরে খানিকটা আকাশ দেখা যায়— নীল ঐ মহাসমুদ্র রৌদ্রে পুড়িয়া ধূসর হইয়া গিয়াছে—যেন বিশাল ফাঁকা এক মরুভূমি।

একজন বলিল, এদের কি একখানা প্লেনও নেই যে জাপানীদের তাড়া করতে পারে?

আর একজন বলিল, বিমান মারা কামানই বা কোথায়?

ফুটফুটে বাবুটি বলিল, ইঁদুরের গর্ত খুঁজুন মশাই। দেখবেন সাফল্যের সহিত পশ্চাদপসরণ করে কামান আর তার মালিক সবাই সেখানে লুকিয়েছে।

শ্রোতারা কল কল শব্দে হাসিয়া উঠিল। তাদের হাসি ও আলোচনার মধ্যে প্রকাশ পাইল শাসক শক্তির উপর শাসিতের আক্রোশ, অত্যাচারীর উপর অত্যাচারিতের তীব্র বিদ্বেষ, অত্যাচারীর লাঞ্ছনায় শক্তিহীন নিপীড়িতের ক্লীব আনন্দ।

গোকুল সব কথায় কান দেয় না। তার খালি মনে পড়ে বিড়ালীর সন্তান স্নেহের দৃশ্য। পশুর ঐ দরদ তার মনকে দরদে ভরাইয়া দেয়। মনে পড়ে কুমিকে, মানিককে, গোলাপীকে। নিজের জীবনের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়া ওঠে।

খানিকক্ষণ পরে সাইরেন আবার আওয়াজ করে—মুক্তির সঙ্কেত। মানুষগুলি আশ্রয়স্থল হইতে বাহিরে আসিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে।

গোকুলের কানে যায়, বোমা পড়ছে খিদিরপুরে। আর একজন বলে, না হে না। পড়েছে কালীঘাটে, তবে মন্দিরের কোন ক্ষতি হয়নি।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতটি বলিল, কালী যে জাগ্রৎ দেবতা।

গোকুলের চাকরি যোগাড় হইল না। অনাহারে দুশ্চিন্তায় তার চেহারা এমন হইয়া গেল যে লোকে তাকে দরজায় দেখিলেই বলে, এখানে কেন? লঙর খানায় যাও।

ধীরে ধীরে সবই গা-সহা হইয়া গিয়াছে। এমনটিই বুঝি হয়, মানুষ এমনি করিয়াই নামে।

জেলে শুনিত যুদ্ধের দৌলতে কলিকাতায় চাকরি সুলভ হইয়াছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা হইল অন্যরূপ। চাকরি ত দূরের কথা, মিষ্টি ব্যবহার ভদ্রতা এমন কি একটু হাসি পর্যন্ত সমাজ হইতে যেন বিদায় লইয়াছে। অবস্থা এইরূপ জানিলে জেল হইতে সরাসরি সে দেশে চলিয়া যাইত।

গ্রীষ্মের দুপুর। সূর্য মাথার উপর আগুনের হলকা ঢালিয়া দেয়। গা চিড় বিড় করে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া আসে।

আজ দু'দিন গোকুলের পেটে একটা যন্ত্রণা শুরু হইয়াছে। হোটেল-ওয়ালা ভোলা ঠাকুর বলে, উপোসের ফল। জিজ্ঞেস কর ঐ ভিখিরিদের, সব শালার ওরকম হয়।

ঘুরিতে ঘুরিতে গোকুল একটা খাবারের দোকানের সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। থরে থরে সাজানো খাবার, একটা বাসনে লুচি না যেন একরাশ পদ্মফুল। কারিগর শিঙাড়া ভাজে, কড়াইর ভিতর হইতে ঝাঁজরা হাতায় করিয়া এক একবার বিশ পঁচিশখানা চুবড়িতে রাখে। শিঙাড়া হইতে ধোঁয়া ওঠে। চুবড়ির তলা দিয়া টুপ টুপ করিয়া ঘি পড়ে একটা কেনেস্তারার ভিতর।

ভিতরের দিকে এক প্রৌঢ় সন্দেশ পাকায়।

খাবারের গন্ধে ও বাষ্পে গোকুলের মুখ লালায় ভরিয়া যায়। এক একবার খাবারের দিকে তাকায় আবার তাকায় রাস্তার দিকে। দু'-দিকের ফুট পাথেই সর্বহারার ভীড়, কেহ বসিয়া আছে, কেহ ধূলায় গড়া-

পড়ি যাইতেছে। সন্তান কোলে একটি নারী চাহিয়া আছে ধূমায়মান শিঙাড়াগুলির দিকে।

গোকুল দোকানের সামনে যাইয়া জিজ্ঞসা করিল, এখানে মালিক কেডা ?

যে লোকটি সন্দেশ পাকাইতেছিল সে বলিল, কি দরকার ?

গোকুল বলিল, আমারে কিছু খাইতে দেন।

শিঙাড়ার কারিগর বলিল, ভাগো, ভাগো।

গোকুল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। ভিতরে সমানে শিঙাড়া ও সন্দেশ তৈরি চলে। গোকুল আবার বলে, আমি কিছু খাইতে চাইছিলাম, কর্তা।

দোকানের মালিক ক্যাশ বাক্সে হেলান দিয়া দাঁত খুঁটিতেছিল। সে দাঁত মুখ খিঁচাইয়া উঠিল, ভাবী বড় কুটুম এয়েছেন, ওকে খেতে দাও। যা, বেটা যা। ভাগাড় দেখতে পাস না ?

গোকুলের চোখ দু'টা জ্বলিয়া উঠিল—যেমন উঠিয়াছিল রাজপথে সরকারী ডাক বাক্স ভাঙার সময়।

দাঁড়াইয়া মরতে পারব না, এই আমি নিলাম কিন্তু—বলিয়া গোকুল এক সঙ্গে পাঁচ ছয় খানি লুচি তুলিয়া মুখে পুরিল।

উনানের উপর বিশাল এক কড়াইয়ে মণ খানেক দুধ জ্বাল হইতেছে। রাবড়ি হইবে। একটি কারিগর কড়াইয়ের গায়ে টানিয়া টানিয়া দুধের সর রাখে আর এক হাত দিয়া ঘামাচি মারে। লোকটা সরু এক লোহার শিক লইয়া গোকুলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। গোকুল এক হাত দিয়া তাকে রুখিল আর হাতে শিঙাড়ার চুবড়ি তুলিয়া সবহারাদের ডাকিল, নেরে ভাইরা, নিয়া যা। মনের সাধে খা।

এক দিকে ভীতি আর এক দিকে ক্ষুধার তাড়না। ভিখারীরা ইতস্তত: করে, এদিক ওদিক তাকায়। শেষ পর্যন্ত জয় হয় ক্ষুধার।

কিন্তু তারা মানুষের মতন আগাইয়া আসে না। আসে যেন হামাগুড়ি দিয়া। খাবারের জন্য কাড়াকাড়ি কামড়াকামড়ি করে। আবার দু তিনটা শিঙাড়া পাইলেই পিছাইয়া যায়।

দোকানীরা অবাক হইয়া দেখিতেছিল। বিস্ময়ের প্রথম আবেগ কাটিয়া গেলে মালিক চীৎকার করিয়া উঠিল, চোর, চোর।

কলিকাতার রাজপথে এই শব্দটির এক অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। শুনিলেই চার ধার হইতে মার্ মার্ শব্দে যুবা বৃদ্ধ তরুণ ছুটিয়া আসে। এক হতভাগ্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে হাজারো মানুষ। মনে হয় যেন কতগুলি হিংস্র জানোয়ার এতক্ষণ খাঁচায় পোরা ছিল। মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে রক্তের আস্বাদের জন্য খেপিয়া উঠিয়াছে।

গোকুল যত বলে, আমি চোর না, খিদা পাইছিল তাই খাইছি, আমি চোর না—জনতা ততই ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে। গালি দেয়, ইট পাথর ছুঁড়িয়া মারে।

গোকুল সমানে হাতের শিক চালায়, ভিখারীদের উদ্দেশে বলে, আমার পাশে আসিয়া দাঁড়া, একদিন অন্ততঃ পেট পুরিয়া খা।

সমবেত জনতার চেয়ে ভিখারীরা সংখ্যায় বেশী কিন্তু তারা যে কঙ্কালসার, সাহস মনুষ্যত্ব কিছুই নাই। জোয়ান যে দু'চারজন ছিল তারাও আগাইয়া আসে না। দাঁড়াইয়া নীরবে সব দেখে। কেহবা মুচকি হাসে।

গোকুল বলে, মর হারামজাদারা। না খাইয়া মরাই তোর গো উচিত।

তার সকল দেহ ক্ষত বিক্ষত, কপাল দিয়া রক্ত গড়াইয়া পড়ে, আঙুল একটি ভাঙিয়া গিয়াছে, ঠোঁট ফুলা, মুখের উপর কালো কালো দাগ কিন্তু সে লড়ে বীরের মতন—নীলধ্বজের বংশধরের মতন।

হঠাৎ একখানা ইট আসিয়া পড়িল কানের উপর। সঙ্গে সঙ্গে গোকুল মাটিতে পড়িয়া গেল।

গলায় সোনার মফ্ চেইন ঝুলানো ভুঁড়িওয়ালা একটা লোক এতক্ষণ পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল। সে ছুটিয়া আসিয়া গোকুলের নাকে মুখে কয়েকটা লাথি মারিল, তারপর তার দেহের উপর দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

খুন হ'য়ে যাবে যে বেনারসী বাবু। নাবো, নাবো—বলিয়া একটি লোক বেনারসীর গেঞ্জি ধরিয়া নামাইয়া দেয়।

গোকুলের সংজ্ঞাহীন দেহ পড়িয়া থাকে রাজপথের উপর। ডান কানের ভিতর হইতে রক্ত গড়াইয়া পড়ে।

এই সময় পুলিসের গাড়ী দেখিয়া একজন চীৎকার করিয়া উঠিল পুলিস, পুলিস।

সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তা ফাঁকা হইয়া গেল। সকলের আগে ছুটিল বেনারসী বাবু—তীর বেগে। মনে হয় মানুষটার শরীর যেন পালকে তৈরি।

সাতাশ

অনশনে বাংলার পঞ্চাশ লাখ লোক মরার পর গুজব রটিল শীঘ্র সব জিনিস কণ্ট্রোল হইবে।

কেহ হয়ত প্রশ্ন করে, সে আবার কি?

আর একজন জবাব দেয়, গভরমেণ্ট সস্তায় মাল দেবে। পাবে সব লোক। রাজার মাল ত।

অনেকেই করে সন্দেহ প্রকাশ, উহু, এ সে রাজা পাও নাই।

অল্প দিনের মধ্যেই প্রতিটি ইউনিয়নে কমিটি হয়। চৌকিদারী টেক্স হিসাবে গৃহস্থদের কার্ড হয় তিন রকম, এ, বি, সি।

গৌরীগ্রাম ইউনিয়নে রেশনের দোকান হইল বিধু ঘোষের বাড়িতে। লোকে বলে, দোকানটা হারাণের। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টরা কণ্ট্রোলের দোকান করিতে পারে না। সে তাই শালার নামে দোকান করিয়াছে।

জিনিস পত্র দেয় বিধু। পৃথক্ একখানা কাগজে হিসাব টুকিয়া রাখে, টাকা পয়সা নিজেই হাতে করিয়া নেয়, মাল ওজন করিয়া দেয় দুইটি চাকর—হরিচরণ আর দুঃখীরাম।

হারাণ রোজই একবার দোকানে আসে, কোন কোন দিন আসে দুইবার। ক্রেতাদের দিকে চাহিয়া বলে, আমি ইউ-বির প্রেসিডেণ্ট। পাব্লিক সারভ্যাণ্ট। আমি আসি আপনাদের স্বার্থ রক্ষার জন্ত।

সে দোকানে বসিয়া বিড় বিড় করিয়া মালা জপে কিন্তু জিনিস মাপার সময় তার চোখ থাকে কাঁটার উপর। হিসাবে কিংবা ওজনে ভুল হইতেছে দেখিলেই বলে, শ্রীহরি শ্রীহরি। দোকানের লোক এই শ্রীহরির তাৎপর্য ভালই জানে। শব্দটার অর্থ, আমাদের লোকসান হচ্ছে হে। সাবধান।

হাটবার নয় তাই ক্রেতাদের ভীড় আজ খুব। দু তিন মাইল হইতে কেহ হাঁটা পথে আসিয়াছে, কেহ বা নৌকায়। বিধু দূরের লোককে আগে মাল দেয়, সব শেষে পায় তার নিকট প্রতিবেশীরা। সেদিন শীতল পণ্ডিত বলিল, আমার মালটা তাড়াতাড়ি দাও, বিধু। গিয়ে বিস্তে দান করতে হবে। পাঠশালে সবাই অপেক্ষা করছে।

বিধু শীতলের ছাত্র। সে বলিল, একটু বসুন পণ্ডিত মশাই। দূরের ওদের না দিয়ে আগে আপনাকে মাল দিলে অন্যায় করা হবে যে। আপনার ছাত্র হয়ে তা কি আমি করতে পারি?

শীতল বোকার মত হাসিতে লাগিল কিন্তু ক্রেতাদের মধ্যে আর একজন বলিয়া উঠিল, পণ্ডিতের পয়সা থাকলে তা পারতা বৈকি।

অল্প দিনের মধ্যেই বিন্নু বেশ পাকা হইয়া উঠিয়াছে। সে একই সময় মালের দামের হিসাব করে, ক্রেতাদের নিকট হইতে পয়সা নেয়, তাদের টাকাব ভাঙানি দেয়। গণ্য মান্য লোক আসিলে তার সঙ্গে হাসিয়া কথা কয় আবার চাকরদের উদ্দেশে যন্ত্রের মত বলিয়া যায়, ভবেশ সেন, সি কার্ড, সরষের তেল ৴২॥ সের, ১৸৵০ হিসাবে ৪৷৷৶০। চিনি—

ভবেশের ছোট ভাই গিরিশ বলিল, গেল বারেব চিনি খুব ভারী ছিল। জল মেশালে যে রকম হয়।

বিন্নু বলিল, কি জান। আমাদের বাড়ির মেয়েরাও বলছিল বটে। কণ্ট্রোলের টিনে আর বস্তায় কি যে ভেজাল থাকে তা বলতে পারে সরকারী রুই কাতলারা। আমরা ত গেঁড়ি গুগলি কেলাশ।

কেষ্ট নামে একটি ছোকরা বলিল, গেঁড়ি গুগলিতে কাদা মাটি আরও ভাল মেশাতে পারে।

বিন্নু রাগে না। পাকা ব্যবসায়ীর মতন মুচকি মুচকি হাসে।

সকাল হইতেই আকাশ মেঘলা ছিল। পশ্চিম আকাশ ক্রমেই কালো হইয়া উঠিতে লাগিল। বেলা বাড়ে, ভীড়ও বাড়ে। বেলা ১০টা আন্দাজ অনুকূলহরি বলিল, জল ঝড় আসতেছে। আমরা সকাল হইতে বসিয়া আছি করতা, দক্ষিণ পাড়ার আমরা।

বিন্নু যেন শুনিতেই পায় না। বলে, নিতাই সেন, সাদা কেরোসিন পাঁচ বোতল, একটাকা ছয় পয়সা। বিষ্টু মালী, চাউল দশসের, সাড়ে চার টাকা।

একটি ছেলে বলিল, বিষ্টুর নামে লবণ লেখেন। আমাগো গাইটা লবণের অভাবে বড় কেলেশ পায়।

এই সময় বগলা ডাক্তারকে দেখিয়া বিল্ব বলিল, আপনার গাইটা কি বিওলো, এঁড়ে না বকনা ?

ডাক্তার বলিল, দুগগা শালীর কথা ছেড়ে দাও। ও আবার বিওবে বকনা।

দুর্গা তার গরুর নাম।

বিল্ব বলিল, ওঃ এঁড়ে ? তা বারোয়ারিতে এবার কোন্ পার্টির যাত্রা দিচ্ছেন, গদাই দা ? নট্ট কোম্পানী না, নাগ দত্ত ?

ঠিক তার পূর্ব মুহূর্তেই বৃদ্ধ গদাধর আসিয়াছে। সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, এবার পয়সা ওঠেনি ভায়া। ভাবছি কবির গান দেব। শশী কবিদারকে বলেছি। সে আর মণিরামের ভাইপো মানিক লড়বে।

মানিকও রেশনে আসিয়াছিল। অনেকের চোখ পড়িল তার উপর। অনুকূল বলিল, একরত্তি ছাওয়াল তুই। তুই করবি কবির লড়াই ?

মানিক সলজ্জ ভাবে বলিল, শশীদা কইছে ত।

দু তিন দিন আগে শশী তাকে বলে, গদাইর পুজায় দু'ভাই এবার লড়তে হবে।

মানিক বলে, কি রকম ?

তুই আমার সঙ্গে লড়বি, আমি দেব চাপান, তুই উতোর। আবার তুই চাপান দিবি, আমি উতোর। কয়দিন ত আমরা করছি।

মানিক বলিল, তুমি ছড়া কাটছ, আমি জবাব দিছি, আমি ছড়া কাটছি তুমি জবাব দিছ ! সেই রকম ?

শশী বলে, হ।

মানিকের আনন্দ হয়, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও করে। বলে, আমি কি পারব শশী দা ?

তা পারবি। দু'তিন দিন তালিম দিতে হবে।

বিষ্টুর বাড়ির ছেলেটি বলিল, আমি বিষ্টুর ভাই সিষ্টু, কালী মালীর ছাওয়াল। আমাগো গরুটার জন্য কিছু লবণ।

পাশেই ছিল আকালী। সে বলিয়া উঠিল, মানষেরই লবণ জোটে না, গরুর কথা ছাড়িয়া দাও।

সিষ্টু বলিল, এ গরু মানষের বাড়া। রোজ চার সের দুধ দেয়। বাবা আমাদের থাও আনন্দীরে পেয়ার করে বেশী।

এস্তাজ বলিল, দীন দুনিয়ার হালই এই, যে গরু যত দুধ দেয় তারে লোকে তত বেশী পেয়ার করে।

হারাণ এতক্ষণ মালা জপিতেছিল। সে বলিয়া উঠিল, শ্রীহরি, শ্রীহরি।

অনুকূলহরি আবার বলিল, দক্ষিণ পাড়ার কি করলেন, ঘোষ মশায়?

বিশ্ব যেন আকাশ হইতে পড়ে, দক্ষিণ পাড়া এখানে কেন?

এস্তাজ বলিল, মালের জন্য। তড়ি ঘড়ি দেও, পানি আসতেছে। রাস্তাও অনেকটা।

বিশ্ব জিজ্ঞাসা করে, তোমার বাড়িও দক্ষিণ পাড়া না?

জি, আমি দেরাজের ছাওয়াল এস্তাজ। এসরাজ মিয়ার নাতি।

তোমরা ত কমিটি করে আলাদা হয়ে গেছ। তোমার দো আনি খানা বদলে দাও, চণ্ডু।

চণ্ডু বলিল, আর ত নাই। কাল দিয়া যাব।

সে হয় না, মাল ভারত সম্রাটের। আমি বাকিতে দেই কি করে? তার চেয়ে দু আনার চাল কম নাও।

চণ্ডু বলিল, এই চাউলে আমাগো মাত্র একবেলা চলবে। দু আনার কম নিলে একজনার উপ্পাসী থাকতে হবে।

হারাণ বলিল, তা না করে সবাই বরং দুটো দুটো কম খেও। ওরে দুঃখী, ওর ধামা থেকে দু আনার চাল নামিয়ে রাখ্। দেখিস্ যেন বেশী রাখিস্ না।

অনুকূলহরি বলিল, আমাগো কুমিটির মাল আসে নাই, কর্তা ?

রেশনের দোকান অল্প দিনের। কিন্তু এর মধ্যেই লোকের অভিযোগ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে। মাল যা আসে লোকে তার সিকিও পায় না। অন্ততঃ তারা এইরূপ সন্দেহ করে। তাদের বিশ্বাস, রেশনের বেশীর ভাগ জিনিসই চোরা বাজারে চলিয়া যায়।

গৌরীগ্রামের দক্ষিণ পাড়ার লোকেরা তাই নূতন ফুড কমিটি করিয়া মহকুমায় মালের জন্য দরখাস্ত দেয়।

দক্ষিণ পাড়ার উপর বিধুর রাগ সেই জন্য। অনুকূলের কথার উত্তরে সে বলিল, তোমাদের মাল আসেনি তার জন্য কি আমি দায়ী? আপনিই বলুন মোদাব্বের সাহেব, আপনি ত দেশের একটা মাথা।

মোদাব্বের এই অঞ্চলের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, খাঁটিলোক বলিয়া সবাই তাঁকে খাতির করে। তিনি বলিলেন, এ সবের কানুন ত আমি জানি না।

অনুকূল বলিল, আমাদের মাল না আসা পর্যন্ত আপনিই দায়ী। আর তা ছাড়া দরখাস্তের আগের জিনিসও অনেক পাওনা আছে। আমাদের হকের পাওনা।

বিধু চড়া গলায় বলিল, বেশ, আইন দেখাতে হলে কাছারিতে যাও।

মোদাব্বের বলিল, ও কথা বলছেন কেন, গরিবরা কি কথায় কথায় কাছারি যেতে পারে? পারলে আপনিও বলতেন না। দেখছি ত আপনাদের হিম্মত।

তার এই স্পষ্টবাদিতায় খুশি হইয়া ক্রেতারা পরস্পরের দিকে তাকায়। কেহ কেহ চায় বিধুর দিকে.

বিধুর মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে কি যেন বলিতে যাইবে এই সময় 'শ্রীহরি' 'শ্রীহরি' বলিয়া হারাণ তাকে থামাইয়া দিল।

খান দুই তিন কার্ডের মাল দিয়াই বিশু মোদাব্বেরকে বলিল, আপনার কার্ড দিন মৌলভী সাহেব। আপনাকে অনেকটা পথ যেতে হবে।

মোদাব্বের তার হাতে কার্ড দিয়া বলিলেন, ওদের কি করবেন? দেখবেন দক্ষিণ পাড়ার অতগুলো লোকের যেন অসুবিধে না হয়।

এবার আসরে নামিল স্বয়ং হারাণ। সে বলিল, কোন ত্রুটি যাতে না হয় সেই জন্য আমি বসে আছি, মৌলভী সাহেব। আমি হলেম আপনাদের দশ জনের চাকর, পাবলিক সারভ্যাণ্ট। শুনলাম দক্ষিণ পাড়ার ওদের মালও দু'একদিনের মধ্যেই আসবে। এবার সদরে রেশনের কর্তা হ'য়ে এসেছে সুনীল বাঁড়ুয্যে। সে হচ্ছে রামনাথের ভাইপো ফুটু ভুঁইয়ার বন্ধু।

রামনাথ অগ্রণী হইয়া গৌরীগ্রামের দক্ষিণ পাড়ার লোকদের দিয়া পৃথক্ রেশনের জন্য দরখাস্ত করায়, স্বাক্ষর সংগ্রহ করে। দোকান হইবে তার ভাই হরনাথের নামে। এর মধ্যেই মালের টাকা তারা সদরে জমা দিয়াছে।

মোদাব্বের বলিলেন, ভাল, ভাল, খোদা তাই করুন। তামাম দীন দুনিয়ার ভাল হোক।

মানিক এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সে বলিল, আমারে একপোয়া সরসার তেল দেন আর আধ বোতল কেরাসিন।

বিশু বলিল, কেরোসিন ত নেই।

মানিক বলিল, আমার বড় ঠেকা। বোনের অসুখ। রাত্তিরে আঁধারে ওষুধ পথ্য দিতে হয়। সরিষার তেল নয় না দিলেন, একটু কেরাসিন দেন।

মোদাব্বের মানিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন্ বাড়ির ছেলে?

আমি গোকুল দাসের ছাওয়াল মানিক। কবিদার মণিরাম আমার জেঠা। আমার বাবার "ভারত ছাড়ো"র জন্ম জেল হইছে।

তুমিও ত কবিদার হয়েছ। চাষীর গান তুমিই বেঁধেছ না?

আজ্ঞা হ।

তোমার বোনের অসুখ?

মানিক মাথা নাড়িয়া জানাইল, হ্যাঁ।

মোদাব্বের বিল্বকে বলিলেন, আমার যে তেলটা দিয়েছেন, আর তেল না থাকলে সেইটে ওকে দিয়ে দিন।

বিল্ব বলিল, আপনার মাল আপনি নিয়ে যান। দোকানে কেরোসিন নাই। তবে আমার ঘর থেকে খানিকটা তেল ওকে দিচ্ছি।

মানিক ভিন্ন দক্ষিণ পাড়ার সকলেরই সেদিন বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইল। তারা আসার সময় হারাণ বরং শুনাইয়া দিল, একতা নাই বলেই বাঙালীর এই হাল হয়েছে। এক গৌরীগাঁয়েই এ পাড়ায় একটা রেশনের দোকান চাই, ও পাড়ায় আর একটা।

বাটীর বাহির হইয়া অনুকূলহরি বলিল, বেটা ভণ্ড আবার হিত কথা শোনায়।

এস্তাজ বলিল, যাক্ মোদাব্বের সাহেব ছিল বলিয়া মানিক শুধু এট্টু ক্রেচ তেল পাইল।

পাইছে কবিদার বলিয়া।

মানিকের মনে পড়িল জেঠার কথা। তুই কবিদার হইস, মানিক। ভদ্দর লোকেরাও খাতির করবে।

ক্রেতারা সব চলিয়া গেলে বিল্ব হারাণকে বলিল, পালদির বণিকরা ঘাটে আজ দু'দিন হ'ল নৌকা নিয়ে বসে আছে।

হারাণ বলিল, জানি। তাদের সঙ্গে দর ঠিক হয়েছে?

হ্যাঁ, তারা আপনার দামেই রাজী।

হারাণ আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, কদিন বাদলা চলছে, নুনটা চেপে রাখতে পারলে সুবিধে হত।

বিশ্ব বলিল, তারাও তাই বলছিল। আমাদের আর মিছে মিছি ধসিয়ে রাখা কেন? বাদলার জন্য বস্তা প্রতি ওজনে যা বাড়বে তার দামটা নয় আগেই ধরে দিচ্ছি। আমাদেরও ত এখানে খাই খরচা আছে।

হারাণ বলিল, শ্রীহরি, শ্রীহরি।

তার এই শ্রীহরির রকম ফের আছে। বিশু তার অর্থ বোঝে। সে সেই দিনই রাত্রে পালদিঁর বণিকদের নৌকায় বস্তায় বস্তায় লবণ তুলিয়া দিল। সিকির বাজারের মোহন শার ছেলের দোকানে দিল পঞ্চাশ টিন কেরোসিন।

হারাণ তাদের মহকুমার নুন্ কেরোসিন ও চিনির একমাত্র ডিলার, মহকুমার সকল ব্যবসায়ীকে মাল খরিদ করিতে হয় তার নিকট। সে ডিলারি নিয়াছে পরাণের নামে।

যাদের পাওয়া উচিত তারা মাল পায় না। হারাণ চড়া দামে বাহিরে মাল ছাড়ে। নিজের মহকুমা ছাড়াইয়া তার এই কারবার আশে পাশের দু'তিন মহকুমাতেও চালু হইয়াছে। সারা অঞ্চলটা জুড়িয়া সৃষ্টি হইয়াছে এক নতুন বাজারের। তারা নাম কালো বাজার।

বিশু বলে, সাবাস্ মাথা বটে আপনার, দাদাবাবু।

হারাণ বলে, শ্রীহরি শ্রীহরি। একি আর আমার মাথায় কুলোত? শিখেছি কলকাতায় রাঘব বোয়ালদের কাছে। তারা আবার সব লাট বেলাটের বন্ধু।

সাধারণতঃ এত খোলাখুলি ভাবে সে কখনও কিছু বলে না। আজ একটু আবেগের মুখে শ্যালককে বলিয়া ফেলিল। পরক্ষণেই নিজেকে কমঠ কবচের মধ্যে গুটাইয়া নিল। এই কমঠ কবচ তার শ্রীহরি।

আটাশ

হাটে বাজারে আকালের সড়কের উপর বড় বড় গাছে হাতে-লেখা পোষ্টার পড়িয়াছে—

গণেশ-জননী পূজার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ

কবির লড়াই।

শশী কবি

বনাম

কিশোর কবি মানিক

(মণিরাম কবিদারের ভাইপো)

গৌরীগ্রাম পূজাপ্রাঙ্গণে দলে দলে সমবেত হৌন।

গদাধর সমাজপতি

পূজা কমিটির অবৈতনিক সম্পাদক

ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য ও

তালুকদার।

পোষ্টার পড়ে তিন দিন আগে। ফুটু ভুঁইয়ার বাড়ি কাজ করিতে যাওয়ার সময় উহা পড়িয়া গোলাপীর চোখ ছল ছল করে। সে মনে মনে বলে, মা আমারে এত দিলা আবার এমন কাঙাল করলা।

বাড়ি ফিরিয়া সে ছোট জাকে খবরটা বলিলে সে কহিল, তোমার ভাসুর কইত ঠিকই। মানিক হবে এই বংশের পিরদিম।

গোলাপী বলিল, আজ ভাই-পোর লগে তানার নামও লেখছে।

লেখবেই ত—ছোটরাণীর কণ্ঠেও গর্ব প্রকাশ পায়।

গোলাপী বলে, তুমি নাকি ভাসুররে ভালবাস না? আজ ত ধরা পড়িয়া গেলা।

তুই বড় বোকা। ভালবাসতে না পারি কিন্তু সোয়ামীর জন্ম অহঙ্কার করতে ছাড়ব কেন ?

আজ কবির লড়াই। মানিক জেঠার কবিতার খাতা মাথায় ছোঁয়ায়, মাকে প্রণাম করে। ছোটরাণীর পদধূলি লইয়া বলে, জেঠার হইয়া আশীর্বাদ কর। আজ যেন হারিয়া না যাই।

ছোটরাণী তার মাথায় হাত রাখিয়া বলে, জিতবি রে পাগলা, জিতবি। একটা কথা মনে রাখিস্। কিছুতেই রাগবি না। লড়াইতে যে একবার রাগল সেই হারল।

বারোয়ারি তলার পূজা মণ্ডপের সামনে মস্ত বড় আসর। যাত্রার চেয়ে লোক জমিয়াছে অনেক বেশী। উকিল নিবারণ চন্দ্র, হেড মাস্টার উমানাথ, হারাণ ও রামনাথরা দুই ভাই, গ্রামের গণ্যমান্য অনেকেই আসিয়াছে। হরনাথ লোকের কাছে গর্ব করিতেছে, মানিক হল আমাদের ভিটে বাড়ির প্রজা।

মানিকের গলায় জেঠার মেডেল। আসরে নামিয়া সে এক অদ্ভুত শক্তি বোধ করে, মনে হয় জেঠা পাশে দাঁড়াইয়া—আর দাঁড়াইয়া উলকি পিসি।

সে একবার ভাবে এখানে পিসি কেন? পরমুহূর্তে নিজে নিজেই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া ফেলে, পিসিও ত আমারে অত ভালবাসত।

প্রথমে হয় সভা বন্দনা। তার পর সখী সংবাদ। শশী প্রথমেই চাপান দেয়—

লড়তে আইছে গুরুর লগে ছাওয়াল বড় সেয়ানা
গলায় দিছে জেঠার পদক বাপের খবর জানে না।

মানিক যেন আকাশ হইতে পড়িল। শশীদার নিকট হইতে এই

ধরনের আক্রমণ সে আশঙ্কা করে নাই। তাই প্রথম তার একটু রাগ হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়িল ছোট মার উপদেশ, রাগলা কি হারলা।

সে উত্তর করিল,

তোমার সঙ্গে আমার লড়াই
গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজার মতন,
আইছি শুধু এই ভরসায়
পাব তোমার স্নেহ, তোমার যতন।

একদল বলিল, বাঃ বাঃ ছোকরা। গদাই নেশায় চুর হইয়াছিল। প্রতি বারোয়ারি পুজার সময়ই সে প্রচুর মদ্য পান করে। তার মতে মদ গণেশ জননী পুজার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। কোন কোন সময় সে ও তার ছোট ভাই মদের পেয়ালা লইয়া দেবীর সামনে আরতি শুরু করিয়া দেয়। গদাই বলিয়া উঠিল, এ কি ছোট লোকের কাজ? বাউতির ছানা ভয় পেয়ে গেছে।

মানিক সঙ্গে সঙ্গে ধরিল,

মায়ের আমি ছোট্ট ছাওয়াল
ছোট করিয়া রাখুন তিনি চরণে,
ভয় কারে কয় তা জানি না
যতদিন মুই আছি তাঁহার শরণে।
তরল নহে মোর ভকতি
এ নৈবেদ্য বুকের রক্তে লাল,
(কবি)* মণিরায়ের ভাই-পো আমি
দেশভক্ত গোকুলের ছাওয়াল।

বাঃ বাঃ বলিয়া গদাই এবার নিজেই ছুটিয়া আসিয়া মানিককে

জড়াইয়া ধরিল। গদ্ গদ্ স্বরে বলিল, আজ বুড়োকে খুব জব্দ করেছিস, মানিক।

মানিক অমনি শুরু করিল,

নন্দের নন্দন হরি
বুকে পদ-চিহ্ন ধরি
বামুনেরে নিজে করে পূজা,
সে বামুনে জব্দ করি
এ-ভরসা নাহি ধরি
দোষ হইলে দিউন তিনি সাজা।

গদাই এবার আবেগের ভরে কাঁদিয়া ফেলিল।

আবার শশী ও মানিকের লড়াই শুরু হয়। চলে চাপান ও উতোর। মানিক তার গুরুর সঙ্গে সমানে লড়ে। শশী কবি-মানুষ, অল্পে তুষ্ট। মানিকের বুদ্ধির প্রখরতায়, চাপান ও উতোরের তীক্ষ্ণতায় প্রীত হইয়া নিজের গলার মালা তাকে পরাইয়া দিয়া গায়—

তোর বংশের এই মাল্য
তুই আজ ফেরত লইয়া যা,
তোর গলায় এ ভাল সাজে
আমার সাজে না।
পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ং
কইছে মহাজনে,
তোর কাছে এই পরাজয়ে
আমি খুশি মনে মনে।

শিষ্যের প্রতিভা ও গুরুর ঔদার্যে দুজনেরই জয় জয়কার পড়িয়া যায়। নিবারণ উকিল মানিককে পাঁচটা টাকা বকশিশ করে। হারাণ

ঘোষণা করে, শশী ও মানিক দুইজনকে দুইটা রৌপ্য পদক পুরস্কার দেবে।

গান শুনিতে অনেক চাষী আসিয়াছিল। তারা ধরিল, আমাগো নিয়া যে গানটা বাঁধছ সেইটা গাও।

মানিক গায়, চাষী মজুর আমরা কিসে কম?

অনেকেই গানের তালে তালে ঠেকা দেয়, দুচারজন তার সঙ্গে সঙ্গে তাল ধরে।

মানিক এর পর গায় কণ্ট্রোলের গান। দুতিনদিন আগের কথা। হারাণের বাড়িতে কয়েকটা বস্তা নামিতে দেখিয়া সুরযমলকে সে প্রশ্ন করে, এই বস্তায় কি আছে?

সুরযমল ধমক দেয়।

মানিক অনুনয় করে, কও না সাহেব।

সাহেব শব্দটার প্রতি সুরযমলের অদ্ভুত দুর্বলতা ছিল। সে খুশি হইয়া বলিল, কিসিকো বোলো মত্। ইসমে কাঁকড় আছে।

কাঁকর! কাঁকর দিয়া হবে কি সাহেব?

কিসিকো বোলো মত্। চাউলকা সাথ—

ওঃ চাউলের সঙ্গে মিশাবা? যত সব হারাম—

মানিক সেই রাত্রেই কণ্ট্রোলের গান লেখে। পরের দিন সকালে সুকুমারকে শোনায়।

আমারগো বাংলা দেশে,
ও ভাই বাংলা দেশে
আঙ্গরাজে আনছে মজার ক'ল।
লোক ঠকানো কণ্ট্রোল।
তেল লবণের হইছে টিকিস
এবার বাকি গাঙের জল।

চাউলে কাঁকর, ডাইলে বালি
নুন চিনিতে জল।
(এবার) কেরাসিনে কি মিশাবি
বল্ রে রেশন বল ?
ব্ল্যাকমার্কেটে কালো বাজার
করল উজাড়—
মানুষ হইল খল,
কেমন মজার কন্ট্রোল।
বল্রে হরি বল্
বল্রে খোদা বল্।

এই গানে মানিক সুখ্যাতি পাইল সবচেয়ে বেশী। শ্রোতারা বলিল, আরও, আরও শোনাও।

হারাণ ও রামনাথ কিন্তু অস্বস্তি বোধ করে। হারাণই করে বেশী। সে নাকের ডগা চুলকাইতে শুরু করে, তার হাত হইতে জপের থলি পড়িয়া যায়। সে ভাবে, এ কী বিপদ। খরচা করিয়া মেডেল ঘোষণা করিয়া শেষটায় গালমন্দ শুনিতে হইবে ?

অনেকেই তার এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তৃপ্তি পায়। মানিক কিন্তু কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করে। সে শ্রোতাদের বলে, আপনারা পিসির একখানা গান শোনবেন ?

কোন্ পিসির ?—কয়েকজন প্রশ্ন করে।

উলকি পিসির।

তিনি কি গান বাঁধত ?

তিনি বাঁধত না। বাঁধছে তার সোয়ামী। আমি পিসির মুখে শুনছি।

বেশ ত, তুমি গাইয়া শোনাও।

মানিক ধরে,

শিবের ঘরে গঙ্গা গৌরী দুই রমণী
তারা কলো (কলহ) করে দিন রজনী।
ছোট বউ শেষ আসে
ভোলা তারে ভালবাসে,
বসি স্বর্গ লোকে, দুঃখ শোকে
(হয়) বড় বউর দাঁত কনকনানি।

পিসির মৃত্যুর কিছুদিন আগের কথা। বৃদ্ধা একদিন মানিকের গানের সুখ্যাতি করিতে করিতে বলে, জানিস্ তোর পিসাও গান বাঁধত?

মানিক বলিল, গোঁফ চুমরানো পিসা?

গোলাপী ছেলেকে ধমক দেয়। পিসি বলে, অরে বকিস কেন? সে গল্প ত আমিই করছি।

মানিক গানটা শুনিতে চায়। পিসি গুন গুন করিয়া আবৃত্তি করে, মনে হয় যেন গাহিতেছে। মানিক বলে, তোমার গানত বেশ।

পিসি হাসিয়া বলে, হ। আমিও তোর মত কবিদার হইতে পারতাম।

ইস্। আমার মতন আর না। আচ্ছা, পিসারও কি দুই বউ ছিল গঙ্গা আর গৌরী?

বৃদ্ধা বলিল, হ।

গোলাপী বলে, এতদিন জানতাম না। তুমি ত কও নাই।

কব কি? আমার পোড়া কপাল।

বৃদ্ধা যে স্বামীর কি ছিল গঙ্গা কি গৌরী, মানিক তাহা আর জিজ্ঞাসা করিল না।

পিসির গানে বারোয়ারির আসরে হাসির হররা পাওয়া যায়।

ঈর্ষায় দেবতাদের দাঁতও তাহা হইলে কন্ কন্ করে? শুধু মানুষের নয়।

খুশি হয় সবাই। আসর ভাঙার আগে হারাণ মানিককে পাঁচ টাকা বকশিশ করে।

মানিক বাড়ি ফেরে বুকভরা তৃপ্তি ও আনন্দ লইয়া। পরদিনই তৃপ্তি হোটেলের মালিকের নামে পাঁচ টাকা মণি অর্ডার করিয়া দেয়। তাকে লেখে, মহাশয়, আমার বাবা গোকুল দাস মহাশয়ের নিকট আপনার পাওনা পাঁচ টাকা পাঠাইলাম। বাকী কয় আনা আমাকে মাফ করিবেন। বাবার কোন সংবাদ আপনার জানা থাকিলে পত্রপাঠ দয়া করিয়া জানাইবেন।

টাকা পাঠাইয়া তার মনে হয় কাঁধের উপর হইতে যেন একটা ভারী বোঝা নামিয়া গিয়াছে।

কণ্ট্রোলের গানও চাষীর গানের মত লোকের মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়ে। কবি হ মানিক, ভদ্দর লোকেও খাতির করবে—জেঠার এই কথা কিশোর মানিকের জীবনে সত্যে পরিণত হয়। ভদ্রলোকেরা তাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছ মানিক? কেহ বা তার বাবার খবর জানিতে চায়।

এক দিকে এই খাতির আর একদিকে অভাব। অভাবের বেদনা এক একবার খচ্ করিয়া বুকে যাইয়া বেঁধে।

তখন সে মনে মনে হাসে। এক একবার তার চোখ ছল্ ছল্ করিয়া ওঠে। একদিন সে সুকুমারকে বলিল, লোকের খাতির দিয়া করব কি দাদা? খাইতে পাই না। মা পরের বাড়ি দাসীগিরি করে। ডাল ভাতের জন্ম পরের বাড়ি দাসীগিরি। ছোট মায়ের কাছে যে সেলাই শেখবে তাও আর হইল না—অভাবের জন্ম।

সুকুমার তার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে বলে, কিছু ভাবিস না।

তার গলাটা একটু ভারী।

কয়েক দিন পরে মানিক সুকুমারকে বলিল, দাদা একটা কাজ পাইছি। করব?

সুকুমার বলিল, কি কাজ? কোথায়?

বিশ্ব বাবুর দোকানের কাজ।

করতে হবে কি কি?

ওজন করিয়া খরিদদারদের মাল দিতে হবে।

চালে কাঁকর মেশাতে হবে না? চিনি ওজনে ভারী করতে হবে না জলের ছিটে দিয়ে?

দুঃখী আর হরিচরণ ত তাও করে।

একটুক্ষণ ভাবিয়া সুকুমার বলিল, না, ওতে গিয়ে তোর কাজ নেই।

মানিকদের টানাটানি আজকাল খুবই তবু সে সহজ কণ্ঠে বলিল, বেশ, আমি যাব না। আমি তোমার সৈন্য।

আর আমি তোমার সেনাপতি—বলিয়া সুকুমার মৃদু মৃদু হাসে। নাকে একটু নস্য গুঁজিয়া বলে, জানি তোদের খুব কষ্ট চলছে। তবু যেতে দিলুম না। তোকে দিয়ে আমার যে বড় দরকার, ভাই। সব চেয়ে বেশী দরকার।

সুকুমারের অত বড় কাজ, তাতে সব চেয়ে তাকে বেশী দরকার—শুনিয়া মানিক খুশি হয় বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিতও হয় অনেকখানি। বলে, আমারে দিয়া এত কি কাজ দাদা?

লোকে আমাদের বিশ্বাস করে না। তুই থাকলে করবে।

তোমারেও অবিশ্বাস!

হ্যাঁ। আমার ঠাকুরদা চাষী ছিলেন। কিন্তু দাদা দারোগা, কাকা কলকাতায় বড় চাকরি করেন, গরিব হলেও আমি I. A. পর্যন্ত পড়েছি। জুতো জামা পরে বেড়াই, অবিশ্বাস সেই জন্য।

মানিক বলিল, এই হইল তোমার অপরাধ ?

সুকুমার বলিল, তাদেরও দোষ দেওয়া চলে না ভাই। চাষী মজুরদের মধ্যে আমরা যারা লেখাপড়া শিখি তারা সব চেয়ে আগে চাই নিজের শ্রেণী থেকে তফাৎ হয়ে যেতে। তাদের আমরা অবজ্ঞা করি, তারাও অবিশ্বাস করে।

চাষী মজুররা ভদ্রলোকদের বিশ্বাস করিয়া বার বার ঠকিয়াছে, তাই তাদের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। তবুও জনকল্যাণে আসে লোভে পড়িয়া। হয়ত একখানা পুরানো কাপড় বা একখানি গামছা মিলিবে, হয়ত বা এক আধ সের খুদ।

বর্তমানেও কিছু কিছু সুবিধা আদায় করিয়া নেয়। কারও একখানা চিঠি লেখা দরকার সে আসিয়া কর্মীদের ধরিল, ছাওয়ালের কাছে একখানা লেখন পাঠাব, একটু লেইখ্যা দেবা ? হারামজাদার খবর পাইনা আজ ছয় মাস।

কেহ বা হারাণের কাছে ভিটা ও জমি বন্ধক রাখিয়া টাকা নিবে, সে আসিয়া বলিল, মুন্সী বাবুর সরকার মুসাবিদা করিয়া দিছে। দলিলখানা দেইখ্যা দেন, কর্তা। পড়িয়া শুনান।

জনকল্যাণের জন্য মানিকের নিজের মঙ্গলের জন্য সুকুমার তাকে বিষ্ণর দোকানে চাকরি নিতে দিল না। বলিল, আমি চাই না যে চোরাবাজারে তোর হাতে খড়ি হোক।

মানিক বলিল, বুঝছি দাদা। তোমার কথা কখনও ফেলাব না।

উনত্রিশ

গোলাপী রামনাথদের বাড়ি কাজ করে। তাদের উঁচতি পরিবার, কাজ অনেক। এই বাড়ি দিয়াই তার দিন একরকম চলিয়া যায়।

মাস কয়েক পরে সংসারের কর্তা ফুটু ভুঁইয়া ছুটি লইয়া বাড়ি আসে। প্রথম দিনই গোলাপীকে দেখিয়া বলে, তুমি গোকুলের বৌ না? এখানে কাজ কর বুঝি? বেশ, বেশ, গোকুল বেঁচে আছে ত?

গোলাপী অপ্রতিভ ভাবে বলে, আছে।

ফুটু রামনাথদের ছোট কাকা, নাম নলিনীনাথ। বয়সে রামনাথ ও হরনাথ দু' জনের চেয়েই ছোট। সে আসামে চা বাগানে কাজ করে। মাহিনা বেশী নয় কিন্তু উপরি আয় প্রচুর। সে বলে, মাইনে ত এস্নফ, লাট বেলাট মিনিষ্টর থেকে শুরু করে দারোগা কাছারির পেশকার পর্যন্ত যারা একটু আরাম বিরামে আছে তাদের সবারই গোড়ার কথা ঐ একস্ট্রা ইনকাম।

কুলির আয়ে ভাগ বসাইয়া ফুটু সংসারের অবস্থা ফিরাইয়াছে। সে দেশে আসে খুব কম। আসিলেই ধুমধাম করে। হাট বাজারের সেরা দুধ মাছ খায়, বন্ধুদের খাওয়ায়। তাদের কাছে বাগানের সাহেবদের গল্প করে। ম্যরে ও ম্যাকফারলেন, ল্যাম্পসন ও ক্লার্ককার কার কয়টি করিয়া পাহাড়িয়া রক্ষিতা আছে, কে কি মদ্য পান করে, দিনে কয়বার ড্যাম সোয়াইন, শুয়ারকি হাড্ডি বলে—এই সব গল্প।

ম্যরে তাকে বলে, ড্যাম সোয়াইন। মেজ সাহেব বলে, স্নাই ফক্স।

ফুটুর ইয়ার গোষ্ঠ প্রশ্ন করে, তোমাকে ম্যাকফারলং সাহেব যেন কি বলেন?

ম্যাকফারলং নয়, ম্যাকফারলেন। সে বলে, ইউ ডেভিল।

গোষ্ঠ বিস্ময় প্রকাশ করে, ডেভিল!

নিশ্চয়। বড়বাবু এই জন্যে ভারী জ্যেলস্। আর ডাক্তার বাবু বলে, তোমার ফ্যুচর গোল্ডেন। ম্যাকফারলেন যাকে ডেভিল বলে তার আর ভাবনা নেই। ডেভিল হল ওর খাতিরের সাইন। দড়ি ছাড়া আর কাউকে ডেভিল বলে না।

দড়ি ম্যাকফারলেনের পাহাড়িয়া রক্ষিতা।

ফুটুকে লইয়া ভাইপোদের গর্বের সীমা নাই। হরনাথ হাটে বাজারে বলিয়া বেড়ায়, খুড়োর বিদ্যে ক্লাস এইট অবধি। তাতেই এই দবদবা। বি. এ, এম. এ পাশ হলে ওর মিনিস্টারি কেউ রুখতে পারত না। ফুটু বলে, আমি তাহলে সাপ্লাই ডিপাট বেছে নিতুম। কাঁচা পয়সা।

গোলাপীকে দেখিলেই তার মনে পড়ে জীবনের এক বিস্মৃত অধ্যায়। সেই এক রত্তি গোলাপ আজ কতবড় হইয়াছে। কী তার যৌবন, যেন দুকুল ছাপানো জোয়ারের নদী।

কয়েকদিন পরে গোলাপীকে একলা পাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, আমায় মনে পড়ে? শেতল পণ্ডিতের পাঠশালায় আমরা এক সঙ্গে পড়তুম।

গোলাপীর মনে পড়ে খুবই কিন্তু লজ্জায় সে কোন উত্তর করে না। ফুটু বলে, সেই যে তোমায় নিয়ে গোকুল আর আমাতে লড়াই হয়ে গেল, ফ্রি ফাইট। কী খাসা চেহারাই না হয়েছে! তখনই জানতুম, চাইল্ড ইজ দি ফাদার—থুড়ি মাদার—

তারা একই সময় পাঠশালায় পড়িত। গোলাপীর বয়স তখন আট, ফুটুর এগার। সামনের দুইটা দাঁত পড়িয়া গেলেও ফরসা রং ডাগর চোখ ও ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলের জন্য গোলাপীকে বেশ

দেখাইত। তাকে একা পাইলেই ফুটু তার গালে চুমা খাইত। গোলাপী হাতের পিঠ দিয়া গাল মুছিয়া বলিত, থিঃ। সামনের দাঁত না থাকায় ছ শুনাইত থ এর মতন।

গোলাপী উত্ত্যক্ত হইয়া একদিন গোকুলের কাছে নালিশ করিয়া দিল। গোকুল পরদিন ফুটুর হাত ধরিয়া বলিল, আমাগো জাতের মাইয়ারে তুমি চুমা খাবা না। কইয়া দিলাম কিন্তু।

ফুটু বলিল, খাব আমার খুশি। হাত ছাড় বলছি।

ছাড়ব না—আমার খুশি। কও যে আর চুমা খাবা না।

ছাড়বি না? তবে রে হারামজাদা—বলিয়া ফুটু ঘুষি তুলিতেই গোকুল তার হাতে মোচড় দেয়।

ওরে বাবা রে—বলিয়া ফুটু কাতর শব্দ করিয়া উঠিলে গোলাপী হাসিয়া ফেলে। ফুটু মুখ ভ্যাংচাইয়া বলে, দূর্ ফুকলি।

সেই হইতে সে আর তাকে চুমা খায় নাই। এর কিছুদিন পরে গোলাপীর বিবাহ হয়। ফুটু তখন কোটালী হাই স্কুলে পড়িত। আর গোকুল মাঠে মাঠে গরু চরাইত।

আজ ফুটু বলিল, আমায় লজ্জা কর কেন? বলতে গেলে আমরা হলাম ক্লাস ফ্রেণ্ড।

গোলাপী ছোটরাণীকে খবরটা বলিল। ছোটরাণী বলিল, এই হইল যৌবনের শাস্তি। রেহাই নাই একদণ্ডও।

সেই হইতে ফুটু খালি সুযোগ খোঁজে গোলাপীকে কখন একা পাইবে। একা পাইলেই অনাবশ্যক দু'টা কথা বলে। গোলাপী কখনও সরিয়া যায়, কখনও বা উঁচু গলায় বাড়ির মেয়েদের কাহাকেও ডাকিয়া নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় একটা প্রশ্ন করিয়া বসে।

ফুটু শেষটায় একদিন বিরক্ত হইয়া বন্ধু দেবেনের কাছে দুঃখ করিল, মাগীটা যেন ছুঁচো, কিছুতেই নাগাল পাওয়ার জো নেই।

দেবেন বলিল, দাম বাড়াচ্ছে। ছলনাময়ীর জাত ত।

ফুটু একদিন গোলাপীকে ডাকিল 'চাম' (chum) বলিয়া।

গোলাপী ছেলের মারফৎ সুকুমারের নিকট চামের অর্থ জানিয়া ফুটুকে বলিল, আপনি আর ওসব কথা বলবেন না।

কি সব ?

ঐ চাম না কি।

বেশ চাম নয়, বলব ডিয়ারি।

গোলাপী ভাবে কোন্ অপমানটা বড়। হরিমতী যে কুকুর বলিয়াছিল উহা, না ফুটু ভুঁইয়ার এই ডিয়ারি ? নারীর সহজ বুদ্ধি তাকে বলিয়া দেয় ফুটুর অপমানই বড়। তার মা, দিদিমার নিকট, উলকি পিসির নিকট এই শিক্ষাই সে পাইয়াছে। এক একবার মনে হয় এ কাজ ছাড়িয়া দিবে কিন্তু পারে না অভাবের জন্য।

এই সময় ফুটুর আবার বিবাহ হইল। বধূটি তার তৃতীয়পক্ষ। বয়স পনর, ষোল। দেখিতে সুশ্রী, হাসি হাসি মুখ।

গোলাপী আশা করিল নূতন বধূ পাইয়া ফুটু আর তাকে উত্ত্যক্ত করিবে না কিন্তু দেখিল সে তার ভুল। সে যখন কাজ করে ফুটু তখন পিছন হইতে তার দিকে চাহিয়া থাকে। গোলাপীর ভারী অস্বস্তি বোধ হয়।

ফুটুর এই কুৎসিত দৃষ্টি এড়াইতে যাইয়া একদিন ঘরের পোতা লেপিবার সময় গোলাপীর হাত হইতে গোবর জলের একটি হাঁড়ি পড়িয়া গেল। আর একদিন সে হুমড়ি খাইয়া পড়িল এক কুকুরের উপর। কুকুরটা কেঁউ কেঁউ করিয়া উঠিল।

ফুটু ব্যস্ত ভাবে আগাইয়া আসিয়া বলিল, এ্যাঁ আঁচড়ে দিয়েছে বুঝি, না কামড়ে ? শালা কুকুর। ড্যাম, সোয়াইন, শুয়ারকা হাড্ডি।

গোলাপী কোন কিছু উত্তর করার আগেই সে দশ টাকার একখানা

নোট তার হাতে গুঁজিয়া দিয়া হাতখানা জোরে চাপিতে লাগিল।

গোলাপী বলে, ও কি? আমার হাত চাপেন কেন? কুকুরে কিছু করে নাই। এখন আপনে ছাড়েন দেখি।

ফুটু মুচকি হাসে। তার বিশ্বাস টাকায় সব হয়। দিনকে রাত, রাতকে দিন করা চলে। অর্থের বিনিময়ে সতীত্ব, মান মর্যাদা কেনা যায় সব কিছু। গোলাপী দর কষাকষি করিতেছে ভাবিয়া সে বলিল, নেও পঁচিশ, পঞ্চাশ, একশ, কি চাই তোমার?

আমারে ছাড়েন। আপনার টাকায় আমার দরকার নাই।

তোর দরকার খালি ভীমারে। ইউ স্লাই ফক্স—বলিয়া ফুটু তাকে কাছে টানিয়া নেয়।

বাড়িতে অপর কেহ ছিল না। সবাই নিমন্ত্রণে গিয়াছিল। গোলাপী সেদিন অতিকষ্টে নিজের মান বাঁচাইয়া বাড়ি ফিরিল। তার মান রক্ষা করিতে সাহায্য করিল সেই কুকুরটি। চরম মূল্যও তাকেই দিতে হইল। ফুটু তাকে লাঠি পেটা করিয়া মারিয়া ফেলিল।

* * *

গোলাপী পর পর কয়েকদিন কাজে না যাওয়ায় রামনাথদের বুড়া চাকর দোয়ারি তাকে ডাকিতে আসে। গোলাপী বলে, ও কাজ আর করব না।

দোয়ারি বলিল, কেন করবা না? দেয় থোয় ভাল। পূজায় তোমারগো তিনজনরে কাপুড় দেবে, বড় বৌ ঠাকরুন কইয়া পাঠাইছে।

রামনাথের স্ত্রীকে চাকর বাকররা ডাকে বড় বৌ ঠাকরুন।

গোলাপী বলিল, তানারে কইও আমার পোষাবে না।

অমন্ ঘরটা ছাড়বা? নতুন পয়সা হইছে, তার উপর তোমরা হইলা ভিটা বাড়ির প্রজা। থাকলে সুখ সুবিস্তা হইত।

সবই জানি খুড়া, তুমি যে আমারে ভালবাসিয়া কইতেছ তাও বুঝি। কিন্তু আমি আর যাব না। বড় বৌ ঠাকরুনরে কইও আমারে ক্ষ্যামা করতে। আর সতের দিনের মাইনা বাকী, তা যেন পাঠাইয়া দেয়।

দোয়ারি ফিরিয়া যাইতেছিল গোলাপী বলিল, ঐ বাড়ির দুইটা চায়ের বাটি আছে, লইয়া যাও। আনছিলাম শিন্নির লগে। আর আমার মাইনার কথাটা ভুলিও না যেন।

দোয়ারি বলিল, ভাল কথা, গোকুলের খবর কি ?

সে ক্ষতটা খোঁচাইয়া তোলায় গোলাপীর মুখে বিরক্তির ছাপ পড়ে। সে বলে, জানি না।

সেদিন কে যেন কইল গোকুলেরে কলকাতার রাস্তায় দেখছে।

কেডা, কেডা কইছে খুড়া ? কি কইছে ?

কে যে কইছে, কি কইছে ভুলিয়া গেছি।

এমন কথাডা ভুলিয়া গেলা !

দোয়ারি অপ্রস্তুতভাবে বলিল, শোনলাম ভিড়ের মধ্যে। তাই কে যে কইছে মনে পড়তেছে না।

দোয়ারি ফিরিয়া আসিলে রামনাথের স্ত্রী মহিমময়ী বলিল, গোলাপের পোষাবে না কেন ? কি বললে সে ?

কারণ কয় নাই।

তাদের পূজায় কাপড় দেবে বলেছিলে ?

কইছিলাম, তোমরা বড় মানুষ, সে তোমাগো ভিটা বাড়ির প্রজা, কত বুঝাইলাম।

মহিমময়ী বলিল, ওঃ।

পাশেই ছিল হরনাথ, সে বলিল, ছেলে কবিদার তাই মাগীর দেমাক হয়েছে। বার করে দিচ্ছি ওর কবিগিরি।

গোলাপী না আসায় হরনাথ একদিন নিজে তার বাড়ি গেল। প্রথমে অনেক মিষ্টি কথা বলিল, দেখ, তুমি না যাওয়ায় ছোট বউর বড় অসুবিধে হচ্ছে। পোয়াতি মানুষ, তার দেহটা চর্বি বোঝাই, নড়তে চড়তে কষ্ট হয় অথচ সংসারে কাজ ঢের। বৌদিকে ত জান, নড়ে বসতে চায় না। ছোট খুড়ী নতুন বৌ তার উপর বৌদি তাকে বানাচ্ছে যেন পটের পরী। তুমি না এলে ছোট বউর কি হয় বলা যায় না। আর পেটের সন্তান—

ছোট বউ তার স্ত্রী। সে বরাবরই কর্মবিমুখ, তার উপর সম্প্রতি অতিরিক্ত মোটা হইয়া পড়ায় কাজ করিতে গেলেই হাঁপায়। হরনাথের কথা শুনিয়া গোলাপী মনে মনে হাসে।

হরনাথ বলে, কি জবাব দিচ্ছনা যে ?

গোলাপী বলিল, আমায় ক্ষ্যামা করেন।

হরনাথ এবার রাগিয়া যায়। ভয় দেখাইয়া বলে, জান, ইচ্ছা করলে তোমাকে ভিটে ছাড়া করতে পারি ?

গোলাপী চুপ করিয়া শোনে কিন্তু হরনাথকে স্পষ্ট শুনাইয়া দেয় ছোটরাণী। সে তার মুখের উপরই বলে, কথায় কথায় ভিটা ছাড়াবেন কন কেন ? ভিটা ছাড়ানো অত সোজা না।

হরনাথ বাড়ি ফিরিয়া বউদি ও স্ত্রীর কাছে তর্জন করিতে লাগিল, মাগীদের ভিটা ছাড়া না করি ত আমার নাম হরনাথ নয়। বজ্জাতি ওদের হাড়ে হাড়ে। বিশেষ করে কানীটার, ছোটরাণী না ছোটপেত্নী।

মহিমময়ী বলিল, দোষ ওদের নয়। দোষ জনকল্যাণের। সুকু ওদের এসব শেখাচ্ছে। সে চাষী মজুরদের খেপিয়ে তুলছে।

হরনাথ বলিল, রাখ, ওদেরও জব্দ করে দিচ্ছি। দাদা এবার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে দাঁড়াচ্ছে, মেম্বার হবেই। তখন জজ মাজেষ্টর পুলিস সব আসবে হাতের মুঠোর মধ্যে।

ফুটুর স্ত্রী মলিনা মহিমময়ীর মেয়ের বয়সী। তাকে ডাকে বড মা বলিয়া। সে সেই দিনই বলিল, গোলাপীকে আর ডেকে কাজ নেই, বড় মা।

মহিমময়ী প্রশ্ন করিল, কেন?

তাতে সংসারে অশান্তি হবে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর কিন্তু ঐ তিনটি শব্দের মধ্যেই মলিনার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পায়। মহিমময়ী ভাবে, যাক্, ছোট এই মেয়েটি লম্পট স্বামীকে জব্দ রাখিতে পারিবে। সে বলে, যাক আর ডাকব না।

মলিনা বলিল, গরিব মানুষ, ওর পাওনাটা পাঠিয়ে দিলে হয় না?

তাতে ও আশকারা পাবে। ঠাকুরপোও রাগ করবে।

মলিনা বলিল, বেশ তাকে আমি বলব'খন।

সে পর দিনই হরনাথের কাছে কথাটা তুলিল। সে সম্মতি দিল কিন্তু স্ত্রীর কাছে দুঃখ করিল, ছোট কাকীকে দিয়ে আমাদের মানসম্মান বজায় থাকা মুশকিল হবে। গরিবের মেয়ে, বনেদিয়ানার ধারণা নেই।

তার স্ত্রী বলিল, তেজপক্ষের বরের জন্য ন' পাড়ার ঘোষেদের মেয়ে আর পাচ্ছ কোথায়?

সে নিজে ন' পাড়ার ঘোষেদের মেয়ে, তার প্রপিতামহ জমিদার ছিল। পিতামহ কুলীনে ছাড়া কাজ করিত না।

স্ত্রী তাকে ঘোষেদের জামাই হওয়ার উপযুক্ত মনে করে দেখিয়া হরনাথ খুশি মনে বলিল, তা যা বলেছ।

ত্রিশ

দক্ষিণপাড়া ফুড কমিটির জন্য টাকা দিয়াছিল সরকাররা। রেশনের দোকান তাদের বাড়িতেই হইল।

মাল আসিয়াছে শুনিয়া সেখানে ভিড় জমে, ছেলে, বুড়ো, যুবা হিন্দু মুসলমানের ভিড়। তারা উঠানে রৌদ্রে দাঁড়াইয়া থাকে। তবে সঙ্গতিপন্ন লোকদের কথা স্বতন্ত্র। ফুটু ডাকিয়া তাদের নিজের বৈঠকখানায় বসায়, চা দেয়, খাতির করে।

সে আবু মিয়াকে একটা সিগারেট দিয়া বলিল, খেয়ে দেখুন মিয়া সাহেব। আমাদের বাগানের ম্যারে এই সিগারেট খান।

আবু মিয়া সিগারেটে গোটা দুই টান দিয়া বলিল, আপনাকে তামুক পাঠিয়ে দেবখ'ন। খাম্বিরা, দোরসা, মিঠে কড়া, কোন্‌টা আপনার পছন্দ ?

ফুটু বলিল, ও রসে আমি বঞ্চিত। যেটা হয় পাঠিয়ে দেবেন।

শুরু হয় তামাক তত্ত্ব। আনারপুর কি গাজিপুর কোথার তামাক ভাল, কি ভাবে তামাক মাখিতে হয় এই সব আলোচনা।

বৈঠকখানার নিয়মিত আড্ডাধারী দেবেন বলিল, জান ত ফুটু ভাই, তামাক সাজাও একটা আর্ট ? লাখনোর নবাবরা হাজার টাকা দিয়ে হুঁকো বরদার রাখতেন।

বিশু বলিল, বল কিহে ? হুঁকা বরদারের মাইনে হাজার। এ যে আরব্য উপন্যাস শুনছি।

এত আর বেনে ইংরেজ নয়, তারা ছিলেন সত্যিকারের শাহান-শা বাদশা।

বাদশাদের প্রশংসায় নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে আবু মিয়া বলিল, ঠিক বাত্‌।

বিশু বলিল, তামাক মাখার মতন তামাক সাজা, তামাক টানাও একটা আর্ট।

এই কথার সমর্থনেই যেন আবু মুচকি মুচকি হাসে।

চা আসে, সঙ্গে পরোটা ও আলু ভাজা।

রামনাথ ও হরনাথ বাড়িতে নাই। তারা আসিলে রেশনের মাল দেওয়া হইবে। তাদের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে উঠানের লোকেরা বিরক্ত হইয়া উঠে। নানা টিপ্পনী করে।

ঘণ্টা খানেক পরে হরনাথ আসিলে আসফ আলি বলিল, মালের জন্য আমরা অনেকক্ষণ বসিয়া আছি, ভুঁইয়া।

হরনাথ কোন উত্তর না করিয়া ভিতরে যাইতেছিল। আসফ আলি বলিল, একবার ফিরিয়াও তাকাও না যে। পয়সা দিয়া মাল নিতে আইছি, ভিক্ষা করতে আসি নাই।

হরনাথ বলিল, দাদা আসুন তারপর যা হয় হবে।

অনুকূল বলিল, ডিলার ত আপনে।

হরনাথ বলে, তা বটে কিন্তু দাদার হুকুম না হলে আমার কি কিছু করা উচিত? তুমিই বল আসফ।

শ্রীনাথ টিপ্পনী করে, একেবারে ভাই লক্ষ্মণ।

হরনাথ যেন শুনিয়াও শোনে না।

একপাশে কতকগুলি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া। পয়সার দিক দিয়া তারা চাষী মজুরদের পর্যায়েই নামিয়াছে, হয়ত বা তারও নিচে কিন্তু তারা তফাতে থাকিতে চায়, চায় শ্রেণীগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে। কেহ কেহ ফুটুর বৈঠকখানার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকায়। হরনাথ প্রকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, কি হে প্রকাশ খুড়ো, তোমার না এ ক্লাশ টিকিট।

প্রকাশ টানিয়া টানিয়া বলিল, হ্যাঁ। হয়েছে তোমাদের জন্য। অথচ একদিন এ ভিটেরও মালিক ছিলুম আমরা।

হরনাথ তাকে অপমান করার উদ্দেশ্যে কিছু বলে নাই, তার কথার ধরনই ঐরূপ ঢিলা। প্রকাশের টিপ্পনীতে সে কিন্তু রাগিয়া গেল। বলিল, কে কবে জমিদার ছিল, কার বাপ ছাপর খাটে শুত তা দেখে ত কণ্ট্রোলের টিকিট হয়নি। হয়েছে টেক্স হিসেবে।

প্রকাশও কি যেন কড়া জবাব দিতেছিল এই সময় রামনাথ আসিয়া উপস্থিত। সে বলিল, কি হয়েছে প্রকাশ খুড়ো?

তুমি তবু খুড়ো বললে। টাকার গরমে হরু ত আমাদের মানুষই মনে করে না।

ওর কথা ছেড়ে দাও। জীবন সরকারের নাতি তুমি, জগু সরকারের ছেলে, তোমাদের ধরতে আমাদের এখনও ঢের দেরি।

প্রকাশ এবার প্রসন্ন মুখে বলে, তুমি ত সব খবরই রাখ বাবাজী।

রামনাথ অপেক্ষমান ক্রেতাদের চাহিয়া বলিল, আপনারা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন বুঝি? যাক্, আমি শীগ্‌গিরই আর একখানা ঘর তুলছি যাতে সবার সুবিধে হয়।

আসফ আলি বলিল, ঘর আমাদের মাথায় থাকুক। আমারে আধ সের নিমক দেও দেখি।

আমার চাই ক্রাচিন, আমার চাই কাপুড় এক জোড়া। আধ সের চাউল না হইলে আর হাঁড়ি চড়বে না, এট্টু মিষ্টু—বলিতে বলিতে আট দশ জন রামনাথকে ঘিরিয়া ধরে। সে বলে, মাল দিতে দু' তিন দিন দেরি হবে।

অবস্থা হয় গরম তেলে ফোড়ন দেওয়ার মতন।

পটকা শখের যাত্রার পাঠ বলে। সে বলিয়া উঠিল, একী কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে?

আরও দু' তিন জন সমস্বরে বলিল, এ কও কি মশায়? এর থা তুমি আমাগো খুন কর।

কলরব একটু কমিলে ইউসুফ বলিল, আমার বাড়ির বিবিরা বড় গোসা হইছে।

রামনাথ বলে, কেন, ইউসুফ ভাই?

কাল বেমুনে নিমক দিতে পারে নাই বলিয়া।

তাঁদের বোলো দু' তিন দিনের মধ্যেই চিনি নিমক সব পাবেন।

আজ নয় কেন ?

আমার যে হাত পা বাঁধা, ইউসুফ।

কেন, তোমরা ত বড়লোক হইছ।

বড় আর ছোটর কথা নয়। বিল্বের সঙ্গে হিসেব করে তার পরামর্শ নিয়ে বিলি ব্যবস্থা করতে হবে।

আবার কলরব শুরু হয়—সব ডিলারই সমান, শুরুতেই এই, রেশন হইছে মানুষ মারার কল। জুয়াচুরির জায়গা।

অনুকূলহরি বলিল, বিল্বের সঙ্গে ত তোমাদের মনের অকৌশল ছিল।

রামনাথ বলিল, মিটিয়ে ফেলেছি। ঝগড়া থাকলে ত আর কাজ কারবার চলে না, বিশেষ করে পাব্লিকের কাজ। তোমাদের সুবিধের জন্যই পরামর্শ করতে হবে। শুধু তার সঙ্গে নয়, হাটের তাহাজুদ্দিন আছে, তারণ শা আছে।

সাধারণ লোকে এই পরামর্শের রহস্য বোঝে না। তাদের সন্দেহ হয়, ভয় হয়। সুবিধার আশায় তারা পৃথক্ দোকানের জন্য দরখাস্ত দিয়াছিল, এখন রামনাথও যদি তাহাজ তারণের সঙ্গে হাত মিলায় তাহা হইলে দুর্ভাগ্যের আর অন্ত থাকিবে না।

মাল না পাইয়া সবাই ফিরিয়া গেল। রাগে তারা ফাটিয়া পড়িতেছিল। অনুকূলহরি বলিল, চোরেরা মেলছে বেশ। তাহাজ রামু সব শালা যেন মাউসাত ভাই।

ইউসুফ বলিল, আমরা কুমিটি করলাম, এত মেহনত করলাম এই জন্য ? কে জানে নসিবে কি আছে !

প্রকাশ বলিল, আছে ঢুঁঢুস।

অনুকূলহরি বলিল, ভদ্দর লোকগো কথা পেবথক। আপনারা ঠিক ঠিক মাল পাবা।

প্রকাশ বলিল, ভদ্দর লোকের জলুস ত দেখলে, ভাই। হরু বেটা কি অপমানটাই না করলো?

মাল না পাইয়া লোকগুলি ফিরিয়া যায়। অনেকেই রাগ করে সুকুমারের উপর। এবাড়িতে কেন সে দোকান করিতে দিল—রাগ সেই জন্য। কেহ বলে, এ খালি বই পড়ার কর্ম না, দুনিয়ায় চলতে হৈলে চাই বুদ্ধি।

অনুকূল বলিল, আমাগো ত সে জিজ্ঞাসা করছিল, ভাই।

কে একজন প্রতিবাদ করে। সে ন্যাতা হইছে কেন? বুদ্ধি বেশী বলিয়াই ত তারে আমরা মাথায় বসাইছি।

আকালী বলিল, দোষ ত ন্যাতারই।

আর এক দল সোজাসুজি সুকুমারের বাড়িতে গেল।

সুকুমার বালিশে হেলান দিয়া একখানা ইংরেজী বই পড়িতেছিল। ডান হাতের আঙুলে এক টিপ নস্য। নাকের নিচে ধূসর নস্যের দাগ, উহা হইতে র মাদ্রাজীর উগ্র গন্ধ আসে। কপালের উপর কয়েকগাছা কোঁকড়ানো চুল ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

বাহির হইতে আসফ ডাকিল, ও সুকু ভাই।

সুকুমার জানিত রেশনের নূতন দোকানে আজ মাল দেওয়া হইবে। আসফের কণ্ঠস্বরেই ব্যাপারটা সে অনুমান করিয়া লইয়াছিল। বাহিরে আসিয়া লোকগুলির মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে আর কিছুই বাকী রহিল না। সে বলিল, মাল পাওনি বুঝি? কি বললে ওরা?

প্রকাশ বলিয়া উঠিল, ঢুঁঢুস।

ফুটুর চায়ের আড্ডা, তাহাজ তারণের নামে রামনাথের অজুহাত নরেন সবিস্তারে সবই বলিল।

আসফ কহিল, একটা হাচা কথা সুকু ভাই। দোষটা তোমার। সরকার গো বাড়িতে মাল আনতে দিলা কেন? তোমার এইখানে দোকান আনলেই পারতা।

টাকার যোগাড় করতে পারিনি। অত চেষ্টা করলুম, কটা টাকা আর উঠল? তা ছাড়া ওদের টাকায় মাল আনিয়েছি ত তোমাদের সবার মত নিয়ে। এই জন্য সভা হয়েছিল।

প্রকাশ বলিল, আমি সে সভায় ছিলাম না।

এস্তাজ বলিল, আমিও না।

অনুকূলহরি বলিল, খবর ত সবাই পাইছিলা।

এস্তাজ বলিল, আমরা ভাবছি সুকুদাই বুঝিয়া সব করবে। উনি হইল ন্যাতা।

নরেন গোঁফ চুমরাইয়া সুকুমারের দিকে চাহিয়া বলিল, বোঝো এবার নেতা হওয়ার ঠেলা।

সুকুমার বলিল, মাল ঠিক ঠিকই পাবে। ভয় নেই, আমি এখুনি যাচ্ছি রামনাথের কাছে।

মুখে বলে বটে কিন্তু তার ভয় হয় নূতন দোকানের বিলি ব্যবস্থাও বুঝি পুরান দোকানের মতন হইবে। অনাচার সমানেই চলিবে।

এতগুলি লোকে তাকে বিশ্বাস করিয়া স্বাক্ষর দিয়াছে, এতদিন অসুবিধা সহ্য করিয়াছে। রাগ তারা করিতে পারে, করা স্বাভাবিক। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা এই যে ছোট্ট গৌরীগ্রাম ইউনিয়নে আর একটা চোরা কারবারের সৃষ্টি হইল।

... ...

মানিকও মালের জন্য আসিয়াছিল। কারও সঙ্গে কোন কথা বলে নাই, জিনিস না পাইয়া কোন অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই। সে লক্ষ্য

করিতেছিল ফুটুকে, রামনাথকে ও হরনাথকে। দেখিতেছিল গরিব ভদ্রশ্রেণীর করুণ অবস্থা।

সরকার বাড়িতেই আকালী তাকে বলে, গলা ছাড়িয়া কণ্ট্রোলের গানটা একবার গাইয়া দে।

মানিক বলিল, না জেঠা, প্রথম দিনই রামনাথ বাবুগো রাগানো উচিত না।

তাছাড়া তার মনও খারাপ ছিল। গ্রামে গুজব, গোকুল কলিকাতায় চুরি করিয়া ধরা পড়িয়াছে। কোমরে দড়ি, হাতে হাতকড়া পরাইয়া পুলিস তাকে রাস্তা দিয়া লইয়া যাইতেছিল।

কে যে উহা দেখিল, কে যে গ্রামে রটাইল কেহই বলিতে পারে না। কিন্তু গুজবটা লোকের মুখে মুখে।

মানিক বিশ্বাস করে না। সে জানে কথাটা মিথ্যা। তার বাবা চোর নয়, চুরি করিতে সে পারে না। পুলিস হয়ত অন্য কারণে ধরিয়াছে। গ্রামে ঐ কথা রটাইবার পিছনে নিশ্চয়ই কারও কোন অভিসন্ধি আছে।

খবরটা মানিক বিশ্বাস করে না বটে তবু তার মন খারাপ।

কাল বহুদিন পরে অমূল্যর সঙ্গে দেখা। সে প্রথমেই প্রশ্ন করিল, তোর বাবাকে আবার নাকি পুলিসে ধরেছে?

মানিক উত্তর করে, শুনছি আমিও।

অমূল্য প্রশ্ন করিল, কেন রে?

কারণটা সেও শুনিয়াছে অথচ নেকামি করিতেছে, মানিকের ইহা অসহ্য মনে হইল। সে বলিল, তুমিত শোনছই। আর কেন?

অমূল্য অপ্রস্তুত ভাবে বলিল, আমি বিশ্বাস করিনি। খাঁটি খবর তোমরা পেয়েছ কিনা তাই জানার জন্য জিজ্ঞেস করছিলাম।

মানিক পাঁচজনের সঙ্গে চলিয়া যাইবে এমন সময় দোয়ারি আসিয়া বলিল, ছোটমা তোমারে অন্দরে ডাকতেছে।

তিনি কেডা?

ফুটু কর্তার পরিবার।

আমারে কেন?

জানি না।

এই বাড়িতে কি যেন গোলমাল হইয়াছে, মা সেইজন্য কাজে আসে না। মাত্র আঠার দিনের মাহিনা বাকী ছিল, নূতন এই বৌটি পুরা এক মাসের মাহিনা পাঠাইয়া দিল। এরকম কেহ করে না তাই এই বধূটির প্রতি সে মনে মনে শ্রদ্ধা পোষণ করিত। সে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কোথায়?

দো-তলার ঐ ঘরে।

বেশ চল।

দোয়ারি আগে আগে চলে, পিছনে চলে মানিক। ঘরের দরজা পর্যন্ত যাইয়া ইতস্ততঃ করে ভিতরে ঢুকিবে কিনা।

মলিনা হাসি মুখে আগাইয়া আসিয়া বলিল, এস ভিতরে এস।

তার সুন্দর হাসি ও মিষ্টি চাহনি মানিকের বেশ লাগে। সে ধীরে ধীরে বলে, আমরা ত ভিতরে যাই না। মা-ও বাইরে কাজ করত।

সে রেওয়াজ আমি তুলে দিয়েছি।

মানিক ঘরে ঢুকিলে মলিনা তার হাতে দুইটি সন্দেশ দিয়া বলিল, এ কী! লজ্জায় রাঙা হয়ে গেলে দেখছি। নাও, খেয়ে ফেল। এই-টুকু ছেলের আবার লজ্জা।

মানিক বলিল, আমারে ডাকছেন কেন?

তোমার মাকে একবার পাঠিয়ে দিও। বলবে, আমি ডেকেছি। খুব দরকার।

মানিক একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, মা আসবে না।

আমার নাম করে বোলো দেখি।

মানিক বলিল, আচ্ছা।

মলিনাকে বেশ লাগে তার। কেমন মিষ্টি মিষ্টি হাসি, সুন্দর চাহনি। কিন্তু সবচেয়ে ভাল তার ব্যবহার। মানিকরা কোন উচ্চ-বর্ণের ঘরে ঢুকিতে পারে না, ঢুকিলে জল পর্যন্ত নষ্ট হয়। কিন্তু মলিনা তাকে ঘরে ডাকিয়া যত্ন করিয়া খাবার দিল। মানুষের মর্যাদা দিল।

মানিকের কাছে এইটাই সব চেয়ে বড় কথা। সে খাইয়া পরিয়া বাঁচিতে চায়, সঙ্গে সঙ্গে চায় মানুষের মর্যাদা।

বাড়ি ফিরিয়া মায়ের কাছে সে মলিনার সুখ্যাতি করে। বলে, ও বাড়ির ছোট মায়ের কোন দেমাক নাই, না পয়সার না জাতের।

গোলাপী বলিল, হ জানি, বউটি হইছে খাসা।

সে তোমারে যাইতে কইছে।

কেন রে?

কেন তা কয় নাই। কি যেন দরকার আছে। গোলাপীও মলিনার কাছে বরাবর ভাল ব্যবহার পাইয়াছে। তার কথা রক্ষা করিতে পারিলে সে সুখীই হইত। কিন্তু একটু ভাবিয়া বলিল, না আমি যাব না।

মানিক বলিল, না যাওয়া কি ভাল হবে? অমন ভাল মানুষ তিনি।

তা ঠিক। কিন্তু—কিন্তু আমি পারব না যাইতে।

মানিকের মনে প্রশ্ন জাগে, মা কেন যাইতে চায় না। সরকার বাড়ির চাকরি সে ছাড়িল কেন?

মলিনাকে যাইয়া খবরটা দিতে হইবে ভাবিতেই তার কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হয়।

সেই দিনই জামুলা হইতে চিঠি আসিল বড় রাণীর অসুখ। সে একবার মানিককে দেখিতে চাহিয়াছে।

একত্রিশ

মানিক যখন জামুলায় পৌছিল আকাশে তখন রংএর অপরূপ খেলা চলিয়াছে। বিদায়ী সূর্য পশ্চিম আকাশে পাতলা মেঘের উপর আবীর ঢালিয়া দিয়াছে। সেই সিঁদুরে মেঘের মাঝখানে নীলাভ আর একখানা মেঘ। দেখিতে ভারতবর্ষের মানচিত্রের মতন।

উর্ধ্বে মহাশূন্যের পুব ঘেঁষিয়া চতুর্দশীর চাঁদ। তার চার ধারে মেঘের রঙিন বলয়।

নয় দশ বছরের ফুট ফুটে সুন্দর একটি মেয়ে খালঘাটে গা ধুইতেছিল। ঘাটে নৌকা লাগিলে সে জিজ্ঞাসা করিল, মাঝি নাও কোথার ?

মাঝি বলিল, আইছি গুরি গাঁয়ের থা।

গুরি গাঁ অর্থাৎ গৌরীগ্রামের নৌকা শুনিয়া মেয়েটি লজ্জায় লাল হইয়া যায়।

মানিক বলে, টুকুনি না ? আমি মানিকদা, আমারে চেন নাই ?

টুকুনি যেন আরও জড়সড় হইয়া পড়ে। মাথা নাড়িয়া জানায়, হ্যাঁ চিনিয়াছে।

মানিক জিজ্ঞাসা করিল, বড় মা আছে কেমন ?

ভাল না—বলিয়া টুকুনি ক্ষিপ্রপদে চলিয়া যায়।

টুকুনি বড় রাণীর দাদা পুর্ণর মেয়ে। গেলবার মানিক যখন জামুলায় আসে সে তখন ফ্রক পরিত। মানিকের সঙ্গে খেলিত।

দু'চারবার তার কোলে পিঠেও চড়িয়াছে। আজ সেই টুকুনি তাকে এত লজ্জা করে কেন মানিক ভাবিয়া পায় না।

বড়মার ঘরের চৌকাঠে পা দিয়া সে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। তক্তপোশের উপর বিছানায় শুইয়া এ কে? শীর্ণ, শুষ্ক মুখ, সাদা পেঁয়াজের খোসার মতন রক্তহীন ঠোঁট, এই রোগিনীকে বড় মা বলিয়া চেনার উপায় নাই। এ যেন আর কেহ।

মানিককে দেখিয়া বড় রাণীর মুখে একটু ম্লান হাসি ফোটে, মানিকের পরিচিত হাসি। সে বলে, এমন হইয়া গেছ! আগে খবর দেও নাই কেন?

তারপরই বড়মার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া তার হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া ধীরে ধীরে আঙুল টিপিতে থাকে। বড় রাণী একটু পরে ইসারায় প্রশ্ন করে, বাড়ির সব আছে কেমন?

মানিক বলে, ভাল।

চোখ চাওয়ার ক্লান্তিতেই বড় রাণীর চোখ বুজিয়া আসিল।

পরের দিন সকালে দেখা গেল তার অবস্থা একটু ভাল। মানিক বলিল, তুমি সারিয়া ওঠবা, বড় মা। আমি আসার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার অসুখ কমেছে।

বড় রাণী একটু হাসিল। সেদিনও তাদের বিশেষ কোন কথাবার্তা হইল না।

দুপুরে পূর্ণ মানিককে পাশে বসাইয়া খাওয়ায়, খুঁটিনাটি অনেক প্রশ্ন করে, কি ভাবে তাদের চলে, চৌকিদারী টেক্স কত, জমিদারের খাজনা কত, খাজনা বাকী পড়িয়াছে কিনা এই সব। সব শেষ প্রশ্ন, পদ্য বানাইয়া গান গাহিয়া তার রোজগার হয় কি রকম।

কিছুদিন আগেও কেহ এই প্রশ্ন করিলে মানিক বেশ গর্বের

সঙ্গে বলিত, আমি ভাল গান বাঁধি, জেঠা কাব্যশক্তি দিয়া গেছে। কখনও বা বিনা প্রশ্নেই নিজের গান বাঁধার গল্প বলিত। কিন্তু এখন আর করে না।

পূর্ণর প্রশ্নের উত্তরে বলিল, রোজগার কিছুই হয় না। শশীদার কাছে গান বাঁধা শেখতেছিলাম। এখন আর যাইতে পারি না।

কেন ?

সময় পাই না।

শোনলাম কিছুদিন তুই একলাই রোজগার কর।

আজ কিছুদিন হইল আমি একা রোজগার করি, আগে মাও করত। আমার ইচ্ছা না যে মা বাড়ি বাড়ি যাইয়া আর কাজ করে। আমি বড় হইছি।

ভাল কথা, চাষীর গান, কণ্ট্রোলের গান তুই বাঁধছ না ? এ দেশের লোকও তোর গান গায়।

শুনিয়া মানিকের বড় আনন্দ হইল।

পরদিন সকালে সে পূর্ণর ছোট ভাই সুধন্যকে বলিল, তোমার সঙ্গে মাঠে যাব, ছোট মামা।

সুধন্য বলিল, কুটুম মানুষ, দুই দিনের জন্য আইছ, মাঠে যাইয়া কাজ নাই।

যাব চাষ দেখতে।

চাষ দেখিতে যাইবে বলিল বটে কিন্তু মাঠে নামিয়া সে সুধন্য ও তার মজুরদের সঙ্গে কাজ করিল। মাঠের বাসায় তাদের সঙ্গে দুপুরের খাওয়া খাইল।

যে সব কৃষকের জমি অনেক, কিষাণ মজুর অনেক, তারা বিশ্রামের জন্য শস্য পাহারা দেওয়ার জন্য মাঠের মধ্যেই ঘর তোলে, তাকে

বলে বাসা। চাষের সময় ধান কাটার সময় চাষী মজুররা এখানে খায়, দু' চারজন রাত্রেও থাকে।

সুধন্য বলিল, তোরে শেষটায় বাসায় খাওয়াইলাম।

মানিক বলিল, আমিও তোমার ঘরেরই ছাওয়াল, ছোট মামা।

সুধন্য পরম স্নেহে তার পিঠ চাপড়াইয়া দেয়।

চাষীরা শুনিয়াছিল এই ছেলেটি চাষীর গান, কণ্ট্রোলের গান বাঁধিয়াছে। অনেকেই সে গান জানিত। কেহ কেহ গাহিতেও পারিত। তারা তার নিজের মুখে গান শুনিতে চাহিল।

মানিক আপত্তি করিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আপত্তি টিকিল না। অগত্যা তাকে গান ধরিতে হয়। সে ধরে নূতন এক গান,

চাষী ভাই, মজুর ভাই আয়রে সবে
নিশান যে কাঁধে আজ নিতে হবে।
শুনিস নি তুই কি এই নিশানের ডাক ?
নও জোয়ান, আয়রে সব দিচ্ছে সে হাঁক।
মুক্তি তোর কাড়িয়া নিতে হবে,
চাষী ভাই, মজুর ভাই আয়রে সবে।

মানিকের গলা বেশ মিষ্টি। গলা চড়ে, সুর ছড়াইয়া পড়ে সমস্ত মাঠময়। শ্রোতাদের লাগে বেশ কিন্তু তারা অর্থ বোঝে না, পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

একটু পরে একটি বৃদ্ধ মানিকের কাছে আসিয়া তার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, খাসা গান বাঁধছ, বাঁচিয়া থাক।

মানিকের বুক আনন্দে ফুলিয়া ওঠে। সে গায় কণ্ট্রোলের গান, তার পর, 'চাষী মজুর আমরা কিসে কম ?'

এই অঞ্চলের অনেকেই গান দুটি জানিত। কেহ কেহ তার সঙ্গে গান ধরে, জমিতে পা ঠুকিয়া, লাঙলে হাত ঠুকিয়া তাল দেয়।

শস্যের ডগায় লুটাইয়া পড়া রোদের সঙ্গে চাষীদের বুকের ভিতরটাও আলোয় ভরিয়া যায়। জীবনের আলো, আশার আলো।

তারা ত কম নয়, তারা দেশের লোককে, ঐ রাজা জমিদার ও বাবুদের খাবার জোগায়। জোগায় ধান, ডাল, কুমড়া, কাঁকুড়, দেশের লোককে বাঁচাইয়া রাখে তারা।

এই উৎসাহ, এই প্রেরণা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে সারা আকাশে ছড়াইয়া পড়ে। আকাশে ফুটিয়া ওঠে সাত রঙা রামধনুর নয়নাভিরাম রূপ, তারা চায় আরও গান, আরও আশা, আরও আলো।

মাঠের খবর পূর্ণদের বাড়িতেও পৌছায়। টুকুনির ভারী আনন্দ হয়। সে তখন চালতা মাখা খাইতেছিল, তার ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া মানিকদাকে খানিকটা চালতা মাখা দিয়া আসে।

দু' একদিন পরে একটু সুস্থ হইয়া বড় রাণী মানিককে জিজ্ঞাসা করে, তোরগো ঘর সারাইছ?

হ সারাইছি। না সারাইলে এবার বরষায় থাকতে পারতাম না। তিন খান খুঁটিতেও উই ধরছিল।

খুঁটিও বদলাইছ?

হ, সেই তিনখানা। চালায় নতুন ছন দিছি মায়ের টাকা দিয়া।

ভাল হইছে। ঘরখান ছিল তোর বাপ মায়ের বড় শখের। বাপের কোন খবর পাইলি?

না পাই নাই। পাঁচ জনে পাঁচ কথা কয়।

কি কয়?

বাবার নাকি আবার ফাটক হইছে।

স্বদেশী করিয়া বুঝি?

মানিক সে কথার কোন উত্তর করে না। বড়রাণী জিজ্ঞাসা করে, ঘরের জন্য দেনা হয় নাই ত?

হইছিল, বেশীর ভাগই শোধ হইছে। এখনও সাত টাকা বাকী। হারাণ জেঠা খুঁটির দাম বেশী ধরছে। বাকী বলিয়া সুদ নেয় টাকায় দু' পয়সা।

আবার হারাণের খপ্পরে পড়ছ।

শুধু কি আমরা? হারাণ জেঠার কাছে জমিদার তালুকদারগোও টিকি বাঁধা।

একটু থামিয়া মানিক আবার বলিল, মা ফুটু ভুঁইয়ার বাড়ির চাকুরি না ছাড়লে কর্জটা শোধ হইয়া যাইত।

তা জানি, ছোটরাণী নিজের খবর কিছু দেয় না কিন্তু তোরগো সব কথাই লেখে। সে লেখছে, ঘরামিগিরি করিয়া, কিষাণ খাটিয়া তুইই সংসার চালাও।

চালাইতে পারি না, কাজ কর্ম সে রকম নাই। তবে এর পর ভাল চলবে। মা ছোট মায়ের কাছে কলের শেলাই শেখতেছে।

সে নিজে শেখছে কোথায়?

জন কল্যাণে। শুধু সেলাই না, লেখা পড়াও শেখতেছে। নিজে শেখে আবার পাঠশালায় মাইয়াদের পড়ায়।

গান বাঁধিয়া তোর কিছু রোজগার হয় না?

না, বড়মা। লক্ষ্মী সরস্বতীর ঝগড়া চিরকালের।

তোর জেঠারে ত সগলডি কইত সরস্বতীর পুত্তুর। তিনি কিন্তু টাকার জন্য কোন কেলেশই পায় নাই বরং রাজার মত কাটাইয়া গেছে।

স্বামীর সম্পর্কে বড় মার এই গর্বে মানিক মনে মনে হাসে। পাছে সে কোন আঘাত পায় এই জন্য বলে, তানার কথা আলাদা। তানার শক্তি আমি পাব কোথায়? পাইলেও পাব আর দশ বিশ বছর পরে।

বড়রাণী খুশি হইয়া বলিল, তা ঠিক। তানার ক্ষ্যামতা ছিল একটা দেখার মতন জিনিস। কথায় কথায় ছড়া বাঁধিত। আমাগো দুই-জনরে লইয়া কত গান বাঁধছে।

আর একদিন ছোটরাণীর প্রশংসা করিতে করিতে বড়রাণী বলিল, পোড়া কপালীর জনম্ হওয়া উচিত ছিল ভদ্দর লোকের ঘরে।

মানিক বলিল, একথা শোনলে আমার কিন্তু রাগ হয়, বড়মা! আমরাই বা পচিয়া গেলাম কিসে?

পচিয়া যাব কেন? তবে বেরাহ্মন, কায়েস্থ এরা হইছে ভগবানের মুখ আর হাতের থা।

আর আমরা—মানিক কথাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল, আমরা হইছি তানার ব্রহ্মতালু ফুঁড়িয়া।

ভয়ে বড়রাণীর মুখ ছাইয়ের মতন ফ্যাকাশে হইয়া যায়। সে দুই কানে আঙুল দিয়া বলে, ছিরি বিষ্টু, ছিরি বিষ্টু।

মানিক অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া রাখে।

জামুলায় তার থাকার কথা ছিল দুই তিন দিন। কিন্তু তিনটা সপ্তাহ কাটিয়া গেল। সে যাওয়ার কথা তুলিলেই বড়মা বলে, বুঝি, তোর যাওয়া দরকার। কিন্তু আর দুইটা দিন থাক্, আমার আর একটু ভাল হউক।

একদিন মানিক তার বড়মার ঘরের সামনে দিয়া যাইতেছে এই সময় তার কানে গেল পূর্ণর কণ্ঠস্বর। সে বড়রাণীকে বলিতেছিল, মাইনকার সঙ্গে টুকুনির বিয়া দিলে কেমন হয়?

বিবাহ সম্বন্ধের কথা শুনিয়া মানিক দাঁড়াইয়া যায়। আজ বোঝে যে ঐটুকু মেয়ে টুকুনি তাকে দেখিয়া লজ্জা করে কেন।

মানিকের বড়মা কি যে উত্তর করিল বোঝা গেল না। পূর্ণ বলিল, অরেগো মানাবে হর পার্বতীর মতন। দুই জনেই সোঁদর, একজন

যেন গৌরী আর একজন মহাদেব। আর তাছাড়া তোরা আমার পালটা ঘর।

বড় রাণী আবার যেন কি বলিল, উত্তরে পূর্ণ বলিল, অবস্থা আজ হীন হইছে। কিন্তু ভাল হইতে কতক্ষণ! মানিক ছাওয়াল খাসা, একটু সাহায্য পাইলেই দাঁড়াইয়া যাবে।

বড়রাণী বলিল, তা ঠিক। ছাওয়াল না যেন চকমকির পাথর। শীতল পণ্ডিত কইত, লেখা পড়া শেখলে ও ভদ্দর হইতে পারত। বাপেরও ইচ্ছা ছিল পড়াবার কিন্তু পোড়া লড়াইর জন্য হইল না।

আর বাপের কথা ছাড়িয়া দেও, বরিশালে ঐ কেলেঙ্কার করল, এবার কলকাতায় যাইয়া নাকি চুরি করিয়া ধরা পড়ছে।

মানিকের বুকের ভিতরটা ঢিবঢিব করিতে থাকে।

বড়রাণী এবার জোর গলায় বলিল, মিছা কথা। ও আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না। গোকুল সব করতে পারে কিন্তু চুরি করতে পারে না।

পূর্ণ বলে, আমারও শোনা কথা। কইছে জ্ঞাতি বাড়ির কালিদাস। সে বড় মিথ্যা কথা কয়, তাছাড়া চোক্ষেও ভাল দেখে না। কি দেখতে কি দেখছে।

বড় রাণী বলিল, কি দেখেছে সে?

পূর্ণ বলিল, দেখছে পুলিস তারে—বাকীটা মানিকের কানে গেল না।

পূর্ণ ভগ্নীর ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলে মানিক বড় মাকে জিজ্ঞাসা করিল, বড়মামা বাবার কথা কি কইতেছিল?

আমাগো জ্ঞাতি কালিদাসের কাছে কিসব শোনছে, মানুষটা ভারী মিথ্যুক তার উপর চোখেও ভাল দেখে না।

বাবার বিষয় মিছা কবে কেন? সে কইছে কি?

কি যে কইছে আমি ঠিক বলতে পারব না, বাবা।

মানিক দেখিল বড় মা কথাটা এড়াইয়া যাইতেছে। সে তাই পূর্ণকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, আমাগো জ্ঞাতি কালিদাস বাড়ৈ কলকাতার রাস্তায় গোকুলের মতন একজন লোকরে দেখছে। তারে পুলিস নিয়া যাইতেছিল। সে বোধ হয় গোকুল না।

মানিক এবার দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, আপনে ঠিক ঠিক কন। চাপিয়া যাবেন না।

পূর্ণ একটু ইতস্তত: করিয়া বলিল, সেই মানুষটারে চোর চোর বলিয়া রাস্তার লোকে মারিতেছিল, এই সময় আইল পুলিস।

মানিকের মুখ ম্লান হইয়া যায়। রাস্তার লোকে তার বাবাকে চোর বলিয়া মারিয়াছে। পুলিসে গ্রেপ্তার করিয়াছে। গুজবটা সে দেশেও শুনিয়াছিল। কিন্তু এত সুস্পষ্ট নয়। আজ শুনিল এক প্রত্যক্ষদর্শীর মুখের কথা। সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনে নিজে কালিদাসের কাছে শোনছেন?

পূর্ণ ধীরে ধীরে বলিল, হ বাবা!

সে কোন্ বাড়ির লোক?

বাড়ৈ বাড়ির।

মানিক আর আর কোন কথা বলিল না। তার মনে পড়িল অনেক কিছু। তাদের দুঃখ কষ্ট, অভাব অভিযোগ। সবচেয়ে বড় হইয়া উঠিল তার বাবার বরিশাল জীবন। শুধু লড়াই নয়, তার বাবার বরিশালের উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাত্রাও তাদের দুর্দশার একটা বড় কারণ। গ্রামের পাঁচজনের মুখে মুখে সেই কাহিনীর যেটুকু মানিকের কানে আসিয়া পৌছিয়াছিল তাহাতেই পিতাকে সে ক্ষমা করিতে পারিত না—যদি না গোকুল '৪২ এর আন্দোলনে দেশের মুক্তির জন্য জেল খাটিত।

কিন্তু আজ এ কী! তার বাবা কি তবে অভাবে পড়িয়া চুরি করিল, না তার স্বভাবই এইরূপ হইয়া গিয়াছে!

মানিক সেইদিনই বাড়ৈ বাড়িতে গেল কিন্তু কালিদাসের কোন খবর পাইল না। শুনিল লোকটা যাযাবর প্রকৃতির। আজ বর্ধমান, কাল টাটানগর, পরশু কলিকাতা যখন যেখানে আশ্রয় পাওয়ার সম্ভাবনা সেইখানে যাইয়া নিজের অস্থায়ী আস্তানা গড়িয়া লয়।

কি যে করিবে মানিক ঠিক বুঝিয়া পায় না। এক একবার মনে হয় পূর্ণ মামা বড় মানুষ। তার বাবা চোর জানিয়াও সে তার সঙ্গে নিজের মেয়ের বিবাহ সম্বন্ধ প্রস্তাব করে কেন? হয়ত সে নিজেই গুজবটা বিশ্বাস করে না।

খানিকক্ষণ পরে সে তার কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কালিদাসের কথা আপনি কি বিশ্বাস করেন, মামা?

পূর্ণ কহিল, না, বাবা, মোটেই বিশ্বাস করি না।

পরদিন সকালে মানিক বড়মাকে বলিল, তুমি ত একটু ভাল আছ, আমি এবার দেশে যাই।

বড়রাণী বুঝিল তার বাবার সম্পর্কে কালকের আলোচনার পর সে আর এ বাড়িতে থাকিতে চায় না। সে তাই বাধা দিল না। শুধু বলিল, আমার অসুখ বাড়লে আসিস কিন্তু।

বাড়লে নিশ্চয় আসব। কিন্তু তোমার আর বাড়বে না।

আর একটা কথা ছিল।

কি কথা?

দাদার ইচ্ছা টুকুনির সঙ্গে তোর বিয়া দেয়।

বিয়া! আমার আর টুকুনির? হা-হা—মানিক এমন ভাবে হাসিতে আরম্ভ করে যাতে বড় রাণী অপ্রতিভ হইয়া যায়। সেও সেই হাসিতে যোগ দেয়।

বিবাহের প্রসঙ্গ সে এই ভাবে চাপা দিল বটে কিন্তু তার রওনা হওয়ার সময় ছোট্ট আর একটি ঘটনা ঘটিল।

ঘাটে নৌকা তৈরি। পারে সুধন্য দাঁড়াইয়া। পাশে বাড়ির মেয়েরা। মানিক গুরুজনদের প্রণাম করিয়া নৌকায় উঠিবে এমন সময় দেখে পিছনে অপরাজিতা গাছের তলায় ডুরে শাড়ী পড়িয়া টুকুনি দাঁড়াইয়া আছে। উভয়ে চোখা চোখি হইল আর সকলের অলক্ষ্যে টুকুনি কচি হাত তুলিয়া তাকে ছোট্ট একটি কিল দেখাইল।

মানিক তাকে বিবাহ করিতে না চাওয়ায় সে রাগ করিয়াছে।

বত্রিশ

মানিক ঘাঘর পর্যন্ত নৌকায় আসিয়াছিল। তারপর হাঁটা পথে। বাড়ির সামনে সাঁকোর মাঝখানে আসিয়া দেখিল শিরীষ গাছের তলায় তার বাবা দাঁড়াইয়া আছে। তার বুকের ভিতরটা ঢিবঢিব করিতে লাগিল। সাঁকোর উপর হইতেই সে ডাকিল, বাবা। তার গলা কাঁপিয়া গেল। স্বর স্পষ্ট বাহির হইল না।

গাছের ডাল ধরিয়া গোকুল কাঁপিতেছিল। শীর্ণ শরীর, চোখের চাহনি অর্থহীন, মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে, মুখ দিয়া লালা গড়াইয়া পড়ে—জোয়ান গোকুল মাঝির জীর্ণ অবশেষ।

তার সামনে আসিয়া মানিক কাঁদিয়া ফেলে। একটুক্ষণ ছেলের দিকে চাহিয়া থাকিয়া গোকুল ক্ষীণকণ্ঠে বলে, মা-আ-নিক। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরিবার জন্য একখানা হাত বাড়াইয়া দেয়। মানিক ঝাঁপাইয়া পড়ে তার বুকের মধ্যে। তাকে জাপটাইয়া ধরিয়া গোকুল বাষ্পার্দ্র কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল, বাবা, বাবা।

গোকুলের চোখ দিয়া তখন অঝোরে জল ঝরিতেছে।

ঘরে যাইয়া মানিক মাকে প্রশ্ন করিল, বাবা আইছে কবে ?

আজ চার দিন। ঐ বাড়ির বারিবালা লইয়া আইছে।

সব সময়ই কাঁপে আর মুখ দিয়া নাল পড়ে ?

না, কাঁপুনি ওঠে দিনে দুই তিন বার সেই সময় নাল পড়ে।

মানিক সারাটা দিন তার বাবাকে লক্ষ্য করিল। দেখিল বর্তমানের কোন জিনিসই তার মনে রেখাপাত করে না। শুধু খাওয়ার সময় ক্ষুধার কথা বলে, তাছাড়া প্রায় সব ব্যাপারেই নির্বিকার। কিন্তু অতীতের প্রায় সব কিছুই চেনে, ভালবাসে। কুমিকে আদর করে। তাদের মায়ের হাত ধরিয়া তার দিকে আকুল চোখে চায়।

এইরূপ হইল কেন, কিভাবে হইল, কতদিন সে এরকম কষ্ট পাইতেছে, এই সব ভাবনা মানিকের মনকে তোলপাড় করিয়া তুলিল।

চার দিন আগে। রাত আন্দাজ আটটা, কুমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ছোটরাণী ও গোলাপী উঠানে বসিয়া গল্প করিতেছিল। উঠিল ভীমের কথা। ছোটরাণী বলিল, তুই তারে ভালবাস, সেও বাসে অথচ পোড়া সমাজের জন্য তোরগো মেলার উপায় নাই।

গোলাপী জায়ের হাত ধরিয়া বলিল, তুমি চুপ কর দিদি, চুপ কর।

ভীমকে লইয়া তার মনে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, একদিকে স্বামীর বরিশাল জীবনের স্মৃতি, তার ধোঁয়াটে বর্তমান, অপর দিকে ভীমের আত্মভোলা ভালবাসা। তাকে বেশ লাগে, পাইতেও হয়ত ইচ্ছা করে কিন্তু গোলাপী এই সত্যটার সম্মুখীন হইতে ভয় পায়। চায় উহা এড়াইয়া চলিতে।

ছোটরাণী বলিল, তোর ভয় অসতী হওয়ার ? যারে ভালবাসো তার কাছে খাঁটি থাকলেই সতী।

গোলাপীর মুখ কেমন যেন সাদা হইয়া গেল। সে বলিল, মানিক আমার বড় হইছে, অমন কবিদার ছাওয়াল। সে কোন রকমে টের পাইলে আমি খালে যাইয়া ডুবিয়া মরব।

ছোটরাণী হাসিয়া বলিল, তোরা মাইয়ারা হইলি পাগলের জাত, এক পাগল ছিল পিসি—সতী পাগলা। আর এক পাগল তুই, ছাওয়াল পাগল।

গোলাপী বলিল, অত বুঝি না। আমি বুঝি সোয়ামী, ছাওয়াল মাইয়া লইয়াই মাইয়া মানুষ।

ছোটরাণী বলিল, তুই হইলি জন্মদাসী—তোর সঙ্গে আমার বনবে না।

এই সময় খাল ঘাটে কে যেন ডাকিল, ও গোলাপ মামী। ও মাইন্‌কার মা।

গলাটা সিধুর মতন। সে কলিকাতায় গিয়াছিল। কাল পর্যন্ত ফেরে নাই। আজ ফিরিয়াই খাল ঘাটে আসিয়া তাকে ডাকে কেন? গোলাপী বাহিরে আসিয়া দেখে ঘাটে একখানা নৌকা বাঁধা তার সামনের গলুইয়ে সিধু হারিকেন লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গোলাপী ডাকিল, কি ভাগনা?

সিধু বলিল, কলকাতার থা গোকুল মামারে লইয়া আইছি। তারে তুলিয়া নিয়া যাও।

গোলাপীর বুকের ভিতরটা ঢিবঢিব করিতে থাকে। সে ঘাটের কাছে আগাইয়া গিয়া দেখে তার স্বামী ছইয়ের সামনের দিকে বসিয়া তার পিছনে বারিবালা।

সিধু ও মাঝি ধরাধরি করিয়া গোকুলকে তীরে তুলিয়া আনিল। সে তখন একটু একটু কাঁপিতেছে।

সিধুর হাত হইতে আলোটা নিয়া স্বামীর মুখের সামনে ধরিয়া

গোলাপী তার দিকে চাহিয়া থাকে। গোকুলও ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকায়, তার মুখ দিয়া একটু একটু লাল পড়ে।

গোলাপীর চোখ জলে ভরিয়া যায়। সে জিজ্ঞাসা করে, চেন না আমারে?

গোকুল ধীরে ধীরে বলে, গো-ও-লা-প।

গোলাপী বারিবালাকে জিজ্ঞাসা করিল, এরকম হইছে কতদিন?

বারিবালা কহিল, আমি জানি না।

তুমি, তুমি ওরে পাইলা কোথায়?

গঙ্গার ঘাটে। আজ এখন যাই, কাল পরশু এসে বলে যাব।

বারি সেদিন আর দেরি করিল না। তাদের নৌকা ছাড়িয়া দিলে পঙ্গু স্বামীর হাত ধরিয়া গোলাপী অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিল। তার মনে হইল বাহিরের অন্ধকারটা যেন হিংস্র এক জানোয়ার। তার কালো থাবা দিয়া সে তাকে ধরিতে চায়। গোলাপী নিজের বুকের উপর, মুখের উপর তার ভয়াল স্পর্শ অনুভব করে।

পরের দিন দুপুরেই বারিবালা আসিল। কলিকাতার পতিতা জীবন শুরু হওয়ার পর আসিল এই প্রথম। গত রাত্রের কথা ধরিলে এই দ্বিতীয় বার। গোলাপী সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল! দু'চারটা অবান্তর কথার পর জিজ্ঞাসা করিল, তোমার মামারে তুমি পাইলা কোথায়?

বারিবালা বলিল, গঙ্গার ঘাটে। রোজই আমি জগন্নাথ ঘাটে নাইতে যাই। সেদিন নিমতলার কাঠগুদামে বাবুর কাজ থাকায় নিমতলা ঘাটে গিছলুম। স্নান করে রাস্তায় এসে ভিক্ষুকদের পয়সা দিচ্ছি, তারা সার দিয়ে বসে আছে। প্রত্যেকের সামনে একখানা করে নেকড়া পাতা। তারা চেঁচাচ্ছে, একটা পয়সা দে দেও রাধ।

কেউ রাম নাম, কেউ বা হরিনাম করছে। কয়েকজন বুক চাপড়াচ্ছিল।

প্রত্যেকের সামনেই কিছু না কিছু পড়েছে। শুধু একটি মানুষ চুপ করে বসেছিল। চেঁচাতে পারে না ব'লে তার সামনে ভিক্ষাও বিশেষ কিছু পড়ে নি। কাছে গিয়ে দেখি লোকটি গোকুল মামা— বলিতে বলিতে বাঁরিবালার চোখ জলে ভরিয়া গেল। গলা ভারী হইয়া আসিল।

একটুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে আবার বলিল, কি যে করব ঠিক করতে না পেরে মামার সামনে একটা টাকা দিলুম।

পাশেই একটি মেয়ে ছেলেকে মাই দিচ্ছে। সে ছেলের হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, এই কচি হাতে দাও মা।

একটু দূরে বসেছিল পায়ে ন্যাকড়া জড়ানো নাক কান ফুলো এক কুঠে, সে বলে উঠল, কী চোখ বাবা, আমাদের দিকে নজর পড়ল না। দয়া হল ঐ চোর শালার উপর? মার খেয়ে শালার কাঁপুনি ব্যামো হয়েছে, ঘেন্নায় পুলিসও জেলে পাঠায় নি।

পর পর ক'দিন নিমতলার ঘাটে গিয়ে অন্ধ ভিখারীদের কাছে শুনলুম, কে একজন আছে তার কারবার ঐ ভিক্ষুকদের দিয়ে ভিক্ষা করানো। গোকুল মামা, কুঠে, ছেলে-কোলে মেয়েটি এরা তার মূলধন। এরকম আরও অনেক। সে এক এক দলকে এক এক জায়গায় বসায়। এদের কজনকে সকালে এই রাস্তায় রেখে যায়। দুপুরের পর ঐখানে ভিক্ষে পাওয়া যায় না, তখন নিয়ে যায় বড় বড় চৌরাস্তার মোড়ে। সকালে গঙ্গার ধারে আসার আগে দুমুঠো ভাত দেয়। রাত্রে দেয় দু'একখানা চপাটি। কোনদিন বা ছাতু আর লঙ্কা। রোজগার কম হলে মারে।

গোলাপী জিজ্ঞাসা করিল, অন্ধেও মারত?

বারিবালা কোন উত্তর করিল না।

গোলাপী আবার জিজ্ঞাসা করিল, এরকম হইছে কি করিয়া কইতে পার?

বারিবালা বলিল, হয়েছে মার খেয়ে। সে অবশ্য শোনা কথা।

মাইর খাইয়া! মারল কেডা?

রাস্তার লোকে চোর চোর বলে মারছিল, পুলিস না সৈন্য কারা যেন তাদের হাত থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়, সেখান থেকে ঐ লোকটার খপ্পরে পড়েছে—বলিতে বলিতে বারিবালা উত্তেজিত হইয়া ওঠে।

তার এই উত্তেজনা গোলাপী লক্ষ্য করিল না। সে ধীরে ধীরে আওড়াইতে ছিল, চোর চোব। শেষটায় চোর বলিয়া—

ছোটরাণী বলিয়া উঠিল, তুই ত ভারী বোকা। অমনে চোর চোর আওড়াইতে শুরু করলি। তুমি কার কাছে শোনলা, ভাগনি?

বারিবালা উত্তর করিল, যে ওদের দিয়ে কারবার করাতো, শুনেছি তার কাছে। তাকে কিছু দিতেও হয়েছে, তাছাড়া আমার বাবু লোকটাকে ভয় দেখিয়েছিল।

গোলাপী বলিল, লাগছে কত?

সে খুব সামান্য।

বারিবালা চলিয়া যাওয়ার সময় গোলাপী বলিল, তোমার এই দেনা জীবনে শোধ করতে—

বারিবালা বলিল, অত হিসেব নিকেশ করে কি চলা যায়? রইলই বা কিছু দেনা।

গোলাপীর আজ মনে হয় এই মেয়েটিকে কি ভুলই না বুঝিয়াছিল। সে চলিয়া গেলে গোলাপী বলিল, ও যে এত ভাল জানতাম না দিদি।

ছোটরাণী বলিল, মাটির গর্ভে কয়লা আছে কি সোনা আছে তা বোঝা যায় খাদ কাটার পর। বারির ভিতরেও সোনা আছে। ও যে ভালবাসে।

কি রকম?

নেকী। জানিস্ না যে ঠাকুরপোরে ও ভালবাসত? এখনও তার রেশ আছে। ভালবাসা নদীর মতন, আর একদিকে মোড় ফেরলেও একটা ধারা থাইক্যা যায়। হয়ত থাকে মাটির নিচে। কিন্তু মাটি খুঁড়িয়া দেখ্, জল বাইর হবে।

গোলাপী তার অনেক কথা বোঝে না। মনে হয় হেঁয়ালি। কিন্তু আজকের এই কথার অর্থ বুঝিল, তার কাছে এগুলি খুবই সহজ সরল। সেও যে ভালবাসে।

পঙ্গু এই মানুষটি প্রেমের সেই ফল্গুধারা যেন মাটি খুঁড়িয়া বাহির করিল।

সব শুনিয়া মানিক বলিল, জামুলায়ও এই কথাই শুনছি।

গোলাপী বলিল, তারা জানল কি করিয়া?

পুর্ণ মামার কাছে তার এক জ্ঞাতি কইছে, আমি খোঁজ করছিলাম, লোকটা এখন দেশে নাই। তবে শোনলাম, সে নাকি ভারী মিথ্যুক।

গোলাপী বলিল, মিথ্যুক একশ বার।

সেইদিনই রাত্রে গোকুলের চীৎকারে মানিকের ঘুম ভাঙিয়া যায়। গোকুল চেঁচাইতেছে, ওরে তোরা আয়, কাড়িয়া খা-আসিয়া। শিয়াল কুকুরের মতন রাস্তায় পড়িয়া থাকবি, তার খা একদিন পেট পুরিয়া খা।

মানিক দেশলাইর কাঠি জ্বালাইয়া দেখে তার বাবা দরমার চাটাইয়ের উপর দাপাদাপি করিতেছে। তার চোখ দু'টা লাল,

মুখ দিয়া লালা গড়াইয়া পড়ে। তার মা স্বামীর মাথায় জল দেয়, হাওয়া করে আর বলে, চুপ চুপ, মাইনকার ঘুম ভাঙবে।

গোকুল গর্জন করিয়া উঠিল, আইলি না? দূর্ শালারা। মর্, পচিয়া মর।

মিনিট কয়েক পরে দাপাদাপির চেঁচামেচি থামিল। সঙ্গে সঙ্গেই গোকুল ঘুমাইয়া পড়িল।

সব নীরব। মানিক ঘরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি যেন ভাবে, খানিকটা পরে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ডাকে, মা তুমি ঘুমাইছ?

গোলাপী বলে, না রে।

বোঝলা ব্যাপার খান?

কী ব্যাপার?

আমি একটা হদিস করতে পারছি। বাবা চুরি করে নাই।

করে নাই? তাত করেই নাই। আমি জানি কিন্তু তুই বুঝলি কি করিয়া?

গোলাপীর কণ্ঠে প্রকাশ পায় ব্যগ্র উল্লাস ও কৌতূহল।

মানিক বলে, কলকাতার পথের উপরে মানুষ না খাইয়া শুকাইয়া থাকত। পাশেই রাশি রাশি খাবার। দেইখ্যা বাবা মানুষগুলারে ডাকছিল, তোরা আয়, কাড়িয়া খা আসিয়া। মারামারি, থানা পুলিস সবই সেই জন্য। অসুখও করছে তার ফলে।

গোলাপী বলিয়া উঠিল, ঠিক, ঠিক কইছ। দয়াল মানুষ, পরের দুঃখ কোন দিনও সহ্য করতে পারে না। মানুষ না খাইয়া মরছে দেইখ্যা আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়ছিল।

মা ও ছেলে এই ভাবে একটা সান্ত্বনা খুঁজিয়া বাহির করিল।

তেত্রিশ

ফুটু ভুঁইয়াদের দোকান হইতে লোকে প্রথমদিন যে অভিজ্ঞতা লইয়া ফিরিয়াছিল দিনের পর দিন সেই অভিজ্ঞতাই তিক্ত হইতে লাগিল। তার দোকানও বিশ্বের দোকানের মতনই চলে। কেহ মাল পায়, কেহ পায় না। কেহবা এক সেরের জায়গায় পায় এক পোয়া।

দেখিলে মনে হয় লটারির খেলা কিন্তু এই লটারির একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। নিয়ম ধনীর বেলায় একরকম, দরিদ্রের বেলায় অন্যরূপ।

দেড় মাইল দুই মাইল দূর হইতে লোক আসে। কেহ নৌকায়, কেহ হাঁটাপথে, কেহ বা খালবিল সাঁতরাইয়া।

সেদিন এক বৃদ্ধা চাউলের জন্য দেড় মাইল পথ তালের ডোঙায় করিয়া আসিয়াছিল। বেচারীকে অনেক কচুরি পানা ও ধাপদল ঠেলিতে হইয়াছে। এক ঘণ্টার বেশী অপেক্ষা করার পর সে শুনিল, আরে যাঃ—এই মাত্তর চাল ফুরিয়ে গেল, বুড়ী।

বৃদ্ধা বলে, এর থা তোমরা আমার মাথায় এট্টা বাড়ি মার।

সকলের চোখ পড়ে তার উপর। শীর্ণ মূর্তি, মুখের এমন কি ভ্রূর চামড়াও ঝুলিয়া পড়িয়াছে। মাথার চুল সব সাদা।

অনুকূলহরি বলিল, কি বুড়ী মা, কাঁদ কেন ?

বৃদ্ধা বলিল, পোড়া খোদার কি চক্ষুও নাই ?

এন্তাজ বলিল, খোদা আবার তোমার লগে করল কি বুড়া ?

আর করছে ! আমার নাতি ইয়াসিনের অসুখ। কবিরাজ কইছে তারে ভাত দিতে। কাল দিতে পারি নাই। এই চাউল নিয়া সিদ্ধ করিয়া দেব ভাবছিলাম।

অনুকূল বলিল, তুমি বুঝি 'এ' কেলাস ?

অত জানি না। আমার হইল চাউলের টিকিস।

হরনাথ বলিল, এই একটু আগে চাল ফুরিয়ে গেল।

এখন কি কব যাইয়া ইয়াসিনরে? কী কাঁদনডাই না বাছা কাঁদবে!—বলিয়া বৃদ্ধা নিজেই কান্না জুড়িয়া দেয়। কাঁদে আর বলে, ও আমার ইয়াসিন রে, তুই খাস্ না আজ কতদিন।

অনুকূলহরির বাড়ি কাছেই, সে বাড়ি হইতে এক পোয়া আন্দাজ চাল আনিয়া দিলে তবে বৃদ্ধা থামে, অনুকূলকে আশীর্বাদ করে, তোর চার চারটা ছাওয়াল হৌক ইয়াসিনের বাপের মতন।

অনুকূল বলিল, একটা ছাওয়ালরেই খাইতে দিতে পারি না, আবার চারটা। ও আশীর্বাদ করিও না, বুড়ী।

শরৎ শীল হরনাথকে বলিল, বেশ আছ আপনারা। এক মুঠি চাউলের জন্য মানুষ মরিয়া যায়, আপনারা খাসা ভোজ চালাও। চা খাও দিনে পাঁচ বার আর আমরা রুগির বার্লিকে এট্টু চিনি দিতে পারি না।

হরনাথ বলিল, চিনির বেলা আমরাও ঢুঁ ঢুঁস। ভাগ্যিস ছোট কাকা বাগান থেকে কনডেস এনেছিল। তাই দিয়ে কোন রকমে চালিয়ে নিচ্ছি।

রেশনের জিনিস বিলির ব্যাপারে পাশের ইউনিয়নের হটু মিঞারও দুর্নাম ছিল। বিশ্ব এবং রামনাথ তাকেও হারাইল। হটু মিঞা তবু নিজের জাতের লোকের সুখ সুবিধা দেখে কিন্তু এদের সেই বালাইও নাই। তারা বলে, আমরা হলুম সমদর্শী। হিঁদু মোছলমানে কি তফাৎ করতে পারি ?

লোকের ধৈর্য যখন সীমা ছাড়াইবার উপক্রম সেই সময় হঠাৎ রেশনের অব্যবস্থার উপর চোরা বাজারের উপর পুলিসের নজর

পড়িল। শুরু হইল ধরপাকড়। প্রথমে ধরা পড়িল বিশ্বর দোকানের চাকর দুঃখীরাম।

সে থাকে বৃদ্ধা মাসীর সঙ্গে। মাসীর নাম তারকবালা। মা বাপ হারা বোনপোটিকে সে নিজের ছেলের মতনই মানুষ করিয়াছে।

একদিন ভোরে জুতার মশ মশ শব্দে তার ঘুম ভাঙিয়া যায়। সে ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়া চাহিয়া দেখে দক্ষিণ দিকের ঢালু জমি বাহিয়া কয়েকটি মানুষ তাদের উঠানে উঠিতেছে।

আকাশ তখনও পরিষ্কার হয় নাই। বাহিরে মেটে মেটে আলোয় লোকগুলির মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। একটু লক্ষ্য করিয়া তারকবালার মনে হইল সামনের লোকটি চৌকিদার রহম। তার সঙ্গে পাগড়ি পরা লাঠি হাতে কয়েকটি লোক। দলের পিছনে দু'জনের মাথায় টুপি, কোমরে কি যেন ঝুলিতেছে।

তারকবালার ভয় করে এত ভোরে পুলিস আসিয়াছে কেন? কি মতলবে? সে মা মনসাকে স্মরণ করে। সিদ্ধান্ত খোলার মহাদেব, পশ্চিম পাড়ের কালী, প্রতাপাদিত্যের গোবিন্দ, মনে মনে পরগনার সকল জাগ্রত দেবতার নাম আওড়ায়।

রহম ডাকিল, ও দুঃখীরাম, দুইখ্যা—

তারক বলিল, সে ঘুমাইতেছে তারে ডাক কেন?

টুপিওয়ালাদের মধ্যে সামনের লোকটির বয়স কম, সে চীৎকার করিয়া উঠিল, ড্যাম ইট্।

ড্যাম ইট্ না যেন বোমার শব্দ। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ার উপর লাথি পড়ে। দুঃখীরামের ঘুম ভাঙিয়া যায়।

রহম বলিল, মহকুমার পুলিস সাইব্ আইছেন আর থানার ছোট বাবু। তাড়াতাড়ি ঝাঁপ খোল্।

ভয়ে দুঃখীরামের গলা শুকাইয়া যায়। সে ঝাঁপ খুলিয়া দিলে মহকুমা হইতে আগত অফিসার অবাক হইয়া যান। তিনি ভাবিতে পারেন নাই যে দুঃখীর বয়স এত কম। তাঁর মনে হয় কোথায় যেন ভুল হইয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর নাম দুঃখীরাম?

দুঃখী বলিল, আজ্ঞা কর্তা।

রহম বলিল, কতা নয়, হুজুর।

দুঃখীরাম বলিল, হ, হুজুর।

অফিসার বলিলেন, ভয় নেই কিছু। যা জিজ্ঞেস করব তার ঠিক ঠিক জবাব দিবি।

দেব হুজুর।

তুই বিল্ব ঘোষের রেশনের দোকানে কাজ করিস?

করি হুজুর।

কি কাজ?

দোকানের কাজ করি, গরু রাখি। বাবুর বউর ফিট হইলে তার মাথায় কলস কলস জল ঢালি। কখনও হাওয়া করি, হুজুর।

দোকানের কি কি কাজ করতে হয়?

মাল ওজন করিয়া খরিদদারগো দি হুজুর।

বার বার হুজুর হুজুর করতে হবে না। তোর বাপকে ডাক।

তারকবালা বলিল, অর বাপ মা নাই। আছি খালি আমি।

তুমি কে?

আমি অর মাসী তারকবালা। আমার শশুর বাড়ি খাঁদারপাড় দ্বারিক কবিরাজের দেশে। শশুর বাড়ির তানারগো গরু ছিল চারটা, দুইটা বলদ।

সে কথা থাক্। আমি এসেছি তোমার ঘরে খানাতল্লাশি করতে। ঘরে চোরাই মাল আছে।

চোরাই মাল! ভাতের হাঁড়ি নামাবার নেতা আর একখানা কুলা ছাড়া কিছুই নাই।

কিন্তু থানা তল্লাশির ফলে ঘরে পাঁচ জোড়া মিলের কাপড় পাওয়া গেল। দুঃখীরাম যে দরমার চাটাইয়ের উপর শুইয়াছিল, সেগুলি ছিল তার তলায়। থানার ছোট দারোগার মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল এ খবর তিনি জানিতেন।

তারকবালা চীৎকার করিয়া উঠিল, দুইখ্যা আমার নির্দ্দুষী হুজুর। কোন্ মুখ পোড়া মড়া শকুন যেন শত্তুরতা করিয়া গেছে।

টুপিওয়ালা আবার গর্জন করিয়া উঠিল, ড্যাম ইট্।

ওঃ বাবা—বুড়ী ভয়ে আঁতকাইয়া ওঠে।

ছোট দারোগা দুঃখীকে জিজ্ঞাসা করিল, এ কাপড় পেলি কোথায়?

দুঃখীরাম কোন জবাব করে না। অফিসার ধমক দেন, বল্ বল্। তাহাতেও ফল না হওয়ায় ছোট দারোগা দুঃখীর গালের উপর ঠাস করিয়া এক চড় মারে। দুঃখী বলে, কইতেছি, কইতেছি হুজুর।

বল্ বল্—ছোট দারোগা আবার চড় মারার জন্য হাত তুলিতেই দুঃখী বলিল, চৌধুরী বাড়ি পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য বিশ্ব বাবু এই কাপড় দিছে।

অফিসার প্রশ্ন করেন, কেন, পৌছে দেয় কেন?

চৌধুরীরা বেশী দাম দেয়।

আর কোন্ কোন্ জায়গায় মাল পৌছে দিস্?

দুঃখী কয়েকজনের নাম করিল। তার বেশীর ভাগই বিভিন্ন হাট বাজারের দোকানদার। অফিসার নামগুলি নোটবুকে টুকিয়া নেন।

প্রত্যেক জোড়া কাপড়ের ভাঁজেই চিহ্ন দেওয়া ছিল। দুঃখীরাম সেই চিহ্নের অর্থ বুঝাইয়া দেয়, আড়াআড়ি লাইনে দু'টাকা, সোজা

লাইনে এক টাকা, ফুটকিতে একসিকি। হিসাব করিয়া দেখা গেল কণ্ট্রোলের দামের চেয়ে অনেক বেশী।

অফিসার বলিলেন, এর জন্যে তুই কি পাস্?

কেউ কেউ দুই চার আনা দেয়। কেউ দেয়ও না।

তারকবালা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। সে এবার কর্কশ স্বরে বলিয়া উঠিল, আমারে ত সে পয়সার কথা কও নাই। কি করছ সেই পয়সা দিয়া?

বাজারে জিলাপী আর রসগোল্লা কিনিয়া খাইছি।

এর মধ্যেই আমারে ফাঁকি দিতে আরম্ভ করছ? আচ্ছা, এ ছাওয়ালের কি ভাল হইতে পারে, হুজুর?

অফিসার বৃদ্ধাকে ধমক দিলেন, চুপ। তার পর দুঃখীরামকে প্রশ্ন করিলেন, সেদিন নৌকো করে কেরোসিন নিয়ে নন্তের হাটে গিছলি?

হ। বিপিন মুদিরে দিতে।

কেরোসিন ছিল কয় টিন?

ছয় টিন, হুজুর।

বিষের দোকানের মাল?

না, হুজুর। নন্দীগো পিছনের ডোবায় লুকানো ছিল। ধাপের নিচে।

সঙ্গে আর কে ছিল?

ছিল জঙ্গল মাঝি।

রহম বলিল, বোবা জঙ্গল?

হ কর্তা। জঙ্গল আর আমি ছাড়া কেউ ছিল না।

আরও অনেক খবর পাওয়া গেল। নন্দীরা পয়সার হাটের কমল শার কাছে প্রায়ই কাপড় বেচে, পালদির বেনেরা মাসে দুই তিন বার বস্তায় বস্তায় নুন চিনি লইয়া যায়।

অফিসার দুঃখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দোকানে তোর আর কি কি কাজ করতে হয়?

আমারে কইতে নিষেধ করছে। কইলে নাকি হারাণ বাবু খুন করবে, ছিরি বিষ্টুর নামে কিরা করছে।

ছোট দারোগা শূন্যে হাণ্টার ঘুরাইয়া শব্দ করার সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখী বলিল, মারবেন না, মারবেন না হুজুর, চাউলে কাঁকর মিশ্শাই, লবণ আর চিনিতে দেই জলের ছিটা।

থানা তল্লাশির খবর শুনিয়া গ্রামের অনেকেই আসিয়া জড় হইয়াছিল। এস্তাজ জিজ্ঞাসা করিল, ভাল তেলে কি মিশাস রে?

এই অঞ্চলে সারষার তেলকে বলে ভাল তেল।

দুঃখীরাম বলিল, আমি মিশাই না। মিশায় নন্দীরা দুই ভাই আর তারগো ভাগিনা কলু।

পুলিস তল্লাশির সাক্ষী হিসাবে অনুকূল এস্তাজ ও আরও দু'জনকে ধরিয়া আনিয়াছিল। অফিসার তাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোমাদের মহকুমায় গিয়ে সাক্ষী দিতে হবে।

নন্দীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে হইবে শুনিয়া তাদের মুখ বিবর্ণ হইয়া যায়। পিছনের একজন চেষ্টা করে সরিয়া পড়ার অমনি ছোট দারোগা গর্জন করিয়া ওঠেন, এই।

লোকটা থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে।

অনুকূল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, এর মধ্যে আমারে কেন, হুজুর?

এস্তাজ বলিল, আমার ছাওয়ালের হইছে ম্যালেরি, বউর দস্তরসা।

অফিসার বলিলেন, বুঝেছি সবই কিন্তু তোমরা সাহায্য না করলে গভর্ণমেন্টের সাধ্য কি এই অন্যায়ের প্রতীকার করে?

এস্তাজ ও অনুকূল সমস্বরে বলিল, আমরা হইলাম নির্বেল্লিক।

পিছনের আর একজন বলিয়া উঠিল, যারে কয় সাদা মাঠা মানুষ।

পিছন হইতে অনিল বলিয়া উঠিল, সাক্ষী হিসাবে আমার নামটা লেখেন।

নাম কি ?—প্রশ্ন করেন অফিসার।

অনিল সেন।

ছোট দারোগা বলে, শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যেও না যেন।

সে বান্দা আমি না। পাপের লগে লড়াই করার জন্য সব সময়ই তৈয়ারি আছি।

অনিল অনুকূল এস্তাজ খানাতল্লাশির তালিকায় স্বাক্ষর করিলে অফিসার তারকবালাকে বলিলেন, তোমার দুঃখীরামকে আমাদের সঙ্গে থানায় যেতে হবে।

ঐ দুধের বাছারে নেবেন থানায়। বাছা আমার বোঝে কি ?

তোমার দুঃখীর কোন ক্ষতি হবে না। যারা এইটুকু ছেলেকে দিয়ে এসব করিয়েছে ওকে নেব তাদের জব্দ করার জন্য। ওকে শীগগিরই ছেড়ে দেব।

ছাড়বেন কবে ?

অফিসার কিছু বলার আগেই ছোট দারোগা বলিল, দুপুরের আগেই ছাড়ব। ওর জন্যে রেঁধে রেখ।

থানায় যাইতে হইবে শুনিয়া দুঃখীরাম ভয়ে কাঠ হইয়া গিয়াছিল। তারক তার চিবুক ধরিয়া বলিল, ভাবিস্ না কিছু। উনি কথা দিছেন, তোর কোন খেতি করবে না। উনি হইল ভদ্দর লোক।

তারপর অফিসারের দিকে চাহিয়া বলিল, অরে চারডি খাওয়াই দি, হুজুর। অর অভ্যাস কাউয়া ডাকার লগে লগে পান্তা খাওয়া।

অফিসার বলিলেন, বেশ।

তারকবালা যত্ন করিয়া দুঃখীর মাথা ধোয়াইল, তাকে খাইতে দিল চারটি পান্তা ভাত, একটা পোড়া লঙ্কা আর একটু তেঁতুল।

দুঃখীর অভ্যাস হাপুস হুপুস করিয়া খাওয়া। আজ সে খাইতে পারে না, গলায় ভাত আটকাইয়া যায়। তিন চার গ্রাস খাইয়াই উঠিয়া পড়ে।

পুলিস তাকে লইয়া রওনা হইয়া যায়। তারকবালা তার দিকে চাহিয়া দরজায় বসিয়া থাকে। চাহিয়া চাহিয়া তার চোখ জ্বালা করে।

তারা খানিকটা দূরে চলিয়া গেলে তারকবালা পুলিসের অফিসারের উদ্দেশে ডাকিয়া বলিল, অরে মারেন না যেন। আমার ঐ একফোঁটা কাঙালরে।

পুলিস তখন বহুদূরে। সে কথা তাদের কানে যায় না। কিন্তু বৃদ্ধার সেদিকে কোন খেয়ালই নাই।

পুলিস এর পর যায় জঙ্গল মাঝির বাড়ি। দুঃখীর বাড়ি খানাতল্লাশি হইতেছে শুনিয়া সে পলাইয়া গিয়াছিল। তার বাড়িতে পাওয়া গেল আট টিন কেরোসিন।

... ...

তারকবালা বোনপোর জন্য যত্ন করিয়া কচুর শাক ও লাউয়ের ঘণ্ট রাঁধে। খাওয়ার পাতে দুঃখীর একটু তেঁতুল চাই, সে পোড়া লঙ্কা ভালবাসে। বৃদ্ধা তাই পাশের পোড়ো ভিটা হইতে তেঁতুল আনে, দুইটা লঙ্কা পোড়াইয়া রাখে।

ইহা করিতেই দুপুর হেলিয়া যায়। বৃদ্ধা ভাবে, কচুর শাকটা দুঃখীর পছন্দ হবে ত? এঁ্যা, ঘণ্টে লবণ বেশী দিলাম নাকি? আমার যে ভুলা মন।

দুঃখী না ফিরিলে সে কিছু খাইবে না ঠিক করিয়াছিল। কিন্তু

একটু ঘণ্ট চাখিয়া দেখিল, একটু কচুর শাক খাইল। তার পরে আপনা আপনি বলিল, হইছে বেশ। এ বয়সেও রসুই করা ভুলি নাই।

বেলা বাড়ে। উঠানের ছায়া ধীরে ধীরে সরিয়া যায়। ঐ দিকে চাহিয়া চাহিয়া তারকবালার মনে পড়ে অনেক কথা। অতীত জীবনের বিস্মৃতপ্রায় কাহিনী। আসে দুঃখীর মা। তাকে সেই বড় করিয়া তুলিয়াছিল, নিজে খরচা করিয়া তার বিবাহ দিল। সে বিধবা হইল। তিনমাস পড়ে আসিল দুঃখীরাম।

বৃদ্ধার মনে পড়ে নিজের স্বামীর কথা। তার স্বামী কুড়ান চাঁদ। গাছ ফাঁড়িয়া জ্বালানি কাঠ করিতে সারা পরগনায় তার কোন জুড়িদার ছিল না। তাকে সাপে কামড়াইল। তার সারা শরীর নীল হইয়া গেল, মুখ দিয়া গেঁজলা বাহির হইল। আসিল কত রোজা, কত ঝাড়ফুক কত তুকতাক করিল। মাতব্বররা দুইদিন তাকে পোড়াইতে দিল না। শব লইয়া সে ঠায় উঠানে বসিয়াছিল। ঠিক বেহুলার মতন। মনে হয় যেন এই সেদিনের কথা।

দুইটা দিন কাটিল কত আশায়, বেহুলার মতন সেও স্বামীকে ফিরিয়া পাইবে। তার সংজ্ঞা ফিরিয়াছে মনে করিয়া সে মধ্যে মধ্যে স্বামীকে ডাকিত, শোনছ!

দুই দিন পরে সেই শব গাঙে ভাসিল। কলাগাছের ভেলায় শোয়াইয়া তার উপর মশারি খাটাইয়া গ্রামের পাঁচজন তাকে যাত্রা করাইয়া দিল।

দিনের আলো ম্লান হয়, বরকতের ছেলে গরুর পাল লইয়া বাড়ি ফেরে। তারা হাম্বা হাম্বা ডাকে, লেজ নাড়ে, ধুলায় আকাশ ছাইয়া যায়।

গফুরকে দেখিয়া তারকবালা ডাকে, ও ডাকের সাইব।

গফুর বলে, ডাক কেন দুঃখীর মাসী?

তুমি কইতে পার আমার দুঃখীরামরে অরা ছাড়ে নাই কেন?

তা কইতে পারি না। শোনলাম ধরছে অনেকরে।

তারকবালা বলিল, মুখপোড়ারা কইল রাঁধিয়া রাখতে। আমি ভাত কচুর শাক আর লাউর ঘণ্ট লইয়া দুপার হইতে ঠায় বসিয়া আছি।

রাঁধিয়া রাখতে কইছে? ইয়া আল্লা! তুমিও না খাইয়া বসিয়া আছ বুঝি?

আমার কথা ছাড়িয়া দেও। আমার কি ছাই খিদা আছে? এখন সাঁঝ বাতি দেওয়ার আগে হারামজাদারা আমার বাছারে ছাড়লে হয়।

গফুর জানে সে আশা বৃথা। বৃদ্ধাকে কি যে বলিবে সে বুঝিতে পারে না। মিথ্যা আশ্বাস দিয়া তাকে ভুলাইতেও চায় না। সে বলিল, খোদারে ডাকো, তানার মেহেরবান হইলে দুখকু থাকবে না।

তারকবালা বলিল, খোদার কথা কইও না। শেষ পর্যন্ত ছিল মায়ের পেটের এক বুইন, সে গেল, তার চিহ্নটারেও পুলিসে ধরল। এর পরও খোদা!

গফুর বলিল, এ তুমি কও কি?

তারকবালা বলিল, আর যেন কারে কারে ধরছে?

পরাণ নন্দী, বিশু, হারু সরকার—ধরছে অনেকরে। মঞ্জরির হাটের কাপুড়িয়াই আছে পাঁচ সাত জন।

নন্দীগো ধরছে? বেশ বেশ অরাই ত দুঃখারে চোর বানাইছে। আচ্ছা থানায় নিয়া অরে মারধর করে নাই ত? ঐ এক রতি ছাওয়ালরে মারলে ও কি আর—

গফুর শুনিয়াছিল থানায় লইয়া গিয়া পুলিস ধনীদের কিছু বলে নাই কিন্তু গরিব কয়েকজনকে খুব মারিয়াছে। সে কোন উত্তর না

করিয়া চলিয়া গেল। বৃদ্ধা বসিয়া বিড বিড় করিতে লাগিল, যত সব মিথ্যুক। কইল রাঁধিয়া রাখতে। কুকুরে অরগো মুখে মোতবেও না।

অদূরে আকালীর খড়ের চালা, জোনাব আলির মসজিদের চূড়া, ঝাউ গাছের উঁচু মাথা, কৃষ্ণচূড়ার থোকো থোকো লাল ফুল তার চোখের উপর একে একে সবই অন্ধকারে লীন হইয়া যায়।

কালো কম্বলের মতন সেই অন্ধকারে বৃদ্ধাটি ধীরে ধীরে ডুবিয়া গেল।

মানিক অন্যের জমিতে কিষাণ খাটে। রোজ সকালে পান্তা ভাত খাইয়া কাজে যায়। সেদিন ভোরে সে পান্তা ভাত খাইতে বসিয়াছে; গোলাপী হাঁড়ী হইতে তুলিয়া জল নিংড়াইয়া ভাত দেয়, উঠানে দাঁড়াইয়া গোকুল ছেলের খাওয়া দেখে। তার কাঁপুনি আজ কাল কম, চোখের চাহনি অনেকটা পরিষ্কার, রাত্রের যন্ত্রণাও আগের মতন ঘন ঘন হয় না।

কথায় কথায় গোলাপী বলিল, শোনলাম সিধুর মামারেও পুলিসে ধরছে।

মানিক বলিল, ধরছে অনেকরে। আরও অনেকরে ধরবে শোনতেছি।

থানা পুলিশ শুনছি নন্দীগো হাতের মধ্যে। ঐ বাড়ির ছোট কর্তারে যখন ধরছে তখন কেউ আর বাদ যাবে না।

মানিক বলিল, চোরাকারবারীদের ধরার জন্য কলকাতার থা এই পুলিস সাইব আইছে। ভারী কড়া মানুষ।

বেশ হইছে। এ পাপ দূর না হইলে সবাই না খাইয়া মরব।

ভাগ্যিস সুকুদা মানা করছিল, বিশ্ববাবুর চাকরি নিলে আমিও ধরা পড়তাম।

গোলাপী বলিল, তুই ধরা পড়তিস না।

কেন, তোমার ছাওয়াল বলিয়া ছাড়িয়া দিত বুঝি?

এই সময় ঘরের সামনে আসিয়া তারকবালা ডাকিল, অ মাইনকা।

তার পরনে মলিন বসন, জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখের পাতা ফুলিয়াছে। গোলাপী দুঃখীরামের গ্রেপ্তারের খবর জানিত। সে কুমীকে ডাকিয়া বলিল, আমার হাত আঁটিয়া। তুই মাঐরে বসতে আসন দে।

তারকবালা সম্পর্কে তার মাঐমা। সে বলিল, থাউক। যতক্ষণ না দুঃখীরে দেখি ততক্ষণ বসব না কিরা কইরা বাইর হইছি।

এখন চলছ কোথায়?

থানায়। মাইনকারে লইয়া যাব ভাবছি।

এই এক রত্তি ছাওয়ালেরে লইয়া যাবা থানায়!

বড়রা কেউ রাজী হইল না। আকালীরে কইলাম, ভজনরে কইলাম। তারা ভয় পায়।

আর সেই কাজের জন্য আইলা মাইনকার কাছে?

ছোট হইলেও ও পারবে। বুদ্ধিতে বড়রাও অর সমান না।

ছেলের প্রশংসায় গোলাপী খুশি হয় খুবই কিন্তু ছেলেকে সে থানায় পাঠাইতে চায় না। সে বলিল, মাইনকা ত এখন কাজে যাবে।

বৃদ্ধা হতাশ কণ্ঠে বলিল, গফুর বাড়ি থাকলে কোন ভাবনা ছিল না। সে আমারে লইয়া যাইত।

গোলাপী বলিল, সে গেছে কোথায়?

শেষ রাত্তিরের ভাঁটায় গাঙে মাছ ধরতে গেছে। ফেরবে একপহর উদানে। আমি বড় আশা করিয়া আইছিলাম, মাইনকার মা।

বৃদ্ধার জন্য গোলাপীর দুঃখ করে কিন্তু ছেলেকে যাইতে দিতেও ভরসা হয় না পাছে থানায় তার কোন বিপদ হয়, পুলিস তাকেও জড়াইয়া ফেলে।

মানিকের ইচ্ছা ছিল তারকবালার সঙ্গে যায়। বৃদ্ধার প্রতি সহানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে তার মনে বেশ কিছুটা কৌতূহলও ছিল। থানায় কি হইতেছে, কে কে ধরা পড়িল, পরাণের মত বড় লোক আর দুঃখীর মতন গরিবের সঙ্গে পুলিসের ব্যবহারের তফাত কতটা এই সব সে নিজের চোখে দেখিতে চায়।

গোলাপী ছেলের মনের কথা জানিত। তার ভয় হইল পাছে সে নিজেই বলিয়া বসে, আমি যাব মা।

তিনজনেই একটুক্ষণ চুপ করিয়াছিল। নীরবতা ভঙ্গ করিয়া তারকবালা বলিল, তা হইলে কি আমি ফিরিয়া যাব?

গোলাপী নীরব।

তারক বলে, কি গোলাপ?

গোলাপী বলিয়া উঠিল, না না আমার মানিক যাইতে পারবে না। তুমি যাও।

তারকবালা ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলে। গোকুল এতক্ষণ চুপ করিয়া দেখিতেছিল। সে ধীরে ধীরে কিন্তু সুস্পষ্ট কণ্ঠে কহিল, মানিক যাবে, থানায়—আরও যেন কি বলিতেছিল কিন্তু পারিল না। আরম্ভ হইল অল্প কাঁপুনি।

লোকে প্রশ্ন করিলে সাধারণত সে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে। কখনও মাথা নাড়িয়া সম্মতি বা অসম্মতি জানায়। দু-একবার হয়ত হাঁ কিংবা না ও বলিয়াছে। কিন্তু একটা বিষয়ে গুছাইয়া কথা বলিল এই প্রথম। সঙ্গে সঙ্গেই মানিক উল্লসিত কণ্ঠে বলিল, আমি যাব। বাবা যাইতে কইছে।

স্বামীর অবস্থার এই অপ্রত্যাশিত উন্নতিতে গোলাপীর আনন্দ হইল খুবই তবে তার প্রস্তাবে সে খুশি হইতে পারিল না। আবার ছেলের হাবভাব দেখিয়া আপত্তিও করিল না।

ঘটনার এই পরিণতিতে তারকবালার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। সে গোলাপীর দিকে চাহিয়া বলিল, মা মনসা তোর ভাল করবে। সোয়ামী সারিয়া ওঠবে। আবার ভাল দিন আসবে।

সে ও মানিক রওনা হইয়া গেলে গোকুল স্ত্রীর দিকে চাহিয়া হাসে। গোলাপী যেন চোখের সামনে আলোর রেখা দেখিতে পায়।

খানিকটা পরে ছোটরাণী গোলাপীকে বলিল, তোরা মা-জাত বড় স্বার্থপর।

গোলাপী জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম ?

ছোটরাণী বলিল, ঠাকুরপো না কইলে তুই কি মানিকরে থানায় যাইতে দিতিস ?

তা' দিতাম না।

এই জন্যই কইছি স্বার্থপর।

গোলাপী বলে, তুমি যেন কেমন। মা আবার স্বার্থপর হয় নাকি ?

ছোটরাণী মুচকি হাসে।

চৌত্রিশ

থানায় যাওয়ার পথে মানিক সুকুমারকেও সঙ্গে লইয়া গেল। সে বলে, চোরা-কারবারীর ব্যাপারে আমি যেতুম না। তবে দুঃখী ছেলেমানুষ, ওর নিজের কোন দোষ নেই তাই যাচ্ছি।

মানিক বলিল, আমিও তা হইলে আসতাম না, সুকুদা। আর একটা ভাল খবর আছে, আজ আসছি বাবার হুকুমে।

কি রকম ? তিনি হুকুম দিয়েছেন ?

হ্যাঁ, মা ত আসতে দিতেই চায় না। তখন বাবা ধীরে ধীরে কইল, মানিক যাবে থানায়।

সুকুমার বলিল, তিনি ক্রমে ক্রমে ভাল হয়ে উঠছেন। তাই না?

মানিক বলিল, হু, বাবার এরকম কেন হয়েছে জানেন?

কেন?

বাবা পরের দুঃখ দেখতে পারে না। আমার বিশ্বাস পরের কষ্ট ঘুচাইতে গেছিল, তাই এই রকম হইছে।

মানিকের ধারণা তার বাবা কলিকাতার রাস্তায় সর্বহারাদের সাহায্য করিতে যাইয়া নিজের বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে। এই বিশ্বাসের কারণ, গোকুল আগে প্রায়ই রাত্রে চেঁচাইয়া উঠিত, তোরা আমার পাশে আসিয়া দাঁড়া। একদিন অন্তত পেট পুরিয়া খা। কখনও বা বলিত, মর্ হারামজাদারা, না খাইয়া মরাই তোর গো উচিত।

সুকুমার হ্যাঁ কিম্বা না কিছুই না বলায় মানিক ক্ষুণ্ণ হইল। একটু পরে সুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাবছিস?

মানিক বলিল, আমার ইচ্ছা বাবারে ডাক্তার কবিরাজ দেখাই।

বেশ ত।

কি করব? কবিরাজী না ডাক্তারী?

পুরানো রোগে কবিরাজীতেই ফল ভাল হয়। ডাক্তারীর চেয়ে খরচাও কম।

কবিরাজ কে ভাল, কাকে দেখাইবে, মাসে আনুমানিক খরচা পড়িবে কত, মানিক এই সব প্রশ্ন করে।

এদিকে তারকবালা সারাটা পথ বিড়বিড় করে, গুড়, কলা, কচুর শাক সব জিনিসই ত তুই ভালবাস। আমি কচুর শাক আর লাউর ঘণ্ট রাঁধিয়া রাখলাম, তুই দেখলিও না।

বেলা নটা আন্দাজ তারা ঘাঘরে পৌছিল, দুই সারিতে অনেক

দোকান, তার মধ্যে হারাণের দোকানই সব চেয়ে বড়। সোনা রূপা হইতে আরম্ভ করিয়া চাল ডাল মশলা, আশ্চর্য মলম বিক্রয় হয় সব কিছু। দোকানটা বন্ধ।

বাহিরের রোয়াকে বসিয়া নন্দীদের সরকার শ্যাম সজ্জন আর দরোয়ান রামদীন খৈনি টেপে আর গান গায়—

রাম লছমন
ভরত শত্রুঘন,
চামর ঢুলায় হনুমান।
হোঃ হোঃ চামর ঢুলায় হনুমান।

দোকান হইতে থানা পর্যন্ত জায়গায় জায়গায় পাঁচ-সাত দশজন জটলা করে। কোন দল গাছতলায় দাঁড়াইয়া, কোন দল বা অন্য দোকানে বসিয়া।

চোরাকারবারীরা ধরা পড়ায় তারা যেন উল্লাসে ফাটিয়া পড়ে। সবার মুখে এক কথা, কেমন জব্দ! ধর্মের কল এবার আ ʼই নড়ছে।

দুইটা দোকানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সুরযমল রাইটার কনষ্টেবল ভূপেনের সঙ্গে গুজুর গুজুর করিতেছে। তাকে পাঠাইয়াছে হরিমতী। সুকুমার ও মানিককে দেখিয়া সে ভুরু কোঁচকায়। চোরাকারবারীদের ধারণা পুলিসের এই হামলার কারণ সুকুমার। বেনামা দরখাস্ত দিয়া গোপনে তদ্বির করাইয়া সে-ই খানা-তল্লাশির ব্যবস্থা করাইয়াছে। পুলিস সব গোপন খবর পাইয়াছে তার নিকট।

মানিক সুরযমলের বিরক্তি লক্ষ্য করিয়াছিল। সে বলিল, কি খবর সাইব?

আজ সাহেব বলায়ও সুরযমল প্রসন্ন হইল না। বলিল, যাও যাও, আপ না কাম দেখো।

মানিক বলিল, আপনে ওনার লগে এখানে করতেছ কি?

সুরযমল গর্জন করিয়া উঠিল, ই ত বড়া দিল্লাগি হ্যায়।

সুকুমার হাসি চাপিয়া মানিককে ডাকিল, আয় চলে আয়।

সুরযমল তাদের শুনাইয়া বলিল, ই সব লোক বড হারামি আছে, ছুপ্পিন বাবু।

থানার কাছে ভীড় আরও বেশী। মানুষ যে কৌতূহল লইয়া চিড়িয়াখানায় পশু দেখিতে আসে তারা আসিয়াছে সেই কৌতূহল লইয়া; আসিয়াছে হাজতে গরাদের পিছনে পরাণ বিশ্ব হরনাথ ও তাহাজদের দেখিতে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের বিফল হইতে হয়। বাহির হইতে হাজত দেখা যায় না। ভিতরে যাওয়ারও উপায় নাই। দরজায় বন্দুকধারী পুলিস। জনতা অগত্যা সামনের রাস্তায় দাঁড়াইয়া জটলা করে।

কেহ বলে, নন্দী বাড়ির ডোবায় ধাপের নিচে নাকি দশ সের ক্রাচিন পাইছে?

বাজে কথা, পাইছে চিনি।

চিনি নাকি পাইছে বিশ্ব ঘোষের বাগানে? কচু ঝোপের তলায় পোঁতা ছিল।

জান, রামনাথদের খাতা পত্তর সব আটকেছে?

নন্দীদের খাতা আটকায় নি? তারা ত টেক্স ফাঁকি দিচ্ছে।

তাদের দোকর খাতা আছে না?

একজন বলিল, শহরে হারাণরেও ধরছে শোনলাম।

তাকে ধরবে পুলিস? সে হ'ল গভীর জলের মাছ, মীনরাশ, ডুবে ডুবে জল খায়।

সুকুমারকে দেখিয়া ইয়াসিন প্রশ্ন করিল, অরা শেষটায় খালাস পাবে না ত?

আরও দু'তিনজন এক সঙ্গে বলিল, জামিন দেবে নাকি?

সুকুমার প্রত্যেকের কথার পৃথক জবাব দেয়, জামিন খুব সম্ভব পাবে, তবে মামলায় কি হবে বলতে পারেন হাকিম।

জনতা বিরক্তি প্রকাশ করে, যারা মানুষরে না খাওয়াইয়া মারে তারা পাবে জামিন! অরগো উচিত শূলে দেওয়া।

থানার দরজায় আসিয়া তারকবালা ডাকিতে লাগিল, ও দুখ্খী, দুইখ্যা রে। আমি আইছি।

বন্দুকধারী সিপাহীদের একজন বলিল, এই বুড়ী, চিল্লাও মত্।

দুঃখীরে তোমরা করছ কি? আমার বোনপো দুঃখীরামরে।

সিপাহী ধমক দিল, চোপ্ রও।

আবার চোপ্ রও। আমার দুঃখীরে ধরবে, আবার আমারেই চোখ রাঙাবে!

সুকুমার তারকবালাকে থামাইয়া দেয়। সে আপিস ঘরে শ্লিপ পাঠাইয়াছিল। একটু পরে তার ডাক পড়িল।

লম্বা ঘর। দরজার সামনের টেবিলে মহকুমা হইতে আগত পুলিস অফিসার কাজ করিতেছেন। তাঁর সামনে কাগজের স্তূপ, দোয়াত, কলম, রোলার, এক পাশে একটা রিভলভার ও শঙ্কর মাছের ল্যাজের তৈরি হাণ্টার। অফিসার কাগজ পত্রের মধ্যে যেন ডুবিয়া গিয়াছেন, থানার বড় বাবু তাঁর দিকে চাহিয়া আছে। বিপরীত দিকে বসিয়া ছোট দারোগা নখের ডগা কামড়াইতেছে।

এই সময় সুকুমার ভিতরে আসিলে অফিসার বলিলেন, আপনি সুকুমার বাবু?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ছোট দারোগা বলিল, উনি হচ্ছেন জনগণের নেতা।

তার কথা বলার ভঙ্গীতে যথেষ্ট ব্যঙ্গ ছিল। অফিসার গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, সে আমি জানি।

সুকুমার ঘাড় ফিরাইয়া দেখে বাঁ দিকে হাত কয়েক দূরে হাজতের গরাদের পিছনে পরাণ বিল্ব তাহাজ তারণ প্রভৃতি অনেকে। তাদের মধ্যে একজনের মাথায় পটি বাঁধা, তার উপর রক্তের দাগ, তার একটা নাক ফুলা, লোকটা হয়ত গরিব তাই পুলিসের হাতে তার এই অবস্থা হইয়াছে।

অফিসার তাকে বসিতে বলিয়া দেশে জিনিস পত্রের দাম, রেশনের দোকানের সুবিধা অসুবিধা ও জনকল্যাণ সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন। দেখা গেল, কোটালী থানার বহু খবর এমন কি জনকল্যাণের খুঁটিনাটি অনেক কিছু তিনি জানেন। লোকটি বুদ্ধিমান।

খুঁটিনাটি নানা প্রশ্নের পর তিনি বলিলেন, আপনি এখানে কি মনে করে? কারও তদ্বিরের জন্য নাকি?

হ্যাঁ, এসেছিলুম দুখীরামের জন্য।

সেই কচি ছেলেটি, যে বিল্ব বাবুর দোকানে কাজ করে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তাকে মহকুমায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তার মাসী ত কেঁদেই অস্থির। সারা রাত ঘুমোয়নি, কাল দুপুরে বেঁধে রেখেছিল।

হ্যাঁ, কাল বেঁধে রাখতে বলা হয়েছিল বটে। যাক্ আপনি তাকে বুঝিয়ে বলুন দুখীর জন্য আমি যথাসাধ্য করব।

কিন্তু এর পর আমার কথা সে কি বিশ্বাস করবে?

তা বটে—

কচি ছেলে পরের পাল্লায় পড়ে এই রকম করেছে।

অল রোগ্ স্। সবই বুঝতে পেরেছি। আমি ছেলেটির জন্য চেষ্টা করব। আপনি বুড়ীকে বলুন।

সুকুমারকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া অফিসার নিজেই বাহিরে

চলিয়া গেলেন। দরজায় তাকে দেখিয়া তারকবালা চীৎকার করিয়া উঠিল, আমার দুইখ্যা কোথায়, বড় বাবু? তারে ডাইক্কা দেন।

দিন দুই পরেই তাকে পাবে।

আপনারা এই রকম মিছা কও? কাল কৈলা রঁাধিয়া রাখতে, আর আজ কও তিন দিন পরে পাব।

দুদিনের মধ্যেই তোমার ছেলে ফিরে আসবে—বলিয়া অফিসার ভিতরে চলিয়া যান।

ওরে আমার দুঃখীরে, ও রে আমার পাগলী, দেখ্ আসিয়া তোর ছাওয়ালের দশা—বলিয়া তারকবালা কান্না জুড়িয়া দেয়।

তারপর কাঁদে মৃত স্বামীর উদ্দেশে।

* * * *

দুই দিন পরে দুঃখীরাম জামিনে খালাস হইয়া আসিল। তার পর দিন জামিন পাইল আর সবাই। রেশনের দোকান আগেরই মতন চলিতে লাগিল। সেই অব্যবস্থা অসুবিধা। লোকে বলিল, অরগো কি লাজ লজ্জাও নাই?

তখনও তারা আশা করিত এর একটা ব্যবস্থা হইবে। চোরা-কারবার বেশী দিন চলিবে না।

কিন্তু মাস খানেক পরে জনকল্যাণের অনিল সেন সদর হইতে খবর আনিল পুলিসের বিশেষ অফিসারটিকে টেলিগ্রাম যোগে এই মহকুমা হইতে বদলি করা হইয়াছে। করাইয়াছে হারাণ নন্দী এবং এক মুসলমান এম, এল, এ। এই ভদ্রলোকের হাতে এসেমব্লির সাত সাতটি ভোট, তাই মন্ত্রী মহলে তার খুব খাতির। কেহ কেহ বলে, হারাণের সদরে যে সব কারবার আছে তিনি তার একজন অংশীদার।

পরাণরা খালাস পাওয়ায় দেশব্যাপী একটা অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। লোকে পুলিসকে গালি দিল। চোরাকারবারীদের দিল অভিশাপ।

মাস তিনেক পরে আদালতের বিচারে দুঃখী ও জঙ্গল মাঝি ভিন্ন খালাস পাইল সবাই। হাকিম দুঃখীকে সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দিলেন, জঙ্গলের হইল দুই মাস জেল। আর সকলের সঙ্গে সেও খালাস পাইয়াছে মনে করিয়া কোর্টে কাঠগড়ার মধ্যেই নিজস্ব ভঙ্গীতে উল্লাস শুরু করিয়াছিল। কাঠগড়ার বাহিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে পুলিস তার হাত ধরিলে সে হাঁউ হাঁউ করিয়া উঠিল। বোধ হয় হাকিমকে বলিল, এই হইল তোমার বিচার!

ভাই ও শ্যালক খালাস পাওয়ায় হারাণ অষ্ট প্রহরব্যাপী কীর্তন দিল।

কীর্তনীয়ারা জনকল্যাণের সামনে আসিয়া ঘন ঘন শিঙা ফোঁকে, করতাল ও খোল বাজায়। ধ্বনিতে আকাশ যেন চিরিয়া যায়।

এর পর হয় মালসা ভোগ। পরাণরা গ্রেপ্তার হওয়ায় যারা আনন্দিত হইয়াছিল তারাই এবার বাহবা দিল। আকণ্ঠ ভোগ খাইয়া ঢেঁকুর তুলিতে তুলিতে মন্তব্য করিল, সুকুর খুব শিক্ষা হইছে। আর কখনও নন্দীগো ল্যাজে মোচড় দিতে যাবে না।

পঁয়ত্রিশ

ছোটরাণী জনকল্যাণের মেয়েদের পড়ায়, শেলাই শেখায়। দুই বাড়িতে শেলাইয়ের টিউশনি করে। অবসর সময়ে করে জনকল্যাণের কাজ।

বিবাহের আগেই সে সামান্য লেখাপড়া জানিত, তারপর কিছুটা

শেখে মণিরামের কা । সে যত্ন করিয়া পড়াইত। এবার সুকুমারের তত্ত্বাবধানে অল্প দিনের মধ্যেই লেখাপড়ায় উন্নতি হয়। হাতের লেখা সুন্দর হয়।

মানিকও এ বিষয় প্রথম প্রথম তাকে সব রকমে সাহায্য করিয়াছে। ছোট মায়ের যাতে সুখ সুবিধা হয় সে সম্পর্কে তার লক্ষ্য খুব।

একদিন রাত্রে ঘুম ভাঙিলে গোলাপী দেখিল ছেলে ঘরে নাই। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর সে বাহিরে যাইয়া ডাকিল, মানিক, ও মাইনকা।

ছোটরাণীর ঘর হইতে জবাব আসিল, কি মা?

গোলাপী ঐ ঘরের দরজায় যাইয়া দেখে মানিক ও ছোটরাণী উপুড় হইয়া কলমের উলটা দিক দিয়া পুরানো খবরের কাগজের উপর কি যেন লিখিতেছে। বড় কালো কালো হরফের পাশে লাল দাগ। ছোটরাণী লেখে, মানিক অক্ষরের পাশে লাল রেখা টানিয়া যায়।

কোন খানা বা সে লেখে, দাগ টানে ছোটরাণী। গোলাপী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখে। ভাবে, এ আবার কি? ছোটরাণীর সবই কি হেঁয়ালি?

খানিকটা পরে সে ডাকিল, ছোড়দি।

ছোটরাণী মুখ তুলিয়া বলিল, কিরে, চোরের মতন কতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছ?

তোমরা কর কি?

দেখ্ পড়িয়া।

গোলাপী ঘরে উঠিয়া লেখাগুলি পড়ে।

কাগজ অনেকগুলি, কোনখানায় শুধু লেখা, হরতাল, হরতাল।

কোনটা বা বড়। একটা কাগজে—ভাই চাষী, ভাই মজুর, ভাই দোকানী, চোরাকারবারীদের মুক্তির প্রতিবাদে ১লা অগ্রহায়ণ হরতাল পালন করুন।

দোকানী দোকান খুলিবেন না।

চাষী মজুর যে যার কাজ বন্ধ রাখিবেন।

ছাত্রছাত্রীরা স্কুল পাঠশালা মক্তবে যাইবেন না।

গোলাপী বলিল, অরগো ছাড়ছে সে ত ভাল কথা। সেজন্য সকলডি কাজ বন্ধ রাখবে কেন?

অরগো ছাড়ায় লোকের ক্ষতি হইছে—বলিল ছোটবাণী।

ক্ষেতি! একজনের ভালোয় আর একজনের ক্ষেতি হয়?

নন্দীরা, ফুটু ভুঁইয়ারা যে সব কোঠা তোলছে, নতুন যা তোলতেছে সে সব ত আমাগো চিতার উপর। ওরগো বাড় বাড়ন্ত হইছে পাঁচ-জনের রক্ত শুষিয়া।

একজন বড় হবে, দশজন তার অধীন হবে এই ত ভগবানের বিধান। যাউক, লেখা শেষ হইলে তুই ঘরে আসিস মানিক।

মানিক বলে, আজ ছোটমার কাছেই থাকব।

পরদিন পোষ্টার পড়িল রাস্তার মোড়ে মোড়ে, গাছের ডালে, কালী ও মনসা মন্দিরের দরজায় এবং থানার দেয়ালে।

চাষী মজুররা অবাক হইয়া যায়। কেহ কেহ বিরক্তি প্রকাশ করে, একদিনের রুজি রোজগার নষ্ট।

আর একদল বলিল, হরতাল কি নূতন? গান্ধীও ত কতবার করাইছে।

লোকে হাসে, গান্ধী আর সুকুমার!

আবার এমন মন্তব্যও শোনা যায়, গান্ধীই বা ভাল কি করছেন? দাঁড়াইয়া মাইর খাও আর উপাস কর এই ত তানার হুকুম।

মোটের উপর বেশীর ভাগ লোক হরতালের প্রস্তাব সমর্থন করিল না। জনকল্যাণের নরেন বলিল, একদিনের রোজগার ছাড়ার কি কেলেশ সুকুদা তা বোঝে না, বড়লোকের ছাওয়াল কিনা।

সেরাজুদ্দি বলিল, হুকুম ত তানার একার নয়, হুকুম দিছে কুমিটি। একদিনের মজুরির মায়া ছাড়তে না পারলে স্বরাজ আমরা আনব ক্যামনে ?

রাগ করিল থানার বাবুরা, বিশেষতঃ ছোট বাবু, দেয়ালে পোষ্টার দেখিয়া সে হুঙ্কার ছাড়িল, এত বড় আস্পর্ধা ! এই রুদ্রদমন !

হুজুর—বলিয়া গোঁফ চুমরাইতে চুমরাইতে এক গালপাট্টাওয়ালা সামনে দাঁড়ায়।

কি হয়েছে দেখছ ? দেয়াল নোংরা করে দিয়েছে।

চোনা ছড়িয়ে দেব হুজুর ?—প্রশ্ন করে কনষ্টেবল ভুবন।

তুমি—তুমিও গান্ধীওয়ালা বনে গেছ। ইউ—ইউ—রাগিলে ছোট দারোগা খালি 'ইউ' 'ইউ' করে।

ভূপেন প্রভুভক্ত রাইটার কনষ্টেবল। সে প্রথমে দেয়ালে কয়েক ঘা হাণ্টার বসাইল, পোষ্টার ছিঁড়িয়া ফেলিল। তারপর সেখানে লাগাইল নূতন পোষ্টার।

আপনারা হরতাল করিবেন না।

হরতাল দেশের ক্ষতি, দশের ক্ষতি।

পোষ্টার তার নিজের হাতের লেখা।

হরতালের আগের দিন সুকুমার এক মিছিল বাহির করিল। সঙ্গে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র ও রঙিন পতাকা। মিছিল জনকল্যাণের আশ্রম হইতে বাহির হয় বেলা ন'টা আন্দাজ। পুরোভাগে অনিল সেন মুখে চোঙা লাগাইয়া চেঁচায়, দেশের শত্রু কে ?

পিছন হইতে নগেন পরেশ পোতো অমর একসঙ্গে বলে, চোরা-কারবারী।

দুর্ভিক্ষ এনেছে কে ?

চোরাকারবারী।

খানিকটা যাইয়াই রামনাথদের বাড়ি। তার সামনে লোক্যাল বোর্ডের রাস্তায় দাঁড়াইয়া মিছিলকারীরা গান ধরিল,—

ও ভাই বাংলা দেশে,
আমাগো বাংলা দেশে আঙরাজে
আনছে মজার কল।
চাউলে কাঁকর, ডাইলে বালি
নুন চিনিতে জল।

হরনাথ রাগে গস্‌গস্‌ করে। বলে, বেটাদের সাহস দেখেছ?

রামনাথ বলে, হবেই ত, এটা শুদ্দুরের যুগ।

হরনাথ বলিল, ছোটলোকদের সঙ্গে কতগুলো ভদ্দর লোকের ছেলেও যে গিয়ে মিশেছে।

রামনাথ মন্তব্য করে, একেই বলে ঘর ভাঙ্গা বিভীষণ।

মলিনা দোতলায় নিজের ঘরের জানালায় একাকী দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছিল। মানিক লক্ষ্য করিল এক বছরে তার চেহারার বেশ কিছুটা পরিবর্তন হইয়াছে। আগের চেয়ে অনেক সুন্দর দেখায়। সে গানের তালে তালে গরাদের উপর আঙুল ঠুকিতেছিল।

অনিল সেনের সঙ্গে তার চোখাচোখি হওয়ায় অনিল গানের মধ্যেই মুখে চোঙা লাগাইয়া চীৎকার করিয়া ওঠে, দ্যাশের শত্রু কে?

মলিনা ফিক করিয়া হাসিয়া জানালা হইতে সরিয়া গেল।

পরদিন হরতাল জমিল না। হারাণের লোকেরা গরিব চাষী মজুরকে শাসাইল, ছোট দোকানীদের সতর্ক করিয়া দিল, দোকান বন্ধ করিলে ভবিষ্যতে আর বাকীতে মাল পাইবে না।

শুধু একদল ছেলে স্কুল কামাই করে, হাটে বাজারে পিকেট করে। বাযরে এক দোকানীর সঙ্গে তাদের বচসা হওয়ায় পুলিস তাদের ধরিয়া নিয়া যায়।

হরতালের অসাফল্যে মানিক দমিয়া যায়। তাকে উৎসাহ দেয় সুকুমার—দমলে চলবে কেন? দেশ যে তৈরি নয়, আর সেজন্য দায়ী আমরা।

মানিক বলিল, আমরা দায়ী হইলাম কিসে?

আমরা তাদের শিক্ষা দেইনি, অন্ধকারে রেখেছি। তারা বুঝতেই পারে না কোন্‌টা তাদের পক্ষে ভাল, কোন্‌টা ক্ষতিকর।

মানিক বলিল, কিন্তু নরেনদাও যে আমাদের ছাড়িয়া গেল। প্রেসিডেণ্ট খাঁ সাহেব নিজে বাধা দিলেন।

এই সব বাধার সঙ্গে লড়াই করেই আমাদের উঠতে হবে। নদীর জলের সঙ্গে কাজের মিল খুব, বাধা পেলে স্রোতের তোড় যেমন বাড়ে, কাজের বেলায়ও ঠিক তাই।

হরতালের পরই ছোটরাণীর নন্দীবাড়ির টিউশনি শেষ হইয়া গেল। হারাণের স্ত্রী একদিন বলিল, তুমি আর এসো না।

ছোটরাণী বলিল, কেন?

সে জানেন কর্তারা। বড়কর্তা তোমার মাইনের টাকা রেখে গেছে।

মলিনার টিউশনি তার পর দিন। ছোটরাণী সেখানে গেলে সে হাসিয়া বলিল, বাবুরা ত তোমাকে নিয়ে দস্তুরমত ভয় পেয়ে গেছে।

ছোটরাণী বলিল, ভয় কিসের?

তুমি নাকি হরতালের দলে?

কে বলেছে?

বলেছে হারাণ নন্দী।

আমি হরতালের দলে হইলেই বা ওনাদের কি?

মলিনা বড় চোখ আরও বড় করিয়া বলে, ওঃ বাবা, ভয় আবার নেই! এদের রুজি রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে যে। ছোট ভাসুর পো ত তোমায় রাখতেই চায় না।

ছোটরাণী হাসিয়া বলিল, খুব রাগ করছেন বুঝি? নন্দী বাড়ির চাকুরী গেছে। এটাও যদি যায় তা হইলে আবার বোষ্টমী সাজব, খঞ্জনী বাজাইয়া তোমার জানালায় আসিয়া গাব,—

ও মোর রাই কামিনী
দিনযামিনী
(তোমার) নামের মালা জপি।

পদ দুইটি বলে সুর করিয়া।

মলিনা হাসিয়া ফেলে। একটু পরে বলে, এ কাজ যাবে না। আমি ছোট ভাসুর পোকে বলেছি, বেশ দেবেন তুলে। তবে যে সব শেলাইগুলো তার কাছে শিখছি—সেগুলো শেষ হ'লে।

তিনি কি বললেন?

রাগ করেছেন।

রামনাথ বাড়ি ছিল না। হরনাথ ফুটুকে লিখিল, মণিরাম কবি-ওয়ালার বৌ বড়লোকের বিরুদ্ধে চাষী মজুরদের খেপায় আর রেশনের ডিলারদের বিরুদ্ধে খেপায় তাদের ঘরের মানিক। সে গাহিয়া বেড়ায়, আমরা ডালে বালি, চালে কাঁকর, নুন চিনিতে জল মিশাই।

কবির ছোট বউ ছোট কাকীকে শেলাই শেখায়; তাকে রাখা আমার ইচ্ছা নয়। তোমার মতামত জানাইবে।

চিঠিখানা যখন ফুটুর হাতে পড়ে সে তখন দড়ির বোন ঘড়ির সঙ্গে মদ্যপান করিতেছিল। সে বলিয়া উঠিল, কাওয়ার্ড। খুড়ো একটা কানীকে ভয় করে।

ঘড়ি বলিল, কি হয়েছে ফুট্?

ফুটু বলিল, আর হয়েছে!

তার কাছে সব শুনিয়া ঘড়ি বলিল, ওঃ এই কথা? তার করে দাও, নো ফিয়ার, আঙ্কল্।

মত্ত অবস্থায় ফুটু দেশে সেইরূপই টেলিগ্রাম করিল। উহা পাইয়া হরনাথ রাগ করিল মলিনার উপর। তার ধারণা, সে চিঠি দিয়া স্বামীকে পূর্বেই প্রভাবিত করিয়াছে।

মলিনা ছোটরাণীকে দিয়া গোলাপীকে আবার ডাকিয়া পাঠাইল। ছোটরাণীর অনুরোধে গোলাপী এবার গেল।

মলিনা তাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, যাক্ এতদিনে তবু এলে।

গোলাপী অপ্রতিভভাবে বলিল, বড় ব্যস্ত থাকি মা।

সে জানি, মানিকের বাবা কেমন আছে?

আগের থা ভাল।

শুনছি তোমাদের ছোটরাণীর কাছে, সে নাকি এখন মানুষ চেনে।

যাদের সঙ্গে জানা ছিল তাদের আগেও চেনত। তবে নতুন কিছু বোঝত না। এখন বোঝে সব। কিন্তু চুপ করিয়া থাকে, কি যেন ভাবে। আর ভাবনার ত আমাগো অন্ত নাই—বলিয়া গোলাপী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে।

তা ঠিক্, দিনকাল যা পড়েছে তাতে তোমরা যে চালিয়ে নিচ্ছ এই ত যথেষ্ট—ঐটুকু ছেলে তোমার একা রোজগার করে।

কিছু দিন সে একলাই চালাইছে, এখন দেনা হইছে। দেনা তার বাপের তিকিচ্ছার জন্য। এক হরি কাবুলের কাছেই নিছি পনর টাকা।

কে? নন্দীবাড়ির হরিমতি? সে শুনেছি ভারী কড়া লোক, কাবলীওয়ালার মতন।

তাই তার নাম হরি কাবুল। মাত্তর দু'মাসের সুদ পাওনা। সেদিন নুড়ায় আগুন ধরাইয়া কইল, আমার সুদ দে, না হইলে তোরগো ঘরে আগুন ধরাইয়া দেব। দেইখ্যা অনেক দিন পরে মানিকের বাপের আবার কাঁপুনি শুরু হইল।

তুমি বুড়ীকে তাড়িয়ে দিলেই পারতে।

ওঃ বাবা, তার যে অমন বড়লোক দাদা সেই কিছু কইতে সাহস পায় না।

মলিনা বলিল, তোমার ভাল হবে দেখো। এ দুঃখু বেশীদিন থাকবে না। মানিকের বাপ ভাল হয়ে উঠবে।

গোলাপী বলিল, সেই আশায় ত বাঁচিয়া আছি, মা।

একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মলিনা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এ বাড়িতে আবার কাজ পেলে করবে?

না মা। পরের বাড়ি যাইয়া আর চাকুরি করব না। ছাওয়াল বড় হইছে।

এর পর মলিনা গোলাপীর বাল্যকালের প্রসঙ্গ তুলিল, কতদিন সে পাঠশালায় পড়িয়াছে, পড়িয়াছে কি পর্যন্ত, যখন পাঠশালা ছাড়ে তখন তার বয়স কত, এই সব প্রশ্ন।

গোলাপী বলিল, পড়ছি খুব কম। তাও ভুলিয়া গেছি। আমার বিয়া হয় ন বছরের সময়।

ক' বছর?

ন বছর।

তখন কে কে পড়ত পাঠশালায়?

মানিকের বাপ, ভীম ঠাকুরপো, আমি, আকালীর বোন রক্ষাকালী, বারিবালা।

এ বাড়ির ছোট কর্তা পড়ত না?

হ, তিনিও পড়তেন।

তোমরা একসঙ্গে খেলা-ধূলা করতে বুঝি?

আমি আর রক্ষাকালী খেলতাম, পুরুষগো সঙ্গে খেলি নাই।

এই বাড়িতে কাজ করেছ কতদিন?

তা বছর খানেক হবে।

হঠাৎ না বলে কয়ে একদিন ছেড়ে দিলে কেন?—বলিয়া মলিনা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গোলাপীর দিকে তাকায়।

মলিনার তাকে বারবার ডাকার কারণ গোলাপী খানিকটা অনুমান করিয়াছিল, কিন্তু এইরূপ সোজাসুজি প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে কেমন যেন বিব্রত বোধ করিতে লাগিল।

মলিনা বলিল, কি জবাব করছ না যে?

গোলাপী তার মুখের উপর চোখ তুলিয়া এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, আমি সে দিন মান লইয়া ফিরছি। আর আসি নাই অপমান হওয়ার ভয়ে।

মলিনা চুপ করিয়া থাকে। বোধ হয় আপন মনে বার দুই আওড়ায়, বেচারী কুকুরটা।

সন্ধ্যার আগে গোলাপী উঠি উঠি করিতেছে এই সময় মলিনা কতকগুলি জামা কাপড় শাড়ি ব্লাউজ বাহির করিয়া গোলাপীর সামনে রাখিল।

গোলাপী বলিল, এগুলি দিয়া আমি করব কি?

প'রবে।

জামা পরলে লোকে আমারে ঠাট্টা করবে।

ঠাট্টা করবে ত বয়ে গেছে।

পাঁচ দরজায় খাটিয়া যারা খায় তারগো চলতে হয় পাঁচজনের মন যোগাইয়া।

মলিনা বলিল, বেশ, তুমি না পরলে। মানিকের বাবা রুগী মানুষ, তাকে পরিও। আর এগুলো কেটে ছেলে মেয়েদের জামা ইজের ক'র।

গোলাপী সেগুলি নিতে চায় না দেখিয়া মলিনা শেষটায় বলিল, ছোটরাণীকে দিয়ে ওদের জামা ইজেরের মাপ পাঠিয়ে দিতে পারবে ত?

তা পারব।

বেশ, আমি নিজেই কেটে জামা, ইজের, ফ্রক বানিয়ে দেব। মাপ পাঠাতে ভুলো না কিন্তু।

একটু পরে গোলাপী রওনা হওয়ার সময় মলিনা তার হাতে কয়েকখানি নোট গুঁজিয়া দিয়া বলে, এই থেকে কাবুলের দেনাটা দিয়ে দিও।

গোলাপী আপত্তি করে, না, না। আমার ছাওয়াল বড় হইছে, আমি এই টাকা—

তাতে কি? মনে কর আমি তোমার ছোটবোন—বলিয়া মলিনা তার হাত দু'খানি জড়াইয়া ধরে। গোলাপী আর 'না' করিতে পারে না, তার চোখ ছল ছল করে।

ফেরার পথে খালি মনে হয়, কী খাসা মেয়ে, কেমন সরল। ডাগর ডাগর চোখে সুন্দর হাসি-হাসি চাহনি কিন্তু তার পিছনে কোথায় যেন বেদনা লুকাইয়া আছে। সোনা দানা শাড়ি ব্লাউজ তাকে সুখী করিতে পারে নাই।

স্বামীকে ও তাকে লইয়া নিশ্চয়ই সে কিছু শুনিয়াছে, অনুমান করিয়াছে হয়ত তার চেয়েও অনেক বেশী।

গোলাপী লজ্জায় যেন মরিয়া যায়। ভাবে, ছিঃ, ছিঃ।

আজ তার মনে হয় নিজের ভাগ্যের কথা। যেখানে আশা করে নাই সেখানে পাইল অনেক কিছুই আর যেখানে আশা করিল সেখানে কিছুই জুটিল না। হয়ত তার বরাতে ইহাই লেখা ছিল।

হরিমতীর নিকট সে নিজে দেনা করিয়াছিল, পরদিনই তার টাকাটা দিয়া দিল। দিন তিন চার পরে মানিককে বলিল, ছোট মায়ের কাছে তোর ইজার আর কামিজের মাপ দিস। ফুটু ভুঁইয়ার বৌ বানাইয়া দেবে।

মানিক বলিল, কে দেবে?

ফুটু ভুঁইয়ার বৌ।

কেন তিনি আমারে ইজার দেবে কেন? আমি কি আর ছোট আছি? তোমার যেমন কাণ্ড।

গোলাপী বলিল, কেন, আমি করলাম কি?

তুমি তানারে ইজার আর কামিজের কথা বলছ বুঝি?

ছেলের কণ্ঠস্বরে উষ্মা লক্ষ্য করিয়া গোলাপী মলিনার টাকার কথা গোপন করিয়া গেল। শুধু বলিল, আমি কিছু কই নাই, সে নিজে দিছে।

মানিকের মন খারাপ হইয়া যায়। মলিনা তাদের ছোট মনে করিবে, তার জন্য ইজার বানাইবে ইহা যেন সে ভাবিতে পারে না। মায়ের উপর তার রাগ হয়।

এ এক নূতন আবিষ্কার, মলিনার কথা ভাবিতে বেশ লাগে। তার মনে পড়ে হরতালের আগের দিনে শোভাযাত্রার সময় জানালার পাশের সেই হাসি-হাসি মুখ, চোখে কাজল টানা, সিঁথিতে সিন্দুর।

চোরা কারবারী কে?—বলিয়া অনিল সেন তার দিকে চাহিয়া চীৎকার না করিলে সে হয়ত উঠিয়া যাইত না।

কথাটা মনে পড়ায় অনিলের উপর তার আজ রাগ হইল।

ছত্রিশ

যুদ্ধ থামিয়াছে, লোকে আশা করিয়াছিল সুদিন আসিবে। চোরা বাজার উঠিয়া যাইবে, জিনিস-পত্র সস্তা হইবে। চাউল আবার তিন টাকা মন, তেলের সের আট আনা, এক বোতল কেরোসিন দশ পয়সা। গরিব এই আশায় বাঁচিয়া থাকে কিন্তু সব জিনিসই দিনের পর দিন দুর্মূল্য হয়। গোলাপী সংসার চালাইতে হিমশিম খাইয়া যায়।

গোকুল একদিন গোলাপীকে বলিল, এখন নৌকাখানা পাইলে বেশ হইত।

গোলাপী বলিল, তুমি বাইতে পারতা ?

তা পারতাম না। বাইত ভীম আর জোনাব আলি। মানিকও সঙ্গে থাকত।—একটু থামিয়া গোকুল আবার বলিল, আর কিছুদিন পরে আমিও পারব। কি কও ?

গোলাপী কহিল, তা পারবা। তোমার মত বাইচা ত আর দেখলাম না।

দেখ নাই ?—গোকুলের ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটিয়া উঠে একটু ক্ষীণ হাসির রেখা।

কবিরাজী চিকিৎসায় বেশ কিছুটা সুফল হইয়াছে। গোকুল কারও সাহায্য ভিন্নই এখন হাঁটিতে পারে, রাত্রে যন্ত্রণা হয় না, কাঁপুনি নাই, মুখ দিয়া নাল পড়ে না। রীতিমত চিকিৎসা হইলে হয়ত সারিয়া উঠিত কিন্তু টাকার অভাবে মালিশের তেল চলে ত, বড়ি ও পাচন বন্ধ থাকে। বড়ি পড়ে ত সময়ের অভাবে গোলাপী সেক দিতে পারে না। তারও কাজ ঢের। জাঁতায় ডাল ভাঙ্গা, ঢেঁকিতে ধান কোটা হইতে শুরু করিয়া রান্না কাপড় কাচা সবই। সেও এখন ছোটরাণীর কাছে পড়ে, সেলাই শেখে, কুমিকে পড়ায়। তার উপর শরীরটাও কিছু ভারী হইয়া পড়িয়াছে। সঙ্গে দেখা দিয়াছে বাতের ভাব।

সারিয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গোকুল কেমন যেন গম্ভীর হইয়া যায়। কোন দিনই সে বেশী কথা বলিত না। এখন বলে আগের চেয়েও কম। প্রায়ক্ষণই ঊর্ধ্বে শূন্যের দিকে চাহিয়া থাকে। সিধুর বাড়ির তাল গাছের ডগায় ডগায় বাবুইর বাসা দেখে, দেখে নীল আকাশে বকের পাংকের মতন শাদা শাদা মেঘের টুকরা। আর কি যেন ভাবে।

মানিক উহা লক্ষ্য করে। তার মনের কথা জানিতে চায়, দরদ ভরা প্রাণ লইয়া ধীরে ধীরে বাপের দিকে আগাইয়া আসে।

একদিন সে প্রশ্ন করিল, তুমি সব সময় কি ভাব, বাবা?

গোকুল বলিল, ভাবি না। ছবির মতন দেখি।

কি দেখ? চিল, বক, শাদা মেঘ?

না, দেখি বাবুইর বাসা, মধুমতীর দুরন্ত ঢেউ, এক এক সময় এক এক জিনিস। চ্যাংরে দেখি। কাল দেখতেছিলাম কালা কালা সৈন্যেরা আমারে তাড়া করছে।

চ্যাংরে দেখ? বরিশালের সেই চ্যাং?

গোকুল এই প্রশ্নের কোন উত্তর করিল না।

এরপর একদিন সে আপনা হইতেই বলিল, আজ সকালে দেখলাম খাবারের দোকান, কত মিঠাই তৈয়ার হইতেছে, সামনে একদল ভিখারী, মাংসের দোকানের সামনে কুকুরের মতন লক লক করে জিব।

শাদা আলখাল্লা পরা একটা বাবু আমার মাথায় ছুরি চালায়, তার চার ধারে অনেক লোক।—বলিতে বলিতে গোকুল চুপ করিয়া গেল। তার মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল অন্ধকারের মধ্যে কি যেন হাতড়াইতেছে।

এইরূপ কাটা কাটা পরস্পর অসংলগ্ন কতগুলি ছবি, জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলির টুকরা টুকরা স্মৃতি তার চোখের উপর ভাসে। সে চেষ্টা করে সেগুলি জোড়া তালি দিবার। কিন্তু জোড়া লাগে না।

একটুক্ষণ পরে সে বলিল, আজ মনে পড়ছে। আমিও ঐ ভিখারীর দলে ছিলাম, দৈত্যের মতন কালা কালা কতগুলি সৈন্য আইল। তারপর, তারপর একটা রাস্তা। সেখানেও একদল ভিক্ষুক।

দেশটা যেন ভিক্ষুকে ভিক্ষুকে ছাইয়া গেল, মানিক। তার মধ্যে আমিও একজন। আর একটা মানুষ ট্যারা, মুখের এধারে ওধারে কাটা দাগ। একটা নাক খসিয়া পড়ছে।

বলিতে বলিতে গোকুল থামিয়া গেল। তার মুখে পড়িল একটা ভীতির ছাপ।

মানিক বারিবালার কাছে ট্যাবা মুখ, কাটা দাগওয়ালা ভীষণ দর্শন একটা মানুষের কথা শুনিয়াছিল। সে গোকুলকে দিয়া ভিক্ষা করাইত। ভিক্ষা বেশী না হইলে মারিত।

মানিক বলিল, তুমি চুপ কর বাবা, চুপ কর।

সেই দিনই সে মায়ের কাছে বলিল, যা ভাবছিলাম তাই ঠিক। বাবা ভিখারীগো জন্ম খাবার কাড়তে গেছিল। তার নিজেরও খিদা পাইছিল।

ছেলের মুখে সব শুনিয়া গোলাপী একটু হাসে। সে হাসি স্বামীর প্রতি বিশ্বাসের, তার উপর নির্ভরতার। এ কথা ত তার কাছে নূতন নয়, সবই যেন সে জানিত।

মানিক মায়ের নিকট হইতে ফিরিয়া দেখিল তার বাপ অঘোরে ঘুমাইতেছে। শ্রান্ত কিন্তু আত্মতৃপ্ত মানুষের সুখ নিদ্রা।

ক্রমে ক্রমে গোকুলের পুরানো দিন আবার ফিরিয়া আসে। শুরু হয় কুমি মানিক গোলাপীকে লইয়া আগের সেই শান্তিময় জীবন। আসে ভীম—তার বলিষ্ঠ প্রেম ও সহানুভূতি লইয়া।

মণিরামের বড় রাণী বাপের বাড়ি ফিরিয়াই ভীমকে গৌরীগ্রামে পাঠাইয়া দেয়। সে সেই হইতে মাঝিগিরি করিতেছে। নৌকা লইয়া দশ বিশ পঞ্চাশ মাইল দূরে দূরে ঘোরে। বাড়ি থাকে খুবই কম।

কিছুদিন আগের কথা, একদিন সে রতন কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করে, গোকুল ভাইর জন্ম জোরকারী দুই একটা খাবারের নাম কর দেখি, গরিবে যা কেনতে পারে এইরকম কবেন। আপনার চিকিচ্ছায় বেয়াধি কমছে কিন্তু শরীল সারে নাই।

কবিরাজ কতগুলি পথ্যের কথা বলিলেন।

ভীম প্রথম প্রথম কবিরাজের তালিকা অনুযায়ী ফল ফলারি আনিত, কয়বার আনিয়াছে টিনে আঁটা বিলাতী পথ্য। আজকাল যেখানে ভাল যাহা পায় তাহাই লইয়া আসে, কখনও ফরিদপুরের পাটালি, কখনও বা চিকন্দীর দই ক্ষীর। কোনবার বা যশোহরের কাঁঠাল। একবার আনিল বরিশালের গার্ল স্কুলের পাশে এক দোকানের বিখ্যাত রসগোল্লা।

গোলাপীর সঙ্গে দেখা করে না, দেখা হইলেও কথা বলে খুব কম। গোলাপী ইহাতে ক্ষুণ্ন হয়। স্বামীকে সে ভালবাসে অথচ ভীমের উপেক্ষাও সহ্য করিতে পারে না। নারীর ইহাই স্বভাব। একবার যার ভালবাসা পাইয়াছে সেই পুরুষ নিজের গণ্ডীর বাহিরে চলিয়া যায় কোন নারীই ইহা পছন্দ করে না।

একদিন ভীমকে একলা পাইয়া সে প্রশ্ন করিল, তুমি আমাকে ভয় কর নাকি, ঠাকুরপো?

ভীম বলিল, তা করি, তোমরা যে ছলনাময়ীর জাত। কত ছলা কলা—

ছলা কলা কি করছি আমি?

গোলাপী মুখ তুলিয়া দেখে ভীম হন হন করিয়া চলিয়া যাইতেছে।

সেই দিন সে স্বামীকে যত্ন করিয়া তেল মাখায়, স্নান করাইবার সময় মনে হয় যেন আদর করিতেছে। অনেকদিন সে কিছু পায় নাই, দীর্ঘকাল বঞ্চিত এই নারীর বুকে তাই বোধ হয় ঝড় বহিতেছিল।

গোকুলও স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া ছিল, গোলাপী তাহা ধরিতে পারিল না।

সাঁইত্রিশ

কিছুদিন যাবৎ নিস্তারের অসুখ। ঘুষঘুষে জ্বর, অতিসার, পা ফুলা, কবিরাজ বার্লি ও শুকনা মানকচু সিদ্ধ জল পথ্য দিয়াছেন। এই পথ্যের সঙ্গে সামান্য একটু চিনি যোগাড় হয় না, খাইতে হয় গুড় দিয়া। সে গুড়ে গন্ধ পায়। পথ্য মুখে দিলেই বমি আসে।

তার অবস্থা খারাপ হওয়ায় ভীম একদিন চিনির জন্য রামনাথদের দোকানে গেল। তার রেশন নিতে হয় এই দোকানে। সে চিনির জন্য পীড়াপীড়ি করিলে হরনাথ বলিল, তোর না এ ক্লাশ টিকিট?

আমরা মরলেও কি তোমরা কেলাস আঁকড়াইয়া থাকবা?

হরনাথ বলিল, কি করব? আইন ত আর আমরা করি নাই।

আমারে অন্ততঃ একপোয়া চিনি দেও, আমি একটা টাকা দিয়া যাই।

টাকার কথায় হরনাথের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। আমাকে কি চুরি করতে বলিস নাকি? যা, মাকে গুড় খাওয়া গিয়ে।

সে পরামর্শের জন্য তোমার কাছে আসি নাই। ও আমাগো খোঁড়া বাঁশীরামই দিতে পারত।

এ্যাঁ, এ্যাঁ, যতবড় মুখ নয় তত বড় কথা, হরনাথ গর্জন করিয়া ওঠে।

উচ্য বাচ্য না করিয়া ভীম ধীর পদে বাহির হইয়া যায়।

সে বাড়ি ফিরিলে নিস্তার জিজ্ঞাসা করিল, কি এট্টু মিষ্টি পাইছ?

ভীম একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, মিষ্টু! মিষ্টু খাবে। তোর মনে থাকে না যে চিনি আমাগো জন্য না? আমরা খাব গুড়। গুড় খাইতে না পার ত উপাস করিয়া মর্।

নিস্তার একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে। পথ্যের অভাবে তার অবস্থা

দিনের পর দিন খারাপ হয়। বিছানা হইতে উঠিতে পারে না। গাল ভাঙিয়া যাওয়ায় সামনের দাঁত দুটা আরও বড় দেখায়। নিজের মুখে হাত বুলাইতে বুলাইতে বৃদ্ধা একদিন বলিল, আর বাঁচব না।

ভীম সামনে ছিল। সে প্রশ্ন করিল, বোঝলা কিসে?

আমার দাড়ি দু'গাছা ত নাই।

ভীম হাসিয়া বলিল, দাড়ির সঙ্গে বাঁচা না বাঁচার সম্পর্ক কি?

দাড়ি দু'গাছা লোপ পাওয়ায় নিস্তারের মৃত্যুভীতি বাড়িয়া গিয়াছে।

এর কয়েকদিন পরে গুড় মিশানো দুধ বালি মুখে দিয়াই সে বমি করিয়া ফেলিল, দমবন্ধ হইয়া আসিল, সর্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। সে ভীমকে বলিল, আমারে বাইরে নিয়া চল।

ভীম বলিল, ভয় নাই, বুড়া, ভয় নাই।

ঘরে—ঘরে মরলে তার ধারে আর যাইতে পারব না।

নিস্তারের বিশ্বাস ঘরে মরিলে পরলোকে সে ভীমের বাপের কাছে যাইতে পারিবে না। তাই ঘরে মরিতে চায় না, চায় মুক্ত আকাশের নিচে মরিতে।

পারবি রে বুড়া, পারবি বাবার ধারে যাইতে—বলিয়া ভীম কতগুলি শুকনা পাতা জড় করিয়া আগুন ধরায়। নেকড়ার পুঁটলি করিয়া মাকে সেক দিতে যাইয়া দেখে তার চোখ কপালে উঠিয়া গিয়াছে। মুখে নীল আভা।

'রাম' 'রাম' বলিতে বলিতে ভীম পাঁজা কোলে করিয়া মাকে উঠানে লইয়া আসে। তার হাতের উপরেই বৃদ্ধার শেষ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া যায়।

অন্ধকার রাত্রি, আকাশে ম্লান এক টুকরা চাঁদ, দু'পয়সা দামের বিলাতী কুমড়ার ফালির মতন সরু। তার চারধারে অংসখ্য তারা,

যেন কতগুলি বসন্তের গুটি। গুটিতে গুটিতে দিগন্ত ছাইয়া গিয়াছে।

ভীম কিছুক্ষণ একদৃষ্টে ঐ দিকে চাহিয়া ছিল। তারপর উঠিয়া পাশের দোপাটি ফুলের গাছটাকে শিকড় সমেত টানিয়া তুলিল। সে এক একটা করিয়া ফুল ছেঁড়ে, পাতা ছেঁড়ে, ডালগুলি মট্ মট্ করিয়া ভাঙ্গে। এই ধ্বংসের মধ্যে এক আনন্দ পায়।

নিস্তারের শ্রাদ্ধের বাকী মাত্র চারদিন। ভীম পুরোহিত বাড়িতে শ্রাদ্ধের ফর্দ আনিতে গিয়াছিল। ফেরাব সময় পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিল, কিরা করিয়া রাখতে না পারলে পাপ হয় নাকি, ঠাকুর?

পুরোহিতের নাম মধু চক্রবর্তী, লোকে বলে মধুচক্র। সে বলিল, তা হয় বৈকি।

সেই পাপ দেহ লইয়া মা বাপের কাজ করা যায়?

কে শপথ করছে, কেন কবল, না জানিয়া কব ক্যামনে? পাতি দেওয়া কি এত সোজা?

তা ত নয়ই, সোজা হইলে আর আপনার কাছে আসব কেন?

ব্যাপারটা তোর না কি?

না পুরোইত। আমার আবার ব্যাপার কি? গরিব মানুষ। তবে মনে বড় ডুসকু, চিনি না পাইয়া বুড়ি চলিয়া গেল। একটু চিনি দিতে পারলে হয়ত মরত না।

মধুচক্র বলিল, তা জানি। সেইজন্য বামুনরে দু' পাঁচ সের চিনি দিবি ভাবছিলি বুঝি?

তা ভাবি নাই। একরত্তি চিনি বিহনে যার মা মরে সে ভাববে দু' পাঁচসের চিনি দেওয়ার কথা!

ভাববে না কেন? ভাবা ত উচিত! এ যে ব্রাহ্মণং। বামুনরে দিলে মরা মানুষ স্বর্গ পায়।

এ নিয়ম ত তোমরাই করছ। তাই না ঠাকুর?

পরদিন শ্রাদ্ধ। ভীম তারণের দোকানে গিয়াছে শ্রাদ্ধের জিনিস পত্র কিনিতে। ফর্দ সামান্য, তিল চাউল ডাল গামছা গুড় পিতলের সরা। তারণের ভাই শরণ পিছনের গুদামে তিল আনিতে গেল। তারণ সেখানে মাল মিলাইতেছিল। সে ভাইকে বলিল, রামু সরকার আমাগো ঠকায়। পুস্কর্ণীতে ক্রেচ তেলের জের লুকাইয়া রাখছে আর আমাগো কয় তৈল আসে নাই।

তারণের কথা শুনিয়া ভীমের মাথার ভিতর যেন বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলিয়া গেল। সারাটা দিন সে উসখুস করিতে লাগিল, কখন সন্ধ্যা হইবে অন্ধকার নামিবে।

অমাবস্যার রাত্রি, গৌরীগ্রাম গচা পাড়া আমতলী জুড়িয়া নামিয়াছে অমার অন্ধকার। ভীম সেই আঁধারের মধ্য দিয়া বুনো জানোয়ারের মতন চলে। চলে জেলা বোর্ড লোকাল বোর্ডের রাস্তা এড়াইয়া, পোড়ো ভিটা, ঝোপ ঝাড় জঙ্গল ভাঙ্গিয়া। সরকার বাড়িতে পশ্চিমের নালা পার হইয়া হাঁটু পর্যন্ত কাদা লইয়া তাদের পিছনের পুকুর পারে আসিয়া দাঁড়ায়।

একটু আগেই বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। জোলো হাওয়ায় ভিজা মাটি ও ঘাস পাতার গন্ধ। জায়গাটা নির্জন, পুকুরের উত্তরে বাগান, তারপর সরকারদের বসত বাটি। দক্ষিণে নালার পর ধানের খেত। যতদূর চোখ যায় ধু-ধু করে ধান আর ধান, পুবের মাঠও ধানে ছাওয়া। পশ্চিমে এক গৃহস্থের বাড়ি ছিল। আজ বিশ বৎসর সেখানে কোন

বসতি নাই। ঐ পোড়ো ভিটার পাশ দিয়া নালাটা ঘুরিয়া আকাশের খালে গিয়া মিশিয়াছে।

ভীম একটুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। কোথাও জন মানবের সাড়া নাই, আলোর রেখা নাই। মেঘে ভরা আকাশ, এমন একটু ফাঁক নাই যার ভিতর দিয়া একটা তারা উঁকি মারিতে পারে। এই নীরব অন্ধকারই তার চাই। চাই এইরূপ নৈঃশব্দ্য।

এঁদো পুকুর। চার পাশে ঘন-ঘন গাছ, ঝোপ ঝাড়। পুকুরে মানুষ প্রমাণ ধাপদল। কালো বাজারের জিনিস লুকাইয়া রাখার মতন এমন জায়গা বুঝি আর নাই। এ যেন চোরা কারবারীর কাশীধাম।

নালার পাশ দিয়া ভীম জলে নামে, হাঁটু পর্যন্ত পাঁকে ডুবিয়া যায়। পচা গন্ধ আসে। ভুড় ভুড় শব্দ হয়।

ভীম কচুরি পানা ঠেলিয়া আগাইয়া যায়। পায়ে কাঁটা বেঁধে, গা চুলকায়। সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চার হাত পা দিয়াই সে কেরোসিনের কেনেস্তারা খুঁজিতে থাকে।

আকাশের রূপ বদলায়। এতক্ষণ ছিল কালো, কোথায়ও বা জমাট বাঁধা সিমেন্টের মতন। এবার লাল হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে গাছপালা সমেত প্রকৃতির রূপও বদলাইল। বিবাহের পরদিন ভোরে নববধূকে দেখিতে যেমনটি হয় ঠিক সেইরূপ।

ভীমের ভয় হয়, এই আলোতে পাছে কেহ তাকে দেখিয়া ফেলে। সে মুখ তুলিয়া এদিক ওদিক তাকায়, কিছুই দেখিতে পায় না।

হঠাৎ চোখে পড়ে একটা গোখরো সাপ। হাত তিন চার দূরে ধাপের উপর সাপটা ফণা নাড়িতেছে। ফণাটা পাশের কচুরি পানার চেয়ে প্রায় আধ হাত উঁচু। আকাশের লালিমা প্রতিফলিত হইয়া তার মাথার চক্র জ্বল জ্বল করে, স্পষ্ট দেখা যায় তার ছোট দুটী চোখ।

সাপটা একদৃষ্টে ভীমের দিকে চাহিয়াছিল, ভীমও তার উপর হইতে চোখ ফিরাইতে পারিল না।

খানিকক্ষণ পরে ঘাসের উপর সাপের চলার সর সর শব্দে সে আত্মসম্বিত ফিরিয়া পাইল। বলিল, মা, মা মনসা।

সাপটা চলিয়া গেলে শুরু হইল সন্ধান, ভীম চার হাত পা দিয়া খোঁজে। খুঁজিতে খুঁজিতে পায়ে একটা টিন ঠেকিল। পাশেই আর একটা। কচুরিপানা ঠেলিয়া জলে ডুব দিয়া দেখিল পাশাপাশি কতকগুলি কেনেস্তারা। সবগুলি একসঙ্গে লোহার শিকল দিয়া বাঁধা।

ভীম হাতুড়ি ও ছেনি লইয়াই আসিয়াছিল। সে আবার ডুব দিয়া একটা টিনের নিচে ফুটা করিয়া দিল। তার বুক উৎসাহে ফুলিয়া উঠিল।

সে এক একটা ডুব দেয় আর টিনের গায়ে ছেনি লাগাইয়া ঠুক করিয়া আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে তেল বাহির হইয়া আসে। পাঁকের গন্ধ চাপা পড়ে কেরোসিনের উগ্র গন্ধে।

সে উঠিল সর্বাঙ্গে পাঁক, পানা ও কাঁটা শেওলা জড়াইয়া। যেন একটা ভূত। আকাশ প্রকৃতি আবার কালো হইয়াছিল। ভীম মিশিয়া গেল সেই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে।

বাড়ি আসিয়া সে ভাল করিয়া হাত পা ধোয়। সরিষার তৈল মাখিয়া স্নান করে। এক মাস পরে আজ তার ভাল ঘুম হয়। ওঠে পরদিন বেশ একটু বেলায়। দেখে উরুর উপরে বড় একটা জোঁক রক্ত খাইয়া ফুলিয়া দেহের সঙ্গে লেপটাইয়া গিয়াছে। সেটাকে তুলিয়া ফেলার সময় মনে হইল গত রাত্রের সাপের কথা। সে নিজের অজ্ঞাতেই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

সকালে গ্রামের লোক দেখিল আকালের খালে জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে কেরোসিন ভাসিয়া চলিয়াছে। পাঁচজনের মুখে মুখে খবরটা ছড়াইয়া পড়ে।

আকালী বলিল, দেখলা কাণ্ড! রাত্তিরে আলোর অভাবে চাওয়াল মাইয়ার মুখে আমরা একফোঁটা পথ্য দিতে পারি না, আর অরা তেল জলে ভাসায়।

ইউসুফ বলিল, কাণ্ডটা করল কেডা?

আর একজন মন্তব্য করিল, যে করছে তার বুদ্ধির তারিফ করতে পারি না। যেতি করলি ত করলি। তেল নিয়া বেচলেই হইত।

খোকা মহারাজ বলিল, উঁহু। করছে গায়ের ঝাল মেটাবার জন্য। মানুষটা চোর না।

মধুচক্র শ্রাদ্ধে বসিয়াছে। সে নাক দিয়া শব্দ করে, হুঁ হুঁ আর মন্ত্র পড়ায়, বল্ ভীম, নিস্তারং বাউতি স্বাহা, তস্য স্বামী পরশুরামং স্বাহা। যমং নমঃ, গঙ্গাং নমঃ, বিষ্ণু শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য সকল দেবতা নিস্তার অক্ষয় স্বর্গকামং সোয়াধা; তিল, কলা, গুড়, দই সোয়াধা। ক্রেচতৈলং—

ভীম পুরোহিতের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র আওড়াইতেছিল। সে বলিল, ক্রেচ তৈল ত ভুজ্যে দি নাই। ক্রেচ তেলের সোয়াধা কেন?

না, ও কিছু না। মুনীনাঞ্চ মতি ভ্রমং। খালের তেলটা চোখের উপর ভাসতেছিল। আর তেলের গন্ধও পাইতেছিলাম।

ও আপনার ভেরম, ঠাকুর।

যাক্, তুই মন্তর পড়্ হ্রীং ক্লিং ফট্। দক্ষিণাং ওঁ। কত দিবি?

এক টাকা দেব পুরোহিত।

মোটে এক! যাউক তোরা পুরানা যজমান। দে, ঐ এক টাকাই দে, টাকাটা অচল না ত?

না, খুব ভাল টাকা। কেমন চক চক করে দেখেন না?

ভোজন দক্ষিণা দু' আনা বেশী দিস্ কিন্তু। এখন পড়্ নিস্তার স্বর্গকামে দক্ষিণা রৌপ্য মুদ্রাং, পুরোহিত মধুচক্র, যজমান নিস্তার পুত্রং ভীম চন্দ্রং। ওঁ বিষ্ণু, ছিরি বিষ্ণু, পুণ্ডরীক পুনাতু।

আটত্রিশ

নরেন, আকালী ও ভীমের সঙ্গে মানিক মাটি কাটিতে যাইবে। কাজ জনকল্যাণের। গৌরীগ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া আমতলীর মধ্য দিয়া লাড়ুয়ার অক্ষ গ্রান পর্যন্ত নূতন রাস্তা হইবে। এতদিন লোকাল বোর্ড ও জেলা বোর্ডের সদস্যেরা সরকারী টাকায় নিজ নিজ বাড়ির নিকটে রাস্তা তৈরি করিয়াছেন, পুকুর কাটাইয়াছেন। এবারের এই রাস্তা হইবে গরিব চাষী মজুরের সুবিধার জন্য।

কল্যাণের সভ্যেরা বিনা মজুরিতে মাটি কাটে, হাজামজা পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করে, টিউব ওয়েল বসায়। কাজ নানা রকম! প্রতিদিনই কোন না কোন দলের সঙ্গে থাকে সুকুমার।

মানিক গুড় মুড়ি খাইতে বসিয়াছিল এমন সময় উঠান হইতে কে যেন ডাকিল, মানিক।

কণ্ঠস্বর অমূল্যের। মানিক ভাবে, এ সময় অমূল্য কেন?

আজকাল তার মনে এই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। দু'জনে দেখা শুনা হয় কম। ঘনিষ্ঠতা ত নাইই। অমূল্য বড় মানুষের ছেলে। সে গরিব চাষী; অমূল্য তার ক্লাসের ফার্ষ্ট বয়, আর সে করে ঘরামিগিরি, মাঝিগিরি—যখন যা পায়।

কুমি ছুটিয়া আসিয়া বলিল, দেখ দেখ দাদা, কেডা আইছে।

তার পিছন পিছন আসিল অমূল্য। গোলাপী তার বসার জন্

শাড়ীর পাড়ের তৈরি আসন দিলে অমূল্য বলিল, আমি এখন বসব না খুড়ীমা। আসব আর এক দিন।

গোলাপী বলিল, আসা ত ছাড়িয়াই দিছ।

অমূল্য বলিল, মোটেই সময় পাই না। আজ এসেছি মানিকের কাছে। খুব দরকার।

কিন্তু না আসার কারণ অন্যরূপ। মানিক জনকল্যাণে যোগদানের পর হইতে হারাণ ছেলেকে তার সঙ্গে মিশিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে।

অমূল্য মানিককে বাহিরে ডাকিয়া কি যেন বলিয়া গেল।

গোলাপী জিজ্ঞাসা করিল, অমূল্য কি কইল রে মানিক?

আমারে কল্যাণে যাইতে মানা করল। পুলিস নাকি অনেকের নাম নিয়া গেছে।

গোলাপী বলিল, তা হইলে তুই আর যাস্ না। আমি ত অনেক দিনই ভাবছি মানা করব। আর তোর মাটি কাটতে যাইয়া কাজ নাই।

আজ যাই মা। এর পর দেখি ভীমকা ছোটমা অরা কি কয়।

গোলাপী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, আমার থা' ছোট মা হইল তোর বেশী?

কিছুদিন হইতে তার মনে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। ছোটরাণীর সঙ্গে তার নিজের খুব ভাব, সে তাকে ভালবাসে। কিন্তু মানিকের উপর তার প্রভাব সহ্য করিতে পারে না। মাতৃত্ব গোলাপীকে পীড়া দেয়।

আর একবারও এই রকম হইয়াছিল। মানিক মণিরামের গল্প করিত, গর্ব করিত জেঠাকে লইয়া। গোলাপীর ভয় হইত, ছেলে হয়ত পর হইয়া যাইবে। বাপ মার চেয়ে জেঠা তার কাছে বড় হইয়া উঠিবে।

ছোটরাণী ফুল তুলিতে তুলিতে তাদের দিকেই আসিতেছিল। ফুল তোলে আর গুন গুন করে। ভাঁজে বৈষ্ণব পদাবলীর সুর।

গোলাপী বলিল, অ দিদি, জান অমূল্য কি কইয়া গেছে?

ছোটরাণী অন্যমনস্কভাবে বলিল, কি কইছে?

শীগ্‌গীরই ধরপাকড় শুরু হবে। মানিকরে তাই কল্যাণে যাইতে মানা করছে।

মানিক বলিল, বাঃ রে; ধরপাকড়ের কথা হইল কখন?

গোলাপী বলিল, সে তোরে যাইতে মানা করছে কেন শুনি?

মানিক হাসিয়া বলিল, তোমার ভালবাসার সঙ্গে আর পারার জো নাই।

গোলাপী বলিল, ছিলি একটা কাদার দলা। এত বড় করিয়া তুলছি এখন ত আর পারবিই না। বৌ আইলে আরও কত দেখব। আচ্ছা, তুমি কও দেখি দিদি, অর কি মাটি কাটতে যাওয়া উচিত?

তার অবস্থা দেখিয়া মানিক ও ছোটরাণী মুচকি মুচকি হাসে। হাসি চাপিয়া ছোটরাণী বলে, তুই ভয় পাইয়া গেছিস দেখতেছি।

ভয় পাওয়ারই ত কথা, তুমি পাইতা না?

আমি মা হইলে ছাওয়ালরে কিন্তু পাঠাইতাম।

পাঠাইতা?—গোলাপী বিস্ময় প্রকাশ করে।

ছোটরাণী বলে, নিশ্চয়, ভয় পাইয়া আমার ছাওয়াল কাজে পিছাইয়া যাবে, এ আমি ভাবতেই পারি না।

মানিক হাত তালি দিয়া লাফাইয়া ওঠে। বলে, দেখলা দেখলা মা, ছোট মায়ের ভয় নাই।

একটু পরে নরেনরা আসিলে মানিক তাদের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। গোলাপী স্বামীর কাছে দুঃখ করে, ছোড়দি কি যেন মন্তর জানে। মানিকরে ও আমার পর করিয়া দেবে।

গোকুল বলিল, ভয় নাই, মাইনকারে তুমি এখনও চেনলা না

তাছাড়া এমন ভয়টাই বা কিসের? সাঁতরাইয়া যখন এতখানি ওঠছে তখন ভগবান কি শেষটায় ডুবাইয়া দেবে? তা দেবে না।

আজকাল সে প্রায়ই সাঁতরাইয়া ওঠার কথা বলে। তার মনে হয় ঢেউয়ের পর ঢেউ কাটাইয়া দুঃখ দরিয়ার শেষ প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সামনেই সবুজ ঘাসে ও সাদা কাশের গোছায় ছাওয়া তীর, ঐ তীরের নাগাল সে পাইল বলিয়া।

কয়েকদিন পরে ভীম গ্রেপ্তার হইল। থানায় যাইয়া সে বড় দারোগাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমারে ধরছেন কেন?

দারোগা বলিলেন, তোকে তার জবাবদিহি করতে হবে নাকি?

কি দোষে আমারে ধরছেন তাও আমি জানতে পারব না?

দারোগা গম্ভীর কণ্ঠে আওয়াজ করেন, হাণ্ড্রেড্ এণ্ড টেন।

ভীম তার দিকে চাহিয়া থাকে।

তুই চুরি করিস, কথায় কথায় লাঠিবাজী করিস, লোকে তোর ভয়ে অস্থির হয়ে পড়েছে।

ভীম ত অবাক্। সে বলে, আমার ভয়ে গ্রামের মানুষ অস্থির হইতেছে! এ ত বড় তাজ্জব।

নন্দী বাড়িতে চড়াও হয়ে তুই মানুষের মাথা ফাটিয়েছিল না?

অন্য সময় হইলে ভীম হয়ত বলিত, হ, আমিই ফাটাইছি হুজুর। সে কথা অস্বীকার যাব না। কিন্তু তার মনে পড়িল সুকুমারের সতর্ক বাণী। থানায় আসার সময় সুকুমার তাকে বলিয়া দেয়, খবরদার, থানায় মুখ খুলবি না কিন্তু—

দারোগা বলিল, কিরে কথা কইছিস না যে?

আমার কিছু কওয়ার নাই।

তাত থাকবেই না। মেয়েরা ঘাটে গেলে তাদের দিকে চেয়ে শিস দিস কেন বল দেখি? 'উহুঁহুঁ প্রাণ গেল' বলে গান গাস।

ভীম আর চুপ করিয়া থাকিতে পারে না, সুকুমারের সতর্কবাণী ভুলিয়া যায়। বলে, কয় কোন্ ভঁড়ুয়া? আমি ইস্ত্রিলোকের দিকে মুখ তুলিয়াও তাকাই না!

বেটা সাক্ষাৎ শুকদেব। গোকুল যখন উধাও হয়েছিল তখন তার বাড়ি গিয়ে তার বৌকে কি গীতা শোনাতিস, না ভাগবত?

আপনে ক্ষ্যামা দেন কইতেছি—ভীমের চোখ দুটা লাল হইয়া উঠিল।

ক্ষমা! ক্ষ্যামা দেব, ইউ ড্যাম—

* * * *

সেই দিনই গফুর আসিয়া গ্রামে খবর দিল, ঘাঘরে দেখলাম পুলিস ভীমরে নৌকায় করিয়া মহকুমায় লইয়া চলছে, তার মাথায় পট্টি বাঁধা, কপালে কালশিরা পড়ছে।

লোকে থানা পুলিসের উপর রাগিল, যাদের চক্রান্তে ভীম গ্রেপ্তার হইয়াছিল তাদের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। আর হারাণ পাইল ভয়। সে দারোগার নিকট পুলিস পাহারা চাহিয়া পাঠাইল।

সরকার পক্ষে মামলা চালাইলেন গভর্ণমেণ্ট প্লীডার রায় বাহাদুর কেশব চৌধুরী। হারাণ টাকা দিয়া তদ্বির করাইল, সাক্ষী সাজাইল। হরনাথ লোকের কাছে গল্প করিয়া বেড়াইত, এই ত সবে শুরু। দেখ না কল্যাণের বেটাদের কি রকম জব্দ করছি।

কোর্টে প্রথমে মধুচক্রের জবানবন্দি নেওয়া হয়। কেশব বাবু মধুচক্রকে জিজ্ঞাসা করেন, নন্দীবাবুদের পুকুরে কেরোসিনের টিন ছেঁদা হয়েছে। সে সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন?

জলে তেল ভাসতে দেখছি, আমার চক্ষুর সামনেই কয়েকজন মানুষ পুষ্করণীর ভিতর হইতে ফুটা টিন উঠাইয়া নিছে।

কে ছেঁদা করেছে বলে আপনার বিশ্বাস?

মধুচক্র মাথা চুলকায়।

ভীমের সঙ্গে এই ব্যাপারেব কিছু সম্পর্ক আছে বলে আপনার মনে হয়?

হয় হুজুর।

কেন হয় হাকিম বাহাদুরের দিকে চেয়ে বলুন।

ভীমের গলায় তখন কাছা, ও একদিন আমায় জিজ্ঞাসা করল, কিরা করিয়া রাখতে না পারলে পাপ হয় কি না। আমি কইলাম, হয়। ও শুধাইল, সেই পাপ দেহ লইয়া মা বাপের কাজ করা চলে কি না। আমার সন্দ হইল।

কেশব জিজ্ঞাসা করিলেন, কি সন্দ?

ভীম কোনও কিরা করছে, তাই রাখতে না পারিয়া অর মনে জ্বালা ধরছে।

আপনি ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না? হাকিমের দিকে চেয়ে বলুন।

তা করলাম বই কি। শুধাইলাম কিরাটা তোর নাকি? ভীম জবাব করল, আমার আবার কিরা কি পুরোইত, যার মা একটু চিনি বিহনে চলিয়া যায়?

আপনি আর কিছু জিজ্ঞাসা করলেন?

না, হুজুর। আমি পড়লাম ভাবনার কুম্ভীপাকে। আমি কুল পুরোইত, অর হিত করা আমার কাজ। আমার ভয় হইল ও রাগের মাথায় কিছু অন্যায় করিয়া না বসে। পরের অনিষ্ট।

ভীমের মোক্তার শরৎ সেন মন্তব্য করিলেন, সেই জন্যই মায়ের শ্রাদ্ধ সেরে এখানে এসেছ ছেলের শ্রাদ্ধ করতে?

কেশব আবার প্রশ্ন করিলেন, আপনার ভয়ের কথা কাউকে বললেন ?

মধুচক্র কহিল, তা কি পারি হুজুর ? আমি যে অর কুল পুরোইত।

শরৎবাবুর মন্তব্য শোনা গেল, বউকেও বলনি ?

মধুচক্র বলিয়া উঠিল, ওরে বাপ, তারে আপনে চেন না।

উঠিল হাসির লহর।

কেশব বলিলেন, ভীম যখন মায়ের শ্রাদ্ধে বসেছিল তখন আপনি তার গায়ে কেরোসিনের গন্ধ পেয়েছিলেন ?

একথা আপনারে কইল কেডা ?

যেই বলুক, গন্ধ পেয়েছেন কিনা বলুন।

হ, পাইছি গন্ধ। উঠানে একখানা কাপড় শুকাইতেছিল। ভীমা যখন বোঝল সেই কাপুড়ের গন্ধ আমি ধরিয়া ফেলছি তখন কইল, কারও কাছে কইও না, ঐ কাপুড় পরিয়া আমি ক্রেচ তেলের কেনেস্তারা ফুটা করছি। বেটারা আমার মায়ের জন্য একটু চিনি দেয় নাই।

ভীম গর্জন করিয়া উঠিল, মিছা কথা কইও না ঠাকুর। তুমি না বামুনের পো ? কত মিছা আর কবা ?

সুরযমল সাক্ষ্য দিয়া গেল যে একবার চাউল চালানের সময় ভীম নন্দী বাড়িতে চড়াও হইয়া তার মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে।

ভীমের দুশ্চরিত্রতা সম্পর্কে জবানবন্দি দিল সিধু। সে বলিল, গোকুল মামা যখন উধাও হইছিল ভীম তখন রোজ রাত্তিরে তার বউর লগে গুজুর গুজুর করত।

ভীম চীৎকার করিয়া উঠিল, আমার মুখের দিকে চাইয়া ক দেখি, হারামজাদা।

• হাকিম ধমক দিলেন, Stop.

শীতল পণ্ডিত বলিয়া গেলেন, সরকারী দেনা পারশোধ করার সময় ভীম হাকিমকে পর্যন্ত ধমক দেয়, তাঁর দিকে চেয়ে হাত মুঠো করে লাফিয়ে ওঠে।

ব্যাপার এই; মন্বন্তরের বৎসর সরকার যৌথ ঋণদানের ব্যবস্থা করেন। ইউনিয়ন বোর্ডের মারফৎ দশজন গৃহস্থকে এক সঙ্গে পঞ্চাশ বা একশ টাকা ঋণ দেওয়া হয়। অনেকেই নিজের ভাগের টাকা পুরা পায় নাই। এক গ্রুপের মধ্যেও ইতর বিশেষ হইয়াছে। কেহ পুরা পাইয়াছে, কেহ বা দশ টাকা স্থলে সাত কি আট টাকা।

মায়ের উপর রাগ করিয়া ভীম যখন বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যায় নিস্তার তখন গফুরদের সঙ্গে একত্রে সরকারী ঋণ নেয়। সে পায় দশ টাকার স্থলে সাত টাকা। গভর্ণমেন্টের একজন অফিসার সেই টাকা আদায়ের জন্য গৌরীগ্রামে আসেন। ভীম মায়ের ঋণ শোধ করার জন্য সুদ সমেত সাত টাকা লইয়া যায়। অফিসার বলেন, সুদ সমেত পুরো দশটাকাই তোমায় দিতে হবে। ভীমের সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হয়, উহা লইয়া। অফিসার মেজেয় জুতার ঠোকর দিয়া বলেন, Pay you must।

ভীমের চোখ লাল হইয়া ওঠে, সে বলে, মিছা গাল মন্দ করবেন না।

ব্যাপারটা হয়ত বেশ কিছু দূর গড়াইত। তাহাকে ইশারায় থামাইয়া দিল সুকুমার।

ভীমের পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন মোদাব্বের। তিনি বলিলেন, ভীমকে দশধারায় গ্রেপ্তার করলে আমাকেও ধরা উচিত।

পশ্চিম পাড়ের বিখ্যাত পণ্ডিত স্মৃতিরত্ন কহিলেন, ওর মতন পরোপকারী, নিষ্কলুষ লোক সারা গৌরীগ্রামে আছে কিনা সন্দেহ।•

গৌরী গাঁয়ের ভূতপূর্ব ডেপুটি শ্যামাচরণ বলিলেন, The accused in the dock is as straight as pike. His character is above suspicion as that of Caesar's wife. (কাঠগড়ার আসামী পতাকার দণ্ডের মত সোজা সরল। সীজারের স্ত্রীর মতন ওর চরিত্র সংশয়ের উর্ধ্বে)

কেশব বলিয়া উঠিলেন, এমন লম্বা চওড়া বউ নিয়ে সিজাররাও মুশকিলে পড়তেন।

কোর্ট স্বদ্ধ লোক হাসিয়া উঠিল। হাকিম বলিলেন, অর্ডার অর্ডার।

ভীমের তরফ হইতে শরৎ মোক্তার জেরা শুরু করিলেন। ভদ্রলোক মোক্তার বারের নেতা, ঐ টুকু ছোট্ট মহকুমায়ও তাঁর মাসিক আয় প্রায় হাজার টাকা। ঝানু মামলাবাজেরাও তার জেরার সামনে টিকিতে পারে না। তিনি মধুচক্রকে প্রশ্ন করিলেন, ভীম খালাস হলে তুমি নিশ্চয়ই খুশি হবে?

হব নিশ্চয়, ও আমার যজমান।

তোমার বিশ্বাস ভীম খালাস হলে তোমার ভাল হবে?

তা হবে।

ও খালাস হলে গোকুল মাঝির কোন অনিষ্ট হবে?

না, তা হবে না। তবে তার ইস্ত্রির সঙ্গে—

শরৎ বাধা দিয়া বলিলেন, বাজে কথায় কাজ নেই। সোজা জবাব দাও, হাঁ কি না।

বিচারক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মধুচক্রের দিকে তাকান।

সে বলে, না, অনিষ্ট হবে না হুজুর।

শরৎ আবার প্রশ্ন করেন, সিধুর?

মধুচক্র জবাব দেয়, তারও কোন খেতি হবে না।

তাহলে তুমি মনে কর ভীম লোকটা ভাল। তাকে দিয়ে কারও কোন ক্ষতি হয় না। হতে পারে না।

এতদিন সেই বিশ্বাসই ছিল।

এখন নেই?

না।

বদলাল কেন?

ভীম সবকারদের তেলের টিন ফুটা করার পর বদলাইছে।

ওর মায়ের শ্রাদ্ধে বসে তোমার যেই মনে হল যে ভীম টিন ফুটো করেছে তখনই ছুটে গেলে রামনাথকে খবর দিতে?

তখন যাই নাই। বাড়ি ফিরিয়া খাইলাম, তামাক টানলাম, একটু নিদ্রা—

নিদ্রাও দিলে, তারপর গেলে রামনাথের কাছে?

মধুচক্র কেমন যেন ভড়কাইয়া যায়।

শরৎ বলেন, জান, অভিযোগ প্রমাণ হলে এই মামলায় ভীমের কয়েদ হবে?

হ শুনছি।

বলেছে কে?

বলছে ভুঁইয়ারা। রামনাথ ভুঁইয়া, হরু।

যদি প্রমাণ না হয় তা হলে তোমার নামেও সে মামলা করতে পারে?

মধুচক্রের মুখ শুকাইয়া যা

তোমাকে যারা সাক্ষী দিতে পাঠিয়েছে তারা এ কথা বলে নি?

না, তাইলে আসত কোন ভাঁড়ুয়া। অরা যখন আমারে ১০৲ টা টাকা দেয় তখন ত এসব কয় নাই।

তোমার জেল জরিমানা দুই-ই হইতে পারে। জরিমানার টাকা না দিলে ঘর থেকে ঘটি বাটি টেনে বার করবে

ওরে বাপ্।

শরৎ হাকিমকে বলেন, ইওর অনার, এই সাক্ষীকে দিয়ে আমার আর দরকার নেই।

এরপর স্বরযমলের জেরা। শরৎ বলিলেন, আপনি বাংলা জানেন পাড়েজী?

থোড়া বহুত জানি।

এক সময় আপনি সৈন্য বিভাগে কাজ করতেন?

স্বরযমল বুকের ছিনা উঁচাইয়া বলে, হাম মিলিটি্রি থা। লাইক। কালা পানিমেভি গইয়েছি।

কোথায় গিছলেন?

বাস্‌রা।

আপনি দেবতার নামে শপথ করেছেন যে হাকিম বাহাদুরের সামনে সত্য ছাড়া মিথ্যা বলবেন না?

কোরিয়েছি।

সীতারামের নামে, রাধা কৃষ্ণের নামে শপথ?

স্বরযমল তাড়াতাড়ি দুই কানে আঙুল দেয়। বলে, উ নাম মত্ কিজিয়ে। বোলিয়ে জয় সীতারাম, জয় মহাবীর।

কৃষ্ণভক্ত হাকিমের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়।

শরৎ বলেন, ভীম দুর্ভিক্ষের বছর আপনার মুনিব বাড়িতে চড়াও হয়েছিল?

হইয়েছিল।

ওরা কি লুঠ করতে এসেছিল? না, এসে হারাণ বাবুকে বললে, আপনি চাল চালান দেবেন না, তাতে দেশের লোক না খেয়ে মরবে।

হামারা ইয়াদ নেই।

দরকারী কথা দেখছি কিছুই আপনার মনে থাকে না। যাক্। আপনি খুব নাম ডাকের লাঠিয়াল, তাই না?

আচ্ছা লাঠি চালাই। ইস মাফিক্—বলিয়া সুরযমল কাঠগড়ার ভিতরই লাঠি খেলার কায়দায় একটা ঘুরপাক খায়। তার বিপুল দেহের ভারে কাঠগড়া যেন কাতরাইয়া ওঠে।

শরৎ বলেন, ভীম কিন্তু সেদিন আপনাকে কাবু করে ফেলেছিল, পাঁড়েজী।

কভি নেই— বলিয়া সুরযমল আবার ঘুরপাক খাওয়ার উপক্রম করিলে হাকিম এক ধমক দেন, ই কছারি হ্যায়, কুস্তীকা আখড়া নেই।

শরৎ আবার জিজ্ঞাসা করেন, আপনি লাঠির এক ঘায়ে আলোটাকে নিবিয়ে সেই লাঠিই ঘুরিয়ে মারলেন ভীমের মাথায়। তাই না?

উ সচ্ নেই, মিছা আছে।

মনে করে দেখুন ভীমেরা সবাই চলে যাওয়ার পর দামী আলোটা ভাঙার জন্য হারাণবাবু আপনাকে বকেছিল কি না?

সুরযমল কোন উত্তর করে না।

শরৎ আবার বলেন, হারাণবাবু আপনাকে বকেছিলেন এই সময় তার বোন এসে বললেন, আলো নিভিয়ে না দিলে সামনা-সামনি লড়াইতে পাঁড়েজী ভীমের সঙ্গে পারত না। কথাটা ঠিক নয় কি?

সুরযমলের মুখ কালো হইয়া যায়, সে বলে, জেনানাকা বাত ছোড়িয়ে দিন।

সেদিন আপনারা কে কে লাঠি চালিয়েছিলেন?

রামদীন, আদিত, বীমা।—সুরযমল ভীমকে বলে বীম বা বীমা, হারাণের চাকর আদিত্যকে বলে আদিত।

শরৎ বলেন, ভীমের হাতে লাঠি ছিল না?

বীমা আদিত্‌কো লাঠি ছিনাইয়ে নিলো।

না, রামদীনের ?

দোনোকা।

আর ঠিক সেই সময় আলো নিবিয়ে আপনি তার মাথায় মারলেন লাঠির ঘা ?

সুরযমল এবার হাল ছাড়িয়া দেয়। বলে, উভি হইতে পারে।

শরৎ শীতল পণ্ডিতকে একটি মাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, সাক্ষী দিতে আসার কতক্ষণ আগে আপনি পরনের ঐ মিহি ধুতিখানা পেয়েছেন ? কাচাবারও সময় পান নি দেখছি।

পণ্ডিত কাপড়ের কোণ পাকাইয়া কান খুঁটিতে আরম্ভ করেন।

শরৎ বলেন, আপনাকে নতুন ধুতিখানার কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম, পণ্ডিত মশাই।

পণ্ডিত কোন উত্তর করেন না।

কাছারিতে পরে আসার মতন কাপড় আপনার ছিল না বোধ হয়। বলুন, লজ্জা কি ?

না, ছিল না।

এ কাপড় কে দিয়েছে, তাহাজ না তারণ ?

দিয়েছে তাহাজ।

আর নন্দীরা একখানা দিয়েছে আপনার ব্রাহ্মণীকে, আপনি অমনি সাক্ষী দিতে এসেছেন। তাই না ?

শীতলের ঠোঁট কাঁপে, তিনি বোধ হয় ইষ্ট নাম স্মরণ করেন। হয়ত বা আওড়ান, বিল্বত্বঞ্চ, নৃপত্বঞ্চ—

তাকে রেহাই দিলেন হাকিম। বলিলেন, আপনি কাঠগড়া থেকে নেমে যান, ভবিষ্যতে আর এ রকম করবেন না।

তারপরই ভীমকে প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি দোষী না নির্দোষ ?

ভীম বলিল, ধর্মাবতার, আমি চোরও না, ডাকাতও না।

সুরযমলের মাথা ফাটিয়েছিলে কেন?

গেছিলাম চাউল চালানে বাধা দিতে,—বাধল কাজিয়া। সুরযমল ঝাঁপাইয়া পড়ল আমাদের উপর, তার মাথা ফাটল, আমারও ফাটল হুজুর।

তুমি রামনাথদের কেরোসিনের টিন ফুটো করেছিলে?

হ করছি। মা এট্টু চিনির অভাবে মরল, আমি পিতৃশোধ নিলাম, চোরাকারবারীর ক্ষেতি করায় দোষ কি হুজুর?

শরৎ বাবু নিজের জেরার সাফল্যে খুশি হইয়াছিলেন। ভীম তাঁর সব কৌশলই মাটি করিয়া দিল। লোকটা যেন মূর্তিমান আহাম্মক।

তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ভীমের স্বপক্ষীয় আর সকলেও হাল ছাড়িয়া দেয়।

সরকারী উকিল জিজ্ঞাসা করেন, গোকুল মাঝির বৌ তোমার কি হয়?

ভীম বলিল, হয় না কিছু। গোকুল আর আমি একত্তর পাঠশালে পড়তাম। আমরা স্বজাত।

উকিল প্রশ্ন করেন, আর কিছু হয় না?

ভীমের চোখ মুখ লাল হইয়া ওঠে, সে কোন জবাব দেয় না।

উকিল আবার বলেন, বল।

ভীম একবার হাকিমের দিকে তাকায়, আবার তাকায় সামনে এজলাসে উপবিষ্ট ভদ্রলোকদের দিকে। তার পর চোখ বুজিয়া বলে, সে, সে আমার মা, ধর্মাবতার।

কেশববাবু আরও যেন কি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। হাকিম বলেন, আমি আসামীকে আর কোন প্রশ্ন করতে দেব না।

হুজুরের যেরূপ অভিরুচি—বলিয়া কেশবলাল বসিয়া পড়েন।

তৃতীয় দিনে রায় বাহির হইল।

বিচারক রায়ে লিখিলেন, ভীম সমাজের শত্রু নয়, সে গ্রামের লোকের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে, নারীদের সে বিভীষিকা এই সব অভিযোগ একেবারেই অমূলক। এর কোন প্রমাণ নাই; বরং সে যে পরোপকারী সৎলোক সম্ভ্রান্ত সাক্ষীরা এইরূপ কথাই বলিয়াছেন।

আসামীর বিরুদ্ধে দুইটি অভিযোগই প্রধান—

১। সে সুরযমলের মাথা ফাটাইয়াছে এবং ২। কেরোসিনের টিন ছেঁদা করিয়াছে।

সুরযমলের মনিব নন্দীরা যখন বিদেশে চাউল চালান দেয় সেই সময় প্রতিবাদের জন্য কয়েকটি যুবক তাদের বাড়িতে উপস্থিত হইয়াছিল। ভীমও সেই দলে ছিল। তখন লাঠি চলে। রামদীন সুরযমল আদিত্য প্রভৃতি নন্দীদের দারোয়ান ও চাকর বাকররা লাঠি চালায়। ভীম রামদীন ও আদিত্যের লাঠি কাড়িয়া নিলে সুরযমল আলো নিভাইয়া ফেলে। অন্ধকারের মধ্যে ভীম ও সুরযমল উভয়েরই মাথা ফাটে। সুরযমলের আঘাতের জন্য ভীম হয়ত দায়ী কিন্তু সে স্বভাব-দুর্বৃত্ত নয়।

দ্বিতীয় অভিযোগ ভীম নিজেই স্বীকার করিয়াছে। রামনাথদের উপর ক্রোধের বশে সে তাদের টিন ছেঁদা করিয়াছে, ঐ সম্পর্কে মামলা হইলে তার ফলাফল কি হইত সেই প্রশ্ন এখানে অবান্তর।

কিন্তু আসামী অপরাধপ্রবণ নয় বরং লোকটি স্পষ্টবাদী ও সত্য-ভাষী। তাকে ১১০ ধারায় অভিযুক্ত করিবার যুক্তিযুক্ত কারণ আমি খুঁজিয়া পাইলাম না।

আমার মনে হয়, তার বিরুদ্ধে এই মামলা রুজু করিয়া পুলিস নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে। সরকারী অর্থেরও এইরূপ অপচয় করা উচিত হয় নাই। বরং তাদের উচিত ছিল হরনাথরা

কেরোসিনের টিন কেন ডোবায় লুকাইল, রেশনের মাল কোন্ পথে চোরাবাজারে যায় সেই সম্পর্কে তদন্ত করা।

সরকার পক্ষের সাক্ষীরা প্রায় সকলেই অল্প বিস্তর মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে। আদালতে সব চেয়ে করুণ অবস্থা হইয়াছিল শীতল পণ্ডিতের। তার মত অসহায় সোজা সরল মানুষেরা ধনীর ক্রীড়নক হইয়া সমাজের অনিষ্ট করে অথচ নিজেরা কিছুমাত্র লাভবান হয় না।

যাহা হউক প্রমাণ অভাবে আমি ভীমকে মুক্তি দিলাম।

উনচল্লিশ

হারাণের মতলব ছিল পুলিসকে দিয়া একে একে জনকল্যাণের নেতৃস্থানীয় সকলকেই ১১০ ধারার বেড়াজালে ঘিরিয়া ফেলা। ভীমের মামলার ফলে তাকে সেই অভিসন্ধি ত্যাগ করিতে হইল।

হাকিমের মন্তব্যে আর সব চোরাকারবারীরা কিছুটা সংযত হইল। কিন্তু হারাণ উহা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিল না।

কোটালীর ছোট দারোগা বড় দারোগাকে বলিলেন, দেখবেন এই হাকিম শীগগীরই বদলি হয়ে যাবে।

বড় দারোগা সখানাথ কহিলেন, বলেন কি? ইনি একজন ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট, এঁকে বদলি করানো অত সোজা নয়।

ছোট দারোগা বলিলেন, হারাণের শ্রীহরির ক্ষমতা অদ্ভুত, ওতে রাতকে দিন, দিনকে রাত করা চলে, দেখছি ত এই তিন বছর।

সখানাথ এই থানায় নবাগত। তিনি বলিলেন, কি রকম?

ছোট দারোগা বলিলেন, ওর হাতে যে সাত সাতটা এম এল এ।

বড় দারোগা বলিলেন, দেশটা দেখছি ধীরে ধীরে চোরাকারবারী-দের হাতে গিয়েই পড়ল!

ভীম মহকুমা হইতে সরাসরি বাড়ি আসিল না। পথে জামুলায় পূর্ণর বাড়িতে গেল। সেখানে তার মামলার খবর কেহ জানিত না। শুনিয়া মণিরামের বড়রাণী বলিল, তোমারে মিছা মামলায় ফেলছিল। দেখবা বেটারা গোল্লায় যাবে।

ভীম হাসিয়া উত্তর করিল, এতদিন আমিও ভাবতাম বৌ ঠাকরন যে পুণ্যের পুরস্কার আর পাপের সাজা আছে। এখন আর সে বিশ্বাস নাই।

কও কি ঠাকুর পো? তাহা হইলে আছে কি?

অত জানি না। খালি মনে হয় কেডা যেন নাগরদোলায় চড়াইয়া দিছে। আর আমরা বেহুদা ঘোরতেছি।

জামুলায় ভীমকে খাতির করে সবাই। গতবারই পূর্ণর ছোট ভাই সুধন্বর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। সে বলিল, দাদার ইচ্ছা তুমি এখানে থাক, আমাগো কাজকর্ম দেখ।

ভীম বলিল, কিন্তু আমি যে দেশ ছাড়িয়া বেশী দিন থাকতে পারি না ভাই।

সত্যসত্যই দেশের প্রতি টান তার অদ্ভুত। আকর্ষণ ঘাঘরের গাঙের, গৌরীগাঁয়ের মাটি গাছপালা লতাপাতার। গাং পাড়ের চিতসি কুরপালা কাকডাঙার সবুজ গাছের সারি তার চোখে যেন মায়া কাজল টানিয়া দেয়। আর আকর্ষণ গোলাপীর।

কয়েকদিন পরে ভীম রওনা হইয়া আসার সময় পূর্ণ তার হাতে গোকুলের নামে একখানা চিঠি দিল। বড়রাণী বলিল, গোলাপীরে আমার নাম করিয়া কইও মাইনকার জন্য সে যেন দাদার মাইয়া টুকুনরে নেয়। দুজনে মেলবে যেন হরগৌরী।

টুকুন বলিল, ইস্ আমি গৌরী হইলে ত।—বলিয়াই ছুটিয়া পলাইয়া যায়।

কয়েকদিন পরে ভীম বাড়ি ফিরিল। তাকে পাইয়া চাষী মজুররা ভারি খুশি হইল। মামলার এই জয় যেন ভীমের একার নয়, জয় তাদের সকলের, জয় মিথ্যার উপর সত্যের। অত্যাচারী ধনিকের উপর সর্বহারার।

জনকল্যাণের কেহ কেহ প্রস্তাব করিল, একটা মিছিল বাহির করিবে।

সুকুমার বলিল, উঁহু। সামান্য ভুল ত্রুটিকেও আমাদের এড়িয়ে চলতে হবে। এ দেশের বহু আন্দোলন সফল হয়নি এই সব ভুল ত্রুটির জন্য।

সাধারণে ইহার তাৎপর্য বোঝে না। মিছিল বাহির করিতে না পারিয়া উৎসাহীদের মধ্যে অনেকেই ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু নেতার নির্দেশ তারা নির্বিচারে গ্রহণ করে।

দিন কয়েক বাদে গোকুল বলিল, ভীমরে কাল নেমন্তন্ন করিয়া আয় মানিক। এই ফাঁকে আমাগোও ভাল অ-ভাল খাওয়া হবে। এমনে ত হয় না।

ভীম খাইবে তাই গোলাপী লাউচিংড়ী শোলমূলা ও কাঠাঁয়ার মাংসের ব্যবস্থা করিল। সবগুলিই ভীমের প্রিয় খাদ্য।

মাঝিগিরির সময় গোকুল রান্নায় হাত পাকাইয়াছিল। সে বলিল, আমি অন্তত একটা বেগুন রাঁধব।

গোলাপী বলিল, বেশ তুমি সবই রাঁধিও। আমি করব পুলি পিঠা। ঠাকুর-পো পুলিও খুব ভালবাসে।

গোকুল বলিল, এবার হার মানলাম। পিঠা বানাইতে আমি পারি না। যাউক, মাইন্‌কা ভীমরে কইতে গেছে সে আসুক, পিঠার জন্ম ডাল আনিয়া দেবে।

কিছুক্ষণ পরে মানিক আসিয়া খবর দিল, ভীম-কা আসতে পারবে না।

গোকুল ও গোলাপী উভয়েই সমস্বরে প্রশ্ন করে, কেন?

মানিক বলিল, তার আসার জো নাই। ভীম-কা কইল, তোর বাবারে বুঝাইয়া বলিস্ সে যেন রাগ করে না।

গোকুল বলিল, বরাবরের খেয়ালী মানুষ। কি যেন খেয়াল চাপছে।

গোলাপী কিন্তু কথাটা সে ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। তার মনে হয় ভীমের না আসার কারণ অন্য কিছু। কারণ হয়ত সে নিজে। তাকে ছলনাময়ী বলার পর সে যাতায়াত কমাইয়া দিয়াছে, আসিলেও তার সঙ্গে আগের মতন কথাবার্তা বলে না, মেশে না। মিশিতে হয় ত ভালও লাগে না।

কিন্তু কি ছলনা সে করিল? ছলনা কি সে শুধু একাই করিয়াছে, ভীম কি কিছুই করে নাই?

পুরুষ মানুষ, তার জোর বেশী, সে ছলনাময়ী বলিতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া নিমন্ত্রণে আসিল না? না-হক্ অপমান করিল!—গোলাপীর ইহা অসহ্য মনে হয়।

দুইদিন পরে শোলমুলা কাঠুয়ার মাংস ও পিঠা করিয়া নরেন সুকুমার অনিল সেন ও ছোটরাণীকে খাওয়াইল।

খাইতে বসিয়া ছোটরাণী বলিল, ভাগ্যিস ভীমার উপর রাগ করছিলি। আমাগো তবু একবেলা ভাল খাওয়া জোটল।

গোলাপী একটু হাসিয়া বলিল, রাগ আবার কিসের? কার উপর?

ভীম ফেরার আগেই তার মামলার মুখরোচক খবরটুকু দেশে ছড়াইয়া পড়ে। লোকে শোনে ভীম আর গোলাপী খারাপ।

যারা এ সম্পর্কে কোন দিন কিছু শোনে নাই তাদের মধ্যেও কেহ কেহ বলিল, এ ত জানা কথা!

কেহবা টিপ্পনী করিল, ঐ জন্যই ত গোকুল দেশ ছাড়া হইছিল। কলকাতায় যাইয়া সে কি আর সাধে মরতে চাইছে?

গুজবটার জনক সিধু। কেরোসিনের টিন ছেঁদা হওয়ার পর হারাণ ও রামনাথ যখন ভীমের নামে মামলা করা সম্পর্কে সলা পরামর্শ করিতেছিল তখন সিধু একদিন রামনাথকে বলে, ভীমের কথা আর কবেন না। অর জ্বালায় আমারও ঘরে তিষ্টিতে পারতাম না। রামনাথ প্রশ্ন করে, কেন, তোর বাড়ি গিয়ে কি করত?

আমাগো বাড়িও যাবে! তার মুণ্ডটা তা হইলে ছিঁড়িয়া ফেলতাম না?

তার এই অস্বাভাবিক উত্তেজনায় রামনাথ কৌতুক অনুভব করে। বলে, ব্যাপার কি রে? তুই যে একবারে আগুন হয়ে উঠলি।

আগুন হওয়ারই ত কথা। গোকুল যখন দেশে ছিল না ভীম তখন রোজ রাত্তিরে আসিয়া তার বউর লগে গুজুর গুজুর করত। আমরা ঘুমাইতে পারতাম না।

তোদের দুটো বাড়ি ত দু'তিন রশি ফারাক। ভীম এমন কি গুজুর গুজুর করত যাতে ঘুমুতে পারতিস না?

সিধু বলে, ওটা হইল কথার পৃষ্ঠে কথা।

রামনাথ খবরটা বলে হারাণকে। তার কাছে শুনিয়া দারোগা মন্তব্য করেন, যাক এতদিনে খাসা একটা মেটিরিয়াল জুটল। মেয়ে ঘটিত ব্যাপার না থাকলে ১১০ ধারার মামলা জমে না। ইমারতের যেমন চুন শুরকি, ১১০ ধারার তেমন অবৈধ প্রেম।

হারাণ মালাটা দ্রুত টেপে আর বলে, শ্রীহরি শ্রীহরি।

সে দিন সন্ধ্যায় মাঠের কাজ করিয়া মানিক বাড়ি ফিরিতেছে এই সময় পথে আমতলীর চাচার সঙ্গে দেখা। চাচা বৈদ্যের ছেলে, মানিকের চেয়ে বয়সে বড়। শীতলের পাঠশালায় তাদের উপরে পড়িত। বর্তমানে তিন বৎসর যাবৎ ক্লাশ এইট্-এ যাতায়াত করিতেছে।

চাচার এক দুর্বলতা, ইংরেজী বলিয়া লোকের চোখে ধাঁধাঁ লাগানো। সেই দুর্বলতার জন্যই সে বোধ হয় মানিককে বলিল, জানিস্ তোকে আমি থাণ্ডার্ষ্ট করে দিতে পারি।

মানিক বলিল, সে আবার কি?

থাণ্ডার্ষ্ট জান না? তা জানবিই বা কি করে? মা সরস্বতীর Legএ Salute করেছিস্ ত অনেক দিন।

মানিক বলে, থাণ্ডার মানে ত বজ্র।

হ্যাঁ রে হ্যাঁ। থাণ্ডার্ষ্ট মানে বজ্রাহত।

আমায় বজ্র মারবে কেন?

আমি মারব না, মেরেছে সিধু। সে বেটা কাছারিতে তোর মায়ের নামে কুচ্ছা করেছে।

কি কুচ্ছা? মানিক গর্জিয়া ওঠে।

চাচা আমতা আমতা করিয়া বলে, থাক্ সে কথা থাক। তা শোনার অযুগ্যি।

মানিক পাষাণ মূর্তির মতন দাঁড়াইয়া থাকে। তার হাত পা কাঁপে, ঠোঁট কাঁপে। একটু পরে তাকাইয়া দেখে চাচা নাই।

সিধু কেরোসিনের কুপির সামনে বসিয়া চিটাগুড় দিয়া তামাক মাখিতেছিল। পাশেই ছোট বউ বুলা বসিয়া। সিধু তামাক মাখে আর তাকে বলে, তামুকটা হইছে তোর মত মিষ্টু।

আমারে ত চিটাগুড়ের মতন মিঠাই মনে কর, বুলা অনুযোগ করে।

এঁ্যা, এই কথাডা কইলি তুই, বলিয়া সিধু স্ত্রীর দিকে হাত বাড়ায়।

মানিকের ডাকে তাব রসালাপে বাধা পড়িল। সে বলিল, ডাকে কেডা, মাইনকা না কি?

মানিক বলিল, হ বাইরে আইস। তার কণ্ঠস্বর রুক্ষ কর্কশ।

সিধু বাহিরে আসিয়া বলিল, বেত্তান্তডা কি রে?

মানিক তাকে একটু দূরে ডাকিয়া নিয়া বলিল, আমার মায়ের নামে কাছারিতে তুমি কইছ কি?

আমি,—আমি ত—সিধু আমতা আমতা করে। ভাবার সময় নেয়।

মানিক বলে, ভাবতেছ আবার কি?

উকিল ভীমরে জিজ্ঞাসা করল, গোকুলের বৌ তোমার হয় কি? ভীম কইল, সে আমার মা হয়। আমিও লগে লগে কইলাম, গোলাপ মামীরে ও মায়ের মতনই দেখে। তুই ভীমরে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ্।

তার বলার ভঙ্গী ও কণ্ঠস্বরেই মনে হয় যে সে মিথ্যা বলিতেছে।

মানিক বলে, তোমারে আমি সাবধান করিয়া দি আমার কানে যেন একথা আর না যায়। গেলে তুমি শাস্তি পাবা—বলিয়াই সে চলিয়া যায়।

সিধু তার পিছু পিছু চলে আর বলে, তোরে এ মিছা কথাডা কইল কেডা ক দেখি? আমি কবুব গোলাপ মামীর কুচ্ছা! তামা তুলসী ছুঁইয়া বুলার সিঁথার সিঁদুর ছুঁইয়া কিরা করতে পারি যে কিছু কই নাই।

মানিকের ধমকানিতে বেশ কাজ হইল, এর পর হইতে সিধু আর গোলাপীর নিন্দা করিত না।

চল্লিশ

ফাল্গুনের শেষে মানিক একদিন বলিল, আমি এবার সন্ন্যাসী হব মা।

গোলাপী বলিল, সে কি রে?

বাবার অসুখের সময় মানত করছি। নীলঠাকুর, বাবারে সারাইয়া তোল, আমি তোমার নামে সন্ন্যাসী হব।

চৈত্র মাসে নীল আর চড়ক সন্ন্যাসীতে দেশটা ভরিয়া যায়। কেহ নীল অর্থাৎ নীলকণ্ঠ মহাদেবের নামে, কেহ বা চড়কের নামে সন্ন্যাস নেয়। গলায় কাছা, গেরুয়া পরা সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীর দল ভিক্ষাপাত্র হাতে ঘুরিয়া বেড়ায় আর বলে, জয় পার্বতীপতিনাথ শিবে। বম্ ভোলা।

এরা উপবাস করে শিব বা চড়কের নামে। কিন্তু নিজেদের অজ্ঞাতে বহন করে বৌদ্ধ প্রভাব।

এই সন্ন্যাস জীবনের উপর মানিকের বরাবরই বিস্ময় মিশ্রিত আকর্ষণ ছিল। সে তাই স্থির করে দেবতার নামে উপবাস করিয়া ইচ্ছাশক্তির বলে বাপকে সারাইয়া তুলিবে।

গোলাপী আপত্তি করে। তার আপত্তির কারণ, বাবুরা এই সন্ন্যাস নেয় না। গোলাপীর বরাবরই ইচ্ছা ভদ্রলোকের মতন জীবন যাপন করে। পাঁচজন বলে মাইয়াটা বেশ ভদ্দর ত।

গোকুল আগে আগে ইহা লইয়া ঠাট্টা করিত। কিন্তু জনকল্যাণের প্রভাবে গোলাপীর এই ভদ্র হওয়ার আগ্রহ দিন দিনই বাড়িতেছিল।

ছোটরাণীও এই ব্যাপারে তাকে সমর্থন করিল। বলিল, ছিঃ, সন্ন্যাস নিবি কিরে মাইনকা?

মানিক বলিল, বাবুরা সন্ন্যাস নেয় না ত আমাগো কি?

গোলাপী বলিল, তারাইত দেশের মাথা।

অমন মাথা হইয়া কাজ নাই, যা নয় তাই সাজা। মনে মনে দেবতারে ভয় করব আর সন্ন্যাস নেওয়ার বেলায় আমি ভদ্দর লোক।

তার কথা বলার ভঙ্গীতে গোলাপী হাসিয়া ফেলে। বলে, কিন্তু সারাদিন টো টো করিয়া ভিক্ষা করা, সেই চাউল সেদ্ধ করিয়া রাত্তিরে দু'মুঠা গেলা, এত কৃচ্ছরো তুই পারবি?

মানিক বলে, পারব না কেন, এর থা বেশী কৃচ্ছরো আমি পারি। এইত সে দিন রাজমিস্ত্রির কাজ শিখছি। এর মধ্যেই সারাদিন কেমন ভারায় দাঁড়াইয়া রোদ্দুরে কাজ করি তা সহ্য হয়, আর পারবনা সন্ন্যাস নিতে?

শেষ পর্যন্ত তারই জয় হয়। চৈত্র মাসে গলায় কাছা দিয়া গেরুয়া পরিয়া সে গৌরীগ্রাম, আমতলী লাড়ুয়ার অঙ্কে ঘুরিয়া বেড়ায়। বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে। তাকে সব চেয়ে বেশী ভিক্ষা দেয় অমূল্য। কিন্তু হরিমতী দেখিলেই বলে, পোড়া সং।

চড়ক পূজার আগের দিন নীলকণ্ঠ মহাদেবের বিবাহ উৎসব। এই উৎসবের বিগ্রহকে বলে পাট বা পাট গোঁসাই। নিম বা বেল কাঠ দিয়া বৃষ কাষ্ঠের মতন দুই খণ্ড পাট তৈরি হয়। বড় পাট খানি শিব, ছোট খানি পার্বতী।

নীলের বিবাহের কয়েকদিন আগে উৎসবের উদ্‌যাপন। পাট স্নান করাইয়া মাথার দিকে সিন্দুর পরাইয়া বাকীটা লাল শালুতে ঢাকা হয়। সন্ন্যাসীরা পাট লইয়া বাড়ি বাড়ি ঘোরে, সঙ্গে থাকে ছেলে বুড়ার দল, এরই নাম পাটে যাওয়া।

লাড়ুয়ার অঙ্ক গ্রামের শশধর বাঁড়ুয্যের বাড়ির বালা বা নীল পূজার পুরোহিত অনুকূল। মানিক তার সঙ্গে পাটে বাহির হইল।

শশধরের পাট দিনেও বাহির হয় তবে অন্যান্য পাটের মতন রাত্রেই

বাহির হয় বেশী। সঙ্গে ঢাকী ঢুলী থাকে; ঢাকীতে ঢাকীতে ঢুলিতে ঢুলিতে বাজনার প্রতিযোগিতা চলে। ঢাক ঢোলের উপর তারা কত রকমের মিষ্টি বোল তোলে। বাজনার তালে তালে নাচে। গানেরও প্রতিযোগিতা হয়। হয় নিজেদের মধ্যে ছড়া কাটা কাটি।

রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া মানিক গল্প জুড়িয়া দেয়, কোন্ বাড়িতে কিরূপ অভ্যর্থনা হইল, কে ভাল নাচিল, কার গানের সুখ্যাতি হইল, এই সব গল্প।

একদিন গোলাপীর বাড়িতে পাট আসে। সে আগেই উঠান ঝাঁট দিয়া রাখিয়াছিল। যেখানে পাট বসিবে ছোট রাণী সেখানে আলপনা দিল।

প্রথমে হ্যাসাগের আলোয় দুজন ওস্তাদ ঢাকী ঢাকের উপর বোল তুলিতে তুলিতে, নাচিতে নাচিতে উঠানে আসিয়া দাঁড়ায়। পাশেই একদল চীৎকার করিয়া বলে, জয় পার্বতীপতিনাথ শিব।

আসেন পাট; সঙ্গে দেবদেবীর দল। নীল সন্ন্যাসীরা দেবতা সাজিয়াছে, ইন্দ্র যম রাধা-কৃষ্ণ শিব গৌরী। কেহ কেহ ভূত প্রেত হইয়াছে, সর্বত্রগামী নারদ ত আছেনই।

যমের গদা ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রথমেই গুঁফো নরেন কয়েকটা ঘুরপাক খায়। কুমি গোলাপী ছোটরাণী সবাই হাসিয়া ফেলে।

মানিক ধরিল মহাদেবের বিবাহের গান—

শুন সবে মন দিয়া
হইবে শিবের বিয়া
কৈলাসেতে হবে অভিযান।

নরেনের গলা মোটা, গায়ও বেসুরো কিন্তু সেও ধরিল,

আরে কৈলাসেতে হবে অভিযান।

এবার পাঁচ সাত জন একত্রে গাহিতে আরম্ভ করে।

কৈলাসে বিয়ার ঘটনা
তাতে নারদ করে আনা গোনা
মণিরাম রচে বসি গান।
হর বলে, ভাইগনা আমি ভাঙ্গা ঘরে থাকি
উষি পুষি করিয়া রাত কাটাই,
দুই ধারে দুই বালিশ দিয়া
মধ্য খানে থাকি শুইয়া
চোখের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়।
শুনিয়া হরের বাণী
হেঁকে কন নারদ মুনি
আমি নারদ হইলাম ঘটক
বিয়াব তোমার কিসের আটক,
দিনেব মধ্য দিব বিয়া
(নইলে) নারদ মুনি নয়ক' আমার নাম।

গান হইল অনেক, দেবদেবীর গান, শিবের গাজন, কালী কীর্তন, কৃষ্ণ কীর্তন। একখানা গান কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলনের,

ইংরাজ এবাব ভারত ছাড়ো
কইলেন গান্ধী মহারাজ।
ইংরাজের কাঁপল আসন
(ওরে) লাট সাহেবের কাঁপল আসন,
তক্ত তাউসে পড়ল বাজ।

গোলাপীর উঠানে পাট ছিল এক ঘণ্টার উপর। আকাশ বাতাস গানে বাদ্যে উৎসব কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিল। গোকুলও তাদের সঙ্গে মিশিয়া পড়িল। 'লাটসাহেবের কাঁপল আসন' শুনিয়া তার মনে পড়িল, '৪২ সনের কলিকাতা রাজপথের দৃশ্য। হাজত, জেলখানা।

মনে পড়িল জেলখানার স্বদেশী বাবুদের, বিশেষ করিয়া সুধীর দাসের রুগ্ন উজ্জ্বল মূর্তি। স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শবাদে এই তরুণের কাছেই তার দীক্ষা।

গোলাপী ও কুমি দরজায় দাঁড়াইয়া গান শোনে, তাদের পাশে ছিল ছোট রাণী। গানের পরে দুই জায়ে মিলিয়া সমবেত লোকদের পাকা কলা বাতাসা তরমুজ খাওয়ায়। বাতাসা চিবাইতে চিবাইতে অনুকূল গোলাপীর দিকে চাহিয়া বলিল, গান্ধীর গানটা বাঁধছে তোমার ছাওয়াল।

একদিন দলটা গেল রামনাথের বাড়িতে। সন্ন্যাসের একমাস মানিক এক দিনও ঐ বাড়িতে ভিক্ষা করিতে যায় নাই। কেমন বাধ বাধ ঠেকিয়াছে। আজ তার গান হইল সব চেয়ে সুন্দর। বসন্তের কোকিলের মতন গলা যেন খুলিয়া গেল।

একটা আলোর নিচে আধ-অন্ধকারে মলিনা বসিয়া; আলোর রেখা পড়িয়াছে তার গলার নেকলেসের উপর। মলিনা গানের সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দেয়, ছোট ছোট তালি। ঢেউয়ের উপর ঢেউ ভাঙ্গিয়া পড়িলে যেমন ছল ছল শব্দ হয়, তেমনি শব্দ।

গানের শেষে মলিনা উপর হইতে একখানা পাঁচ টাকার নোট ফেলিয়া দিল। মানিকের ইচ্ছা ছিল নোটখানাকে নিজের কাছে রাখিয়া দেয়। সে ইচ্ছা সে প্রকাশ করিল না। দলের সবাই পরের দিন বাজারে যাইয়া ঐ টাকা দিয়া গোপালের সন্দেশ কিনিয়া খাইল।

অনুকূল বলিল, সন্দেশ তুই দুইটা বেশী খা মাইনকা, টাকা তোরেই দিছে।

মানিক একটু হাসিল। মলিনার কথা মনে হইলেই তার ভাল লাগে। এ এক নূতন অনুভূতি। মা বাবাকে, ছোটমাকে, কুমিকে ও অমূল্যকে ভাল লাগার চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

একচল্লিশ

দিন একরূপ কাটিয়া যায়। গ্রীষ্মের পর আসে বর্ষা। তার রূপের তুলনা মেলে না, চারদিকে থৈ থৈ করে জল। বাতাসে কচুরিপানা দোলে, মনে হয় লাখো লাখো সাপ ফণা নাড়িতেছে। টল টলে জলে পদ্ম ফুল ঢল ঢল করে।

আসে শরৎ। বাদ্য বাজনার উৎসব কলরবে গৌরীগ্রাম মুখরিত হইয়া ওঠে। ছেলে বুড়ো সবাইর সে কী আনন্দ। পূজায় গান গাহিয়া মানিক এবার পনর ষোল টাকা রোজগার করিল। গানগুলি সেই বাঁধিয়াছিল। শশী খুশি হইয়া বলিল, খাসা গান বাঁধছ। সংসারে অভাব না থাকলে তুই একটা মস্ত কবি হইতে পারতিস, কলকাতার কবিগো মতন।

মানিক বলে, না শশীদা তা হইলে হয়ত কিছুই পারতাম না। আমার যা কিছু শিক্ষা সব হইছে ঐ দুঃখ কষ্টের মধ্যে।

দুঃখ কষ্টে শিক্ষা! তুই একটা পাগল, বলিয়া শশী হাসে।

কিন্তু মানিকের মনে হয় তার কথাই সত্য। দুঃখ দৈন্যের পঙ্কে যে অনুভূতির জন্ম তাহাই তার মনে কমল হইয়া ফুটিয়াছে। চোখের জল শুকাইয়া মুক্তার দানা হইয়াছে। অভাব না থাকিলে সে পদ্য বাঁধিতে পারিত না।

কিন্তু দুঃখেও সে বিচলিত হয় না এরূপ নয়। এক এক সময় মনে হয় এই বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গেই ধরে, হবে জয় জয় রে।

বীরের মতন সংগ্রাম করিয়া মানিক দুঃখের দিনগুলি প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছিল। সে নিজে রোজগার করে, তার বাবাও সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। তার এক মাত্র উদ্বেগ বেশীক্ষণ রোদে থাকিতে পারে না, রোদে গেলে মাথা ধরে। গোকুল তাই জমির কাজে যায়

নাই, মাঝিগিরিও করে না। সে এখন জনকল্যাণে তাঁতের কাজ শিখিতেছে। আর ছোট রাণীর কাছে শেখে লেখা পড়া। সে বলে এরেই কয় কাল মাহাত্মি, না হইলে আমিও লেখা পড়া ধরলাম! তা আবার তোমার কাছে বৌঠারইন।

উহা লইয়া গোলাপী করে উপহাস। জাকে বলে, আমার ভয় করে দিদি, পাছে দেওররে তুমি বশ করিয়া ফেলো।

ছোট রাণী বলে, ইস্ কাঁপুনি রোগীরে বশ করতে যাব কোন্ দুঃখে?

গোলাপী বলে, মন ধরা দিতে চাইলে রূপ বেয়াধি আর বয়স কিছুতেই তা আটকাইতে পারে না।

শরৎ চলিয়া গেল। হেমন্তের সঙ্গে সঙ্গেই আসিল নূতন এক সংগ্রাম।

হারাণের জমি অনেক, এ অঞ্চলে সব চেয়ে বেশী। বহু কিষাণ তার জমিতে কাজ করে, তারা প্রজা নয়, বেতনভুক্ নয়; ভাগচাষী। হারাণের তারা অংশীদার।

মানিক তাদের সঙ্গে হারাণের জমিতে কাজ করিয়াছে। এবার আসিয়াছে ফসল কাটার সময়।

ফসলে ফসলে মাঠ ছাওয়া। সোনার রং সে ফসলের; দেখিলে চোখ জুড়ায়। মাঠের দিকে চাহিলেই মানিকের মন আনন্দে কাঁপিয়া ফুলিয়া ওঠে। ও সোনা যে তার নিজের হাতে তৈরি। উহা দিয়া সে নিজের ক্ষুধা মিটাইবে। মা বাপের ও কুমির ক্ষুধা মিটাইবে।

আর দশজনের সঙ্গে সেও ফসল কাটিল। কিষাণরা মাঠের মাঝখানে জায়গায় জায়গায় ধানের বড় বড় স্তূপ তুলিল, স্তূপ না যেন জননী ধরিত্রীর পীযূষস্তম্ভ। ঐ অমৃত দিয়া তিনি তাঁর সন্তানদের বাঁচাইয়া রাখেন।

প্রতিবারই এই সময় কিষাণদের সঙ্গে হারাণের দেনা পাওনা লইয়া গোলমাল বাধে। এবারও বাধিল।

হারাণ শুধু জমির মালিক। হাল বলদ শ্রম এমন কি বীজ ধান সবই চাষীর অথচ ফসলের বেলায় হারাণ নেয় অর্ধেক।

চাষী এই বীজ ধানও হারাণের কাছে ধার নেয়। তাকে উহা স্থদ সমেত পরিশোধ করিতে হয়। স্থদ সের প্রতি ছটাক। তারা এবার বলিল, বীজের স্থদ আমরা দেব না।

ধান তখনও মাঠে, হারাণ তাই নরম স্থরেই বলিল, বীজের স্থদ ত বরাবরই দিয়ে এসেছ। এবার আপত্তি করছ যে?

আকালী বলিল, দিন-কাল বদলাইছে কর্তা। আগে ধানের মণ ছিল দুটাকা, এখন হইছে তিরিশ।

হারাণ বলিল, তা জানি। কিন্তু সে জন্যে ভাবনা কি? আমিই ত বরাবর তোমাদের দেখে আসছি।

গুঁফো নরেন বলিল, সেই দেখাতেই ত আমাগো এত জলুস। একবারে কঙ্কাল করিয়া ছাড়ছ।

সবাই হাসিয়া ওঠে।

চাষীরা নরম না হওয়ায় হারাণ শেষটায় বলিল, ধান তোমরা গোলায় তুলে দাও। আমি যা হ'ক একটা বিহিত করব।

সে জানে ধান একবার গোলায় উঠিলে দাঁড়িপাল্লার হের ফেরে সেই ক্ষতি পোষাইয়া লইতে পারিবে।

কিন্তু তার প্রস্তাবে শুধু কৃষাণরা নয় পরাণও আপত্তি করিল। বলিল, তুমি আজ জেলা বোর্ডের কাজে সদরে যাবে, কাল ব্যাঙ্কের কাজে কলকাতায়। তখন এ সব ঝামেলা আমি পোহাতে পারব না। যাহ'ক তুমিই এর বিহিত করে যাও।

কথাটা সত্য। কোনও জটিল বিষয়ে পরাণের উপর নির্ভর করা

চলে না। এদিকে সময় কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে চাষীদের দাবী আরও বাড়ে। শুধু বীজের সুদ নয়, বীজ ধান পরিশোধ করিতেও তারা অস্বীকৃত হয়। বলে, বীজ আমরা দেব কেন? বীজ দেবে জমির মালিক।

হারাণ বলিল, শ্রীহরি শ্রীহরি। লোভ মহাপাপ। পবিত্র ইসলামে মহান হিন্দুধর্মে লোভের কী নিন্দেই না করেছে!

অনিল সেন বলিল, তা জানি, পাপ আমাগো বেলায় কিন্তু তোমার লোভ যে চৌধুরী বাড়ির দেবদারু গাছের মাথাও ছাড়াইয়া গেছে।

হারাণ যেন আকাশ হইতে পড়ে—ওঃ, তোমরা জান না বুঝি? সব সম্পত্তি আমি নাড়ু গোপালের নামে সমর্পণ করেছি। অচিন্ত্য অমূল্যও আমার সম্পত্তি পাবে না।

গুঁফো নরেন বলিল, আঁট-ঘাট বাঁধছ ভাল।

অন্যবারে অল্পেই মীমাংসা হইয়া যায় কিন্তু এবার কোন ফয়শালা হয় না। সপ্ততিপর মহেশ হারাণকে বলিল, বীজ ছাড়লেও কোন কিষাণ ফসলের সিকি নিজের ঘরে তোলতে পারবে না। তোমার দোকান বাকি আছে, কর্জ আছে। ধান আছে। বীজটা তুমি ছাড় যাইয়া।

হারাণ বলিল, সে সব ত আমার হকের পাওনা; তোমরা আমার গোলা থেকে ধান ধার করে খেয়েছ। দোকান থেকে নুন তেল নিয়েছ।

কে একজন টিপ্পনী করিল, তোমার খাতায় কত গুণ বাড়াইয়া লেখছ কও দেখি। আকালী বলিল, শুকনা ভিজার হের-ফেরের কথা তোলবেন না, মহেশ কাকা?

হারাণের এ এক অভিনব পাওনা। চাষীরা কর্জ নেয় শুকনা ধান।

শোধ করে ফসল কাটার পর। শস্য তখন কাঁচা থাকে, ভারী হয়। হারাণ সেই জন্য ওজনে কিছু বেশী নেয়।

হারাণ বলিল, তোমরা সবাই দেখছি সুকুর দলে ভিড়েছ।

একজন বলে, ভেড়লে দোষ কি ?

নরেন বলে, কালের ধর্মই হইল ওই।

অনিল সেন সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, আমরা হইলাম বাম। বাঁয়ের দল।

হারাণ বলিল, বাঁ আর ডানের মধ্যে ডানই কিন্তু সেরা। ডান হাতের জোর কত। ঐ হাত দিয়ে আমরা ভাত খাই, লাঙল ধরি, দাঁড় টানি। আর বাঁ ? বাঁ হাত দিয়ে কি করি, বলিয়া সে কিষাণদের দিকে তাকায়।

সমবেত সবাই যেন বিব্রত বোধ করে। ব্যাপারটাকে হাল্কা করিয়া করিয়া দেয় অনিল সেন। সে চীৎকার করিয়া বলে, করি শৌচ।

চাষীদের দলে কিছু কিছু ভাঙন ধরিল। কারও ধান নাই। কারও ছেলে রোগের ঔষধ পথ্য পায় না। ইয়াসিন হারাণের কাছে চাল চাহিল। আকালীর ভাই চুবান আসিয়া বলিল, আমারে একখানা কাপড় দেও, না দিলে আমার গেরিনির অবস্থা হবে দোরপদীর মতন। শালা র‍্যাশন দুঃশাসন তার বস্তর হরণ করছে।

হারাণ বলে, বেশ কাপড় আমি দিচ্ছি, তুমি 'অন্তত আকালীকে বল' সে আমার কথা শুনুক। সে তোমার ভাই।

আকালী শোনবে আমার কথা! সুকুমার যে তার মাথা বিগড়াইয়া দিছে।

তা-হলে অনুকূলকে নিয়ে এস। তাকে বল আমার দলে থাকলে আখেরের সুবিধে হবে। হারাণ নন্দী অকৃতজ্ঞ নয়।

আইছিত সেই ওবৃসায়। তোমার দলে থাকব, তুমি আমারে

দেখবা। কিন্তু অনুকূলের কথা আর কইওনা। সে আজ-কাল মণি কবিদারের বৌর কথায় ওঠ্ বস করে।

এর্ মধ্যে রসের ভিয়েন আছে বুঝি?

রসের প্রসঙ্গ তুলিয়াই হারাণ লজ্জায় জিভ কাটে। বলে, শ্রীহরি শ্রীহরি। বউটিকে লোকে ছোটরাণী বলে না?

চুবান বলিল, রাণী না পেত্নী।

সে তার ঘরের দ্রৌপদীর জন্য একখানা টুটা ফুটা কাপড় পাইল বটে কিন্তু অভাবগ্রস্ত আর যারা আসিয়াছিল তাদের প্রায় সকলকেই নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইল।

* * *

প্রতি বৎসর এই সময় ধান গোলায় তোলা হইলে হারাণ ঘটা করিয়া লক্ষ্মী-পূজা করে। নিয়ম-রক্ষার মতন প্রতিটি গোলায় দু'এক সের করিয়া ধান তুলিয়া এবারও সে পূজার ব্যবস্থা করিল। কুল পুরোহিত মধুচক্র "ধান্যং নমঃ, গোলাং নমঃ, ঢেকিঞ্চ"—মন্ত্র বলিয়া প্রত্যেক গোলায় চন্দনের ছিটা দিল, ফুল ছড়াইল।

অন্য যজমান বাড়িতে মধু একআনা বড় জোর দু'আনা দক্ষিণা পায়। হারাণ দুইটাকা দিয়া বলিল, আশীর্বাদ করেন ধান যেন ঠিক ঠিক মতন গোলায় ওঠে।

মধুচক্র প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করে,

ভবন্তু বাড় বাড়ন্তং, শস্যং গোলাজাতং, গৃহবধূ গাভীঞ্চ গর্ভবতী।

পরাণের স্ত্রী অন্তঃসত্বা ছিল, সে ছুটিয়া পলাইল।

পাছে ধান চুরি যায় এই ভয়ে উভয় পক্ষ হইতে গৌরীর মাঠে পাহারা বসিল। প্রথমে পাহারা দিতে শুরু করে কৃষাণরা। হারাণের জমি যারা চাষ করিয়াছিল শুধু তারা নয় বাহিরেরও অনেক চাষী আসিয়া যোগ দেয়।

কৃষাণরা লাঠি কাঁধে করিয়া মাঠময় ঘুরিয়া বেড়ায়। তারা জানে এই লড়াইয়ে জয় পরাজয়ের উপর তাদের বাঁচা মরা নির্ভর। একবার পরাজয় মানিয়া লইলে অবস্থা দিন দিন আরও খারাপ হইবে।

লোক সংগ্রহ করিতে হারাণকে বেগ পাইতে হয়। পাহারা পিছু দিনে এক টাকা ও রাত্রে দুই টাকা বকশিশ, তার উপর তাদের পান তামাক আছে। দুচার জনকে গাঁজা এবং ধান্যেশ্বরীও যোগাইতে হয়।

শান্তিরক্ষার অজুহাতে থানা অফিসার বন্দুকধারী কনষ্টেবল ভালু সাহ ও ভূপেনকে পাঠাইলেন। পুলিসের সঙ্গে কি যে ব্যবস্থা ছিল তাহা হারাণ ছাড়া আর কেহ জানিত না।

হুটু মিয়ার সঙ্গে যোগ সাজসে সাম্প্রদায়িক বিরোধ সৃষ্টিরও সে চেষ্টা করে। কিন্তু তাকে বানচাল করিয়া দেন মোদাব্বের। তিনি চাষীদের বুঝাইলেন, এই ব্যাপারে হিন্দু মুসলমান চাষীর স্বার্থ অভিন্ন।

একদিন আকাশ জোড়া মেঘ করায় চাষীরা প্রমাদ গণে। ভগবানকে ডাকে, ঠাকুর বিষ্টি দিওনা। কেহ কেহ মন্দিরে শশা কলা বাতাসা মানত করে, কেহ বা পীরের দরগায় শিরনি।

কিন্তু মেঘের ঘন কালো আস্তরণ ভেদ করিয়া সেই প্রার্থনা উপর-ওয়ালার কানে পৌছায় না। বৃষ্টিতে মাঠ-ঘাট ধুইয়া যায়। কোথায়ও কাদা জমে, কোথায়ও এক হাঁটু জল।

পরদিন রোদে রোদে আকাশ ছাইয়া গেল, রবি রশ্মি সোনার সুষমা ঢালিয়া দিল। কিন্তু চাষীর ভয় কাটিল না। ধান পচিয়া গেলে তাদের যে তিলে তিলে উপবাস করিয়া মরিতে হইবে।

রাত্রে ছোটরাণী সুকুমারকে খবর দিল, মোল্লার হাট হইতে লাঠিয়াল আসিতেছে। কাল তারা মাঠ হইতে জোর করিয়া ধান তুলিয়া নিবে।

সুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, আপনাকে বললে কে ?

বলছে ফুটু ভুঁইয়ার বৌ।

তিনি আমাদের দলে বুঝি ?

না, তবে মানুষটা ভালো, পরের দুঃখ দেখতে পারে না।

খাসা মেয়ে ত।

গভীর রাত্রি, ছোটরাণীর ঘরে একটি হারিকেন মিট মিট করিয়া জ্বলে। ইচ্ছা করিয়াই আলোটাকে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ঘরে সাতটি পুরুষ, একটি নারী। স্বল্পপরিসর ঘর খানা পুরুষের ছায়ায় ছায়ায় ভরিয়া গিয়াছে। বেড়ায় ঠেসান দিয়া বসিয়াছিল বলিয়া একমাত্র ছোটরাণীরই ছায়া পড়ে নাই।

সংগ্রাম সামনে, সকলের মুখেই চিন্তার ছাপ। তারা চুপ করিয়া বসিয়া। সেই মৌনতা ভঙ্গ করিয়া আকালী বলিল, ছোটরাণী বৌঠারইনের কোন ছায়া নাই। শুনছিলাম মাইয়া মানষের আত্মা থাকে না, সেই জন্য ছায়া পড়ে নাই বুঝি ?

সবাই হাসিয়া ওঠে।

সুকুমার বলিল, আপনারা কি করবেন ঠিক করুন।

অনুকূল বলিল, ঠিক ত করবা তুমি। তুমি হইলা মাথা।

সুকুমার বলিল, মাথা আর হাত পা কিছু নেই। আপনারা সবাই মিলে যা সাব্যস্ত করবেন তাই হবে।

অনিল সেন মহেশের দিকে চাহিয়া কহিল, আপনার মত কি জেঠা মশাই ?

মহেশ সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের নেতা, বয়স সত্তরের উপর। তাঁর চোখের উপর সাদা বুরুশের মতন এক জোড়া ভুরু, কানের লোম পর্যন্ত পাকিয়াছে, দেহের চামড়া শিথিল। তবে বুকের ছিনা দেখিলে

মনে হয় দেহে এক সময় প্রচুর শক্তি ছিল। তিনি বলিলেন, বুড়া মানুষ, আমি কি কব? কও তোমরা, এ কালের জোয়ানরা।

এস্তাজ বলিল, আপনার কথার দাম বেশী, আপনে কত দেখছেন, শোনছেন।

অনিল সেন বলিল, এই বয়সেও কালের সঙ্গে চলতেছেন।

সে কি সম্ভব? ঠিক মতন ত পারি না—অতীতের কথা মনে পড়ায় বৃদ্ধ মুহূর্তের জন্য নীরব হইয়া গেলেন। তারপর একটু ভাবিয়া বলিলেন, তোমরা নামিয়া পড়, আমি আশীর্বাদ করতেছি।

ঘরময় একটা গুঞ্জন ওঠে, পুরুষরা সবাই তাকে সমর্থন করে, তাদের মধ্যে মানিকের গলাই সব চেয়ে সুস্পষ্ট।

মহেশ বলিলেন, বাঁচিয়া থাক্ মাইনকা। এই কালের ছাওয়ালই হইলি তুই; তুই সকলের ছোট কিন্তু বেড়ার উপর তোর ছাওয়াই বড় হইয়া পড়ছে।

এতক্ষণ কেহ লক্ষ্য করে নাই, এবার সকলের চোখে পড়ে মানিকের ছায়ার উপর। শুধু বড় নয় অদ্ভুত ধরনের ছায়া, প্রকাণ্ড মাথা, হাত পা সরু সরু। দেখিয়া মানিকের লজ্জা বোধ হয় আর ছোট রাণী কেনই যেন ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করে।

সুকুমার তাকে প্রশ্ন করিল, আপনি কি বলেন?

ছোটরাণী এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই। এবার ধীরে ধীরে বলিল, আমি ঠিক ভরসা পাই না!

অনিল সেন জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

এস্তাজ কহিল, এত মানুষ আমাগো দলে, আপনে তবু নিভরসা?

ছোটরাণী বলিল, আমরা ঠিক দল বাঁধতে পারি নাই, কল্যাণের সকল লোকের উপর ভরসাও করা চলে না। সুশীল শাস্ত্রী লেখা পড়া জানা লোক, সে এর মধ্যেই হারাণের দলে যাইয়া মেশছে।

সুকুমার বলিল, তার বাপ পয়সাওলা মানুষ, পয়সাওলাদের উপর পুরাপুরি নির্ভর করা চলে না ঠিকই।

এস্তাজ বলিল, তিনি যে ভদ্দর লোক।

সুকুমার ধীরে ধীরে বার দুই বলিল, ভদ্দর, ভদ্দর। মনে হয় ভদ্রশ্রেণী লইয়া সে যেন এক সমস্যায় পড়িয়াছে।

ছোটরাণী বলিল, শলু, সুরেন, বোধনের ছাওয়াল, এদের উপরও নাকি নির্ভর করা চলে না?

সুকুমার বলিল, দুচার জন এ রকম যাবেই।

ভীম বলিল, যারা গেছে তারা ত কুকুর।

ছোটরাণী কহিল, মানুষ কুকুর হইলে তার কামড়ে বিষ থাকে আরও বেশী।

সুকুমার বলিল, আপনি কি বলেন এতদূর এগিয়ে এসে আমরা এখন পিছিয়ে যাব?

ছোটরাণী কোন উত্তর করে না। অনুকূলহরি বলে, আমার মনে হয় ছোটরাণী ঠিক কইছেন।

আকালী বলিল, ঠিকই ত, ঝাঁপাইয়া পড়ার আগে একবার ভাবিয়া দেখা উচিত।

মহেশ বলিলেন, একালের ছাওয়ালগো ভাববার ক্ষমতা বাড়ছে দেখছি। আমাগো সময় এমন ছিল না; মাতব্বর ডাকল, অমনে লাঠি লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়লাম।

এস্তাজ বলিল, পিছু হটার আমাগো এক্ষন উপায়ও নাই। পিছু হটলে এইখানে শেষ হইয়া যাব।

আরও কিছুক্ষণ আলোচনা চলে। সুকুমার বলে, বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে। আপনারা যা হয় চটপট ঠিক করে ফেলুন, লোক জনকে খবর দিতে হবে।

মীমাংসা একরূপ হইয়াই গিয়াছিল কিন্তু ছোটরাণী প্রশ্ন তোলায় অনেকেই ইতস্ততঃ করে, একে অপরের দিকে তাকায়, কেহ মন স্থির করিয়া কোন জবাব দিতে পারে না।

মহেশ আবার বলেন, আমি বুড়া মানুষ, আমি আগে কই—তোমরা ঝাঁপাইয়া পড়।

মানিক সোৎসাহে বলিল, আমারও ঐ কথা সুকুদা, করেছে ইয়ে মরেছে। তার বলার ভঙ্গীতে সবাই হাসিয়া ফেলে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত মীমাংসা হইয়া যায়। সকলে সমস্বরে বলে, আমরাও লড়ব।

অনুকূল বলিল, লড়াই করায় আমার মত নাই কিন্তু বন্ধুরা ঝাঁপাইয়া পড়লে আমি পিছু থাকতে পারব না।

সুকুমার বলিল, এই ত চাই, বাপের বেটার মতন কথা। তোমরা বরাবরই লড়িয়ে বংশ।

অনুকূল বলে, তা ঠিক, এইত আমার দাদা সেবার বে-আইনী লবণ করতে যাইয়া কী মারই না খাইল কিন্তু বন্দেমাতরম্ ছাড়ল না।

সুকু বলিল, মহেশ জেঠা ভিন্ন আপনারা আর সবাই গ্রামে গ্রামে খবর দিতে চলে যান। ভোর হতে না হতে সবাই যেন জড় হয়। তাদের বলবেন, শান্তভাবে কাজ করতে হবে, মাথা ঠাণ্ডা রেখে। কেউ যেন প্রতিহিংসাপরায়ণ না হয়।

আকালী বিস্মিত ভাবে বলিল, কও কি সুকু, আমরা পিতৃশোধ নেব না? এখনও অহিংস থাকতে কও?

সুকুমার বলিল, কাজ হাসিল করার জন্য যতটুকু দরকার তার বেশী আঘাত আমরা করব না। তবে দরকার হলে জান নেব, জান দেব।

বেঁটে খাটো মানুষ সুকুমার। চোখ দুটিও ছোট ছোট। কথা বলিতে বলিতে সে দু'টা যেন জ্বলিয়া ওঠে।

একটু পরে এন্তাজ ভীম ও অনুকূল একে একে সবাই চলিয়া যায়। থাকেন কেবল মহেশ সুকুমার ও ছোটরাণী।

সুকুমার কি যেন ভাবিতেছিল। ভাবার সময় তার ডান হাতের তর্জনী কাঁপে, ঠোঁট নড়ে। ভাবনার মাঝখানে হঠাৎ উঠিয়া মহেশের পায়ের ধূলা লইয়া সে বলিল, আশীর্বাদ করুন জেঠা, আমাদের যেন জয় হয়।

ছোটরাণী বলিল, আপনি যেন দমিয়া গেছেন মনে হয়।

দমিনি বটে কিন্তু ব্যাপারটা গুরুতর ছোটরাণী, গৌরীর মাঠে সবুজ ঘাসের উপর আজ যে লড়াই শুরু হবে কে জানে এর শেষ কোথায়।

বাগান উত্তরপাড়ে খবর দিয়া মানিক সরকার বাড়ির পথে ফিরিতেছিল। ডাইনে তাদের দোতালা দালান, প্রথমেই মলিনার ঘর, সেখানে আলো জ্বলিতেছে।

মানিক একটুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া থাকে। তার বুকের ভিতরটা বার দুই ঢিব ঢিব করে।

সে আবার চলে। পাঁচ সাত পা যাইয়াই ফিরিয়া তাকায়। তার মনে হয় মলিনার ঘরের ঐ আলোটা শুকতারার চেয়েও উজ্জ্বল।

বিয়াল্লিশ

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গৌরীর মাঠ মানুষে মানুষে ছাইয়া গেল; কিশোর বৃদ্ধ যুবা সব রকমের মানুষ, তবে যুবকই বেশী। কারও হাতে লাঠি, কারও বা লগি বৈঠা। হাতের কাছে যে যাহা পাইয়াছে তাহাই লইয়া আসিয়াছে।

সামান্য অস্ত্র, কিন্তু তাদের চোখ মুখ দিয়া দৃঢ়তা যেন ফাটিয়া পড়ে। তারা আসিয়াছে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' সঙ্কল্প লইয়া।

মেয়েরাও আছেন। কারও স্বামী ফসল তুলিয়াছে, সে আজ বাঁচিয়া নাই, স্ত্রী আসিয়াছে ফসলের দাবি লইয়া। কারও ছেলে কৃষাণ খাটিয়াছে, পাছে হারাণের লোক তার হকের পাওনা লইয়া যায় সেই ভয়ে মা আজ ছেলের হাত ধরিয়া উপস্থিত।

শীতের সকাল কিন্তু অনেকেরই গরম কোন আচ্ছাদন নাই। গায়ে শুধু কাপড়ের খুঁট জড়ানো। এই মানুষগুলি এমনি সাদাসিধা, এত অসহায়। জোতদার জমিদার এদের শোষণ করে, সুদখোরে ঠকায়, শিক্ষিতেরা করে অবজ্ঞা। বলে, ভালগার ক্রাউড। পুলিসের লাঠিও সকলের আগে এদের মাথায়ই পড়ে।

তবু এরা লড়ে। বহুর সমবেত বুদ্ধি এদের পথ দেখায়, ভুল এরা যে করে না তা নয় কিন্তু ইতর প্রাণীর মত অধিকাংশ সময়ই নিজদের মঙ্গল পথ বাছিয়া নেয়। এদেরই একদল একদিন ব্যাষ্টাইল দখল করিয়াছিল। এরাই অক্টোবর বিপ্লব ঘটাইল, সেদিনও চালাইল গান্ধীর কুইট্ ইণ্ডিয়া আন্দোলন।

কৃষাণ মজুরের তুলনায় হারাণের লোকেরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, চার পাঁচটি দরোয়ান ও গুটিকয়েক পাইক পেয়াদা। তবে দারোগার হুকুমে এই অঞ্চলের দফাদার চৌকিদাররাও আজ উপস্থিত হইয়াছে আসিয়াছে নতুন চৌকিদার সিধু। নতুন কালকোর্তা ও লাল পাগড়ি পরিয়া সে এদিক ওদিক তাকায়। ভাবটা এইরূপ যে লোকে তাকে দেখুক, বুঝুক যে সেও কেউকেটা নয়।

এক এক জায়গায় কৃষাণরা বিশ পঁচিশ জন জড় হইয়া জটলা করে। একজন আর একজনকে ডাকিয়া বলে, এই যে রামু তোমরা পেয়ারের আইছ কয়জন?

ঠিক কইতে পারি না তবে তিন কুড়ির কম না। এক মামুদ মিয়ার ছাওয়ালই দেড় কুড়ি। চার বিবির ঘরের।

পেয়ার গ্রামের আর একজন প্রতিবাদ করিল, তানার ছাওয়াল এক কুড়ি আট জন, দেড় কুড়ি না। বলবন্ত তারা সকলটি।

ধীরে ধীরে পুব আকাশ লাল হইয়া উঠিল। টাকওয়ালা কালীপদ বলিল, গৌরীর মাঠও আজ ঐ পুব আকাশের মত রাঙা হইয়া যাবে।

মাঠে আজ সব চেয়ে উৎসাহী অনিল সেন, একাই একশ। সে মাঠময় ঘুরিয়া বেড়ায়। বিভিন্ন দলের সঙ্গে ডাকিয়া ডাকিয়া আলাপ করে। উৎসাহ দেয়, উপদেশ দেয়, পিছু হটবেন না, অহিংস থাকবেন কিন্তু।

অনুকূলহরি বলিল, লড়াইয়ে আবার অহিংসা কি? এ দেখি কাঁঠালের আমসত্ত্ব।

অনিল বলিল, যতক্ষণ পারা যায়। তারপর মুখে চোঙা লাগাইয়া চেঁচাইতে শুরু করে, আস্তে আস্তে।

বেলা সাতটা, সাড়ে সাতটা বাজে। রোদে রোদে মাঠ ছাইয়া যায়। নগ্নদেহ চাষীর আরাম লাগে। ইয়াসিন আকালীকে বলে, ভাই আকাল, তবু ভাগ্যিস যে রোদ ছোট বড় ফারাক করে না।

আকালী বলিল, তা হইলে আমরা যাইতাম কোথায়?

এই সময় কিছুটা দূরে খালের মধ্যে হারাণের সবুজ পানসি দেখিয়া জনতা চীৎকার করিয়া উঠিল, ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ, বন্দেমাতরম্।

কেহ কেহ পানসির দিকে ছুটিয়া যায়। সুকুমার অনিলের হাতের চোঙাটা লইয়া উহা মুখে লাগাইয়া বলিল, ভাই সব আপনারা দাঁড়ান।

লোকের দৌড় থামিল কিন্তু চীৎকার থামিল না।

হারাণ মাঠে নামিল। তার সঙ্গে সুরযমল ও রামদীন, হারাণের হাতে জপের মালা। মালা টিপিতে টিপিতে সে বলিল, পুলিস কোথায়, লেঠেলরাই বা কই?

তার নূতন গোমস্তা শশধর দাস মাঠেই ছিল। সে গলার পৈতা

হাতে পেচাঁইতে পেচাঁইতে বলিল, পুলিস আসে নি। লেঠেলরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

আমার জন্য অপেক্ষা! বেটাদের মতলব কি? চল—দেখি, বলিয়া হারাণ গোমস্তার সঙ্গে লাঠিয়ালদের নৌকার দিকে চলে।

সুকুমারের নিষেধ সত্বেও মহেশ মাঠে আসিয়াছিলেন। তাঁকে ও মোদাব্বের সাহেবকে লইয়া সুকুমার হারাণের দিকে আগাইয়া গেল।

তাদের দেখিয়া হারাণ বলিল, শ্রীহরি, শ্রীহরি, এই যে মহেশ খুড়ো এসেছেন, মোদাব্বের সাহেব আছেন। আপনারা একটা মিটমাট করে দিন।

মহেশ বলিলেন, গোড়ায় চাষীদের দাবিটা মানিয়া নিলে এত গোলমাল হইত না, বাবাজী।

হারাণ বলে, দাবিটা কি সামান্য, মহেশ খুড়ো? বীজের সুদ মাথা প্রতি এক সের আধ সের করে ছাড়লেও আমার ঘাড়ে গিয়ে দাঁড়ায় অনেক মণ।

মোদাব্বের কহিলেন, আপনার ওতেও কিছু আসে যায় না কিন্তু চাষীরা যে ঐটুকুতেই মারা পড়ে।

যাতে তারা মারা না পড়ে সেদিকে আমার বরাবরই লক্ষ্য আছে।

অনিল বলিল, সেই জন্যইত লাঠিয়াল আনছ রক্তপাত করতে।

রক্তপাত শুনিয়া হারাণ বলিল, শ্রীহরি, শ্রীহরি।

সুকুমারের পিছন হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল, বক-ধার্মিক।

আর একজন বলিল, বেড়ালতপস্বী।

সুকুমার বলিল, আপনি নিজেই একটা ব্যবস্থা করে দিন, নন্দী মশাই।

আমি ত বরাবরই রাজী। ওরা আমার বাড়িতে ধান পৌঁছে দিক, আমিও যতটা পারি ওদের আবার রক্ষে করব।

মোদাব্বের বলিলেন, আপনি বলেন এটা আব্দার ?

নিশ্চয়।

পিছন হইতে আকালী বলিল, আব্দার নয়, আমাদের হকের পাওনা।

হকের পাওনা! হকটা কিসের শুনি আর সেটা স্থির করবেই বা কে ?

জনতার ভিতর হইতে আওয়াজ উঠিল, ঠিক করব—আমরা চাষীরা।

ঠিক ঠিক।

আমরা বীজ ধান চাই।

বীজ ধান।

তেভাগা—।

হারাণ বলিল, নতুন নতুন এসব কি কথা ? গৌরীগ্রামে তেভাগা!

সুকুমার কহিল, গৌরীগ্রাম পচে গেল কিসে ?

হারাণ সুকুমারের দিকে চাহিয়া বলিল, জনতাকে খেপিয়ে দিয়ে আমায় দমাতে পারবে না সুকু। আমি পীতাম্বর নন্দীর ছেলে।

তার সুর এতক্ষণ নরম ছিল। হঠাৎ চড়িয়া যাওয়ায় সুকুমার অবাক হইয়া যায়। চাহিয়া দেখে আকালের সড়ক দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া দারোগা আসিতেছে। তার পিছনে একটা জনতা, তার মধ্যে কয়েকটি কনষ্টেবল ও চৌকিদার।

ঠিক এই সময় আর এক দিক দিয়া ছোটরাণী ও মানিক মাঠে নামে, তাদের সঙ্গে গুটি কয়েক তরুণ। মাঠে নামিয়াই তারা ছোট ছোট নিশান বিলাইতে আরম্ভ করিল। বাঁশের কঞ্চির উপর লাল কাগজে তৈরি পতাকা। তার উপর লেখা, চাষী মজুর আমরা কিসে কম ? যে জমি চযে ফসল তার। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

গ্রামে গ্রামে খবর দিয়া ভোরে বাড়ি ফিরিয়া মানিক পাড়ার গুটি কয়েক সমবয়সী ছেলেকে লইয়া এইগুলি বানাইয়াছে। তারাও তার সঙ্গে মাঠে আসিয়াছে।

জনতার ভিতর এক নূতন উৎসাহের সঞ্চার হয়। পতাকা লইয়া তারা লাফাইতে থাকে, চীৎকার জুড়িয়া দেয়, বন্দেমাতরম্, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, গান্ধী মহাত্মাকি—

দারোগা ঘোড়া সমেতই খালে নামিয়াছেন। ভাটার খাল তবু তাঁর উরু পর্যন্ত পাতলুন ভিজিল, জুতায় কাঁটা শেওলা আটকাইয়া গেল। রাগে তিনি গসগস করিতেছিলেন। তার পিছনে পুলিসদের অবস্থা আরও শোচনীয়। তারা ভাবিয়াছিল খালে জল কম, কিন্তু জলের মধ্যে একটু আগাইয়াই তাদের বন্দুক মাথার উপর তুলিয়া ধরিতে হইল। কারও গলা, কারও বা বুক পর্যন্ত জলে ভিজিল, জামার বোতামে কচুরি পানা আটকাইয়া গেল। বেঁটে এক জমাদার খাদে পড়িয়া গিয়াছিল, উঠিল নাকানি চুবানি খাইয়া।

হারাণ দারোগার সামনে যাইয়া দাঁড়াইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—হো-ও-ও আওয়াজ করিয়া একটা মানুষ তাদের মাঝখানে লাফাইয়া পড়ে। কালো বিরাট পুরুষ, মাথায় বাবরি, হাতে সড়কি বল্লম যেন এক যমদূত। তাকে দেখিয়া দারোগা কোমরবন্ধ হইতে পিস্তল খুলিতেছিলেন, হারাণ বলিল, ও আমার লোক। মোল্লার হাটের লখন সর্দার। এসেছে লেঠেল নিয়ে।

বেশ বেশ—বলিয়া দারোগা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন। তার পরই বলেন, এই যে সুকুমার বাবু? কি বলে ডাকব আপনাকে, দেশভক্ত না দেশচক্ষু?

সুকুমার শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয়, আপনার যা অভিরুচি।

দেশচক্ষুই ভাল। ঠোঁট দিয়ে পরের ধন ঠুকরে নিতেই ত এখানে

এসেছেন। যাক পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। মুখে চোঙা লাগিয়ে থাকুন, কেনেস্তারা পিটিয়ে থাকুন জনতাকে জানিয়ে দিন পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাদের মাঠ ছেড়ে যেতে হবে।

সুকুমার বলিল, কোনরূপ মীমাংসা না হ'লে এরা যেতে চাইবে না।

দারোগা বলিলেন, বলি হবে কি না হবে পাঁঠার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না।

সুকুমারকে উপহাস করায় সে রাগে নাই কিন্তু এবার তার মুখ লাল হইয়া উঠিল। তবে সে কিছু বলার আগেই অনিল বলিল, জানি, বলি নির্ভর করে জল্লাদের উপর।

দারোগা সুকুমারকে বলিলেন, আমি আপনার শেষ কথা শুনতে চাই।

মোদাব্বের বলিলেন, একটা কিছু মীমাংসা না হলে লোকে ওর কথাই বা শুনবে কেন?

আপনিও দেখছি ঐ দলে। আপনি না সরকারী পদক পেয়েছিলেন?

সরকারী পদকের সঙ্গে এর সম্পর্ক কি শুনি?

আছে নিশ্চয়। গভর্ণমেণ্ট আশা করেন খেতাবধারীরা মেডেল-ওয়ালারা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিসকে সাহায্য করবেন।

পুলিস অন্যায় করলেও?

দারোগা ধৈর্য হারাইয়া চড়া গলায় বলিলেন, জেনে রাখুন আমার এলাকায় শান্তি ভঙ্গ হতে আমি দেব না।

মহেশ বলিলেন, শান্তি ভঙ্গ করতে ত আমরা আসি নাই। আইছি পাওনা ধানের জন্য।

মোদাব্বের বলিলেন, মিটমাট করতে চান না ত নন্দী মশায়।

দারোগা এবার হারাণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি নন্দী মশাই, আপনি কি বলেন?

হারাণ লাঠিয়াল ও পুলিসের উপর চোখ বুলাইয়া নিয়া বলিল, আমি ত মিটমাট করতেই চাই। মিটমাট না হলে আমারই সব চেয়ে ক্ষতি। কিন্তু এরা মিনিটে মিনিটে যে রকম দাবি বাড়িয়ে চলেছে তাতে মীমাংসা সম্ভব নয়।

দারোগা বলিলেন, চাষারা কি দাবি করছে?

সুকুমার সংশোধন করাইয়া দিল, চাষা নয়, চাষীরা, কৃষকরা।

দারোগা হাসিয়া বলিলেন, বুঝেছি, কৃষক ভদ্রমহোদয়েরা, এবার খুশি হলেন ত?

হারাণ বলিল, প্রথমে ওরা বীজ ধানের সুদ মাপ চাইছিল, তারপর বললে বীজধান দেবে না, এখন উঠেছে তেভাগায়।

দারোগা বলিলেন, এ দেখছি বিলকুল কৃশান। আমার এলাকায় কৃশানি চালু হতে আমি দেব না। আমার নাম সপানাথ।

অনিল সেন মন্তব্য করিয়া উঠিল, কৃশানরা ভয়ে এবার ইঁদুরের গর্তে লুকাবে দেখতেছি।

দারোগা তার দিকে কটমট করিয়া তাকান। অনিল সেন ঊর্ধ্বে চাহিয়া মাথা কাঁপাইয়া বলে, হতভাগ্য কৃশান।

মহেশ হারাণের দিকে চাহিয়া কহিলেন, বাবা হারু, তুমি দেশের রাজা। চাষীদের মধ্যে অনেকে তোমার স্বজাত, জ্ঞাতী কুটুম, তুমি নিজেই মিটাইয়া ফেল।

বৃদ্ধের কথায় হারাণ খুশি হইতে পারে না। তার আত্মীয় স্বজন চাষী মজুর ইহাতে সে লজ্জা বোধ করে। এই সম্পর্ক অস্বীকার করিতে চায়। সে বলিল, আমার কথা আগেই বলেছি, ওরা আমার বাড়িতে ধান তুলে দিক্—তখন দেখব যে কতটা ছাড়তে পারি।

দারোগা কহিলেন, উনি ত অন্যায় বলেন নি। প্রত্যেক বার যখন দেয় এবারই বা দেবে না কেন ?

পিছন হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল, নন্দীরা আপনাকে খাওয়াইছে কত ?

হু ? হু ত্যাট ফেলো ?—বলিয়া দারোগা এদিক ওদিক তাকান কিন্তু অপরাধীর সন্ধান মেলে না।

মোদাব্বের বলিলেন, হারাণ বাবু এরূপ দাবি করলে মিটমাট অসম্ভব।

দারোগা বলিলেন, যে করে হোক চাষীদের রাজী করাতে হবে। না হলে আপনাদের আমি দায়ী করব।

আরও কিছুটা বাদানুবাদের পর তিনি সুকুমার, মোদাব্বের ও মহেশকে গ্রেপ্তার করিলেন। তাঁদের হাতে হাতকড়া পরানো হইল। জনতা খেপিয়া গেল, শুরু হইল কলরব। কেনেস্তারা পিটানো, শিয়াল ডাকা, কুকুর ডাকা সব রকম ধ্বনি চলিল এক সঙ্গে।

লগুন সর্দারের দল এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। প্রথমে সর্দার নিজে একখানা পা উবু হাঁটু করিয়া আর একখানা সামনে আগাইয়া দিয়া মাটির কাছে মুখ নোয়াইয়া ডাক ছাড়ে, হো-ও-ও—।

এর নাম মাইর ডাক, এই ডাক মাটিতে ও সর্দারের ঢালে প্রতিধ্বনিত হইয়া আকাশ বাতাস যেন কাঁপাইয়া তোলে। পাশের মড়া গাছ হইতে কতগুলি শকুনি উড়িয়া যায়।

এর পর তার সাকরেদরাও হুঙ্কার ছাড়ে। উভয় পক্ষে রীতিমত লড়াই বাধিয়া যায়। চলে কিল চড়, ঘুষা ঘুষি, লাঠির ঠকাঠক।

চাষীরা কতকগুলি বর্ষা বল্লম আনিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল। তারা একদল ঐ সব অস্ত্র লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। উঠিল হাজারো

কণ্ঠে কলরব, সঙ্গে টিন পিটানোর শব্দ। একজন একটা ঢাক বাজাইতে লাগিল।

সেই শব্দের ঢেউ চার পাশের গ্রামগুলিতে যেন আছড়াইয়া পড়ে। ঘরের মধ্যে কুলবধূ শিহরিয়া ওঠে।

শব্দ এক একবার জোরে আসে আর গোলাপী চোখ বুজিয়া ডাকে, মা মনসা, মা কালী, আমার মাইনকারে রক্ষা কর। অর যেন কোন খেতি না হয়।

* * * *

মাঠের এই অবস্থা, এদিকে হারাণের বাড়িতে উড়ো খবর পৌছিল একদল চাষী লাঠি লইয়া তাদের বাড়ি চড়াও হইতে আসিতেছে। পরাণ গম্ভীর ভাবে বলে, বৌদি, এখন উপায়? একটা দারোয়ানও যদি বাড়ি থাকত।

হারাণের স্ত্রী শশীমুখী বলিল, উপায় রাধাবল্লভ।

পরাণের স্ত্রী পটল মুচকি হাসিয়া কহিল, ঠাকুরকে দামী গয়না দেওয়া হয়েছে কি আর সাধে? তিনি নিশ্চয় রক্ষা করবেন।

পরাণ বলিল, ফুটুর বৌর সঙ্গে মিশে ও দিন দিন কেমন নাস্তিক হয়ে উঠেছে, দেখছ বৌদি।

শশীমুখী বলিল, ফুটুর বৌটি শুনেছি চাষী মজুরের দলে।

পরাণ বলিল, হ্যাঁ, গোপনে তাদের খবর জোগায়।

শশীমুখী বলিল, তা হলে বল মেয়ে বিভীষণ?

পরাণ সদর দরজায় খিল আঁটে, তালা লাগায়। খিড়কির দরজাটা জীর্ণ, তাই তার পাশে কতগুলি ভাঙ্গা কাঠ জড় করিয়া সেটাকে পোক্ত করিয়া তোলে। একবার ছুটিয়া ছাদে যায়, আবার নিচে নামে। তার সঙ্গে ছোটে সোমালি। সেও সমানে ঘেউ ঘেউ করে। পরাণ খুশি হইয়া তার পিঠ চাপড়াইয়া বলে, সাবাস সোমালি।

এতক্ষণ হরিমতীর কথা তাদের মনে ছিল না। এবার তার খোঁজ পড়িল। এঘর ওঘর, ছাদ বারান্দা, নাটমন্দির কোথায়ও সন্ধান পাওয়া গেল না।

পটল বলিল, দিদিকে খুঁজছ তোমরা? সে বোধ হয় মাঠে গেছে।

পরাণ বলিল, মাঠে! মাঠে কেন?

পটল বলিল, দিদি কাল সুরযমলকে বলছিল, পাঁড়েজী, মাঠে আমার ধান আছে, কাল তুমি একটু দেখো। আমিও একবার যাব।

হরিমতীর নিজের কিছু জমি আছে। সে উহা চাষীদের দিয়া ভাগে চাষ করায়। তার ধান মাঠে পড়িয়া আছে, সে মাঠে গিয়াছে সেই জন্য। পরাণ বলিল, বাবা যেন একটা শত্তুর রেখে গেছে। পদে পদে ওকে নিয়ে ভোগো। এই সময় অমূল্যও বাড়ি নেই। সময় বুঝে সরে পড়েছে।

পরাণের সন্দেহ অমূল্য চাষী মজুরের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাদের সঙ্গে গোলমাল বাধার আশঙ্কায়ই সে মাতুলালয়ে চলিয়া গিয়াছে।

শশীমুখী বলিল, ঐটুকু ছেলে। সে কি আর অত বোঝে?

পরাণ বলিল, তাকে নষ্ট করেছে মানিক।

শশীমুখী বলিল, মানিকও ত ছেলে মানুষ।

গরিবের আবার ছেলে বুড়ো! ওরা সব এঁচড়ে পেকে যায়।

পটল বলিল, আর বড় লোকের ছেলেদের মানুষ হতে সময় লাগে। তাই না দিদি?

পরাণ বলিল, দেখলে, দেখলে বৌদি? আমায় ঠাট্টা করছে।

এই সময় মাঠে জোর শব্দ হয়। পরাণ বলে, ঐ ঐ আসছে।

পটল বলিল, ধান রইল মাঠে। ওরা এখানে আসবে কেন?

আসবে লুঠতে। ওরা সব পারে, ওরা যে ডাকাত।

এই সময় সদর দরজার বাহিরে শব্দ শোনা গেল। পরাণ বলিল, দেখলে ত? এসেছে চুপি সারে। তোমরা চটপট তৈরি হয়ে নাও। তুমি পারবে বৌদি, দু'হাতে দু'টা ক্যাশ বাক্স নিতে? পটলকে দেব গহনার বাক্স। আমি নেব দলিল দস্তাবেজ। তবুও ঢের ঢের মাল পড়ে থাকবে।

তার পরই স্ত্রীর দিকে চাহিয়া কহিল, তুমি পারবে ত গহনার বাক্স নিয়ে ছুটতে, এই অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়?

পটল ঘোমটার মধ্য হইতে জিভ দেখাইয়া ছুটিয়া পলাইল।

পরাণ ও পরাণ, পরু দরজা খোল—সদরে হারাণের ডাক শোনা গেল।

পরাণ জানালার খড়খড়ি ফাঁক করিয়া দেখে তার দাদা সদর দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া, তার সঙ্গে বন্দুকধারী দুটি পুলিস ও সুরযমল।

তেতাল্লিশ

গোলাপীর কোন কিছুতেই মন বসে না। না রান্নায়, না অন্য কোন কাজে। রান্না করে কুমি, সে মেয়েকে দেখাইয়া দেয়। আবার কলরব একটু বাড়িলেই সাঁকোর কাছে যাইয়া গৌরীর মাঠের দিকে চাহিয়া থাকে। দু'বার সাঁকোর উপরে গিয়াও দাঁড়াইয়াছে।

গোকুল অতটা বিচলিত হয় নাই। উঠানের এক ধারে বসিয়া সে ঘরের বেড়া মেরামত করিতেছিল। সে বলিল, অত ভাবিস কেন? ছাওয়াল আমাগো জিতিয়া ফেরবে। জেতারই ত ছাওয়াল।

গোলাপী অবাক্ হইয়া যায়। এই মানুষটার উপর দিয়া এত দুঃখ কষ্ট ঝড় ঝঞ্ঝা গেল, কলিকাতার পথে পথে বসিয়া সে ভিক্ষা করিয়াছে। এই সেদিন পর্যন্তও পঙ্গু ছিল। আজ মনের এত বল পাইল কোথা হইতে?

পরক্ষণেই ভাবে, হবেই ত। না হলে মাইনকার মত ছাওয়াল হয়?

আজ-কাল গোকুলকে বেশ দেখায়। চওড়া উঁচু বুক; নৌকার দাঁড়ের মত শক্ত দু'খানি হাত। চওড়া কপাল, যেন আগের সেই জোয়ান মাঝি। তবে গায়ের রং আগের চেয়ে ফরসা, চোখের চাহনি স্থির শান্ত। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছিয়া সে যেন মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। চরিত্রের পরিবর্তন তার চোখে মুখে দিয়াছে এক অদ্ভুত দৃঢ়তা। গোলাপীর বুক আনন্দে ও আকাঙ্খায় ভরিয়া যায়। মন কোমল ও রঙিন হইয়া ওঠে। গর্বও হয়; এমন মানুষের সে বৌ, মানিকের মা সে।

বেলা বাড়ে। দিগদিগন্ত রোদে ভরিয়া যায়। গাছ পালা লতা পাতা সব ঝলমল করে। সব চেয়ে সুন্দর দেখায় পাখীর পালক। তার রঙ বেরঙের ডানার উপর যেন আগুন ঢেউ খেলিয়া যায়।

কুমির কাজ ঢের। রান্না, সংসারের আর পাঁচটা কাজ, আজ সবই পড়িয়াছে তার উপর। মানিক তাকে বলিয়া গিয়াছে, আমি একজন সৈন্য—চাষী সৈন্য। চললাম লড়তে। জানিস্ ত সৈন্যদের খাতির কত?

কুমি বলে, আমি কি সৈন্য দেখছি?

তা হইলে দেখ্—বলিয়া মানিক ঘাড় উঁচু করিয়া দাঁড়ায়। বলে, আমার জন্য মোচার ঘণ্ট রাঁধিয়া রাখিস কিন্তু। দেখার দাম।

ইস্—বলিয়া কুমি কথাটা উড়াইয়া দেয় বটে কিন্তু মানিক চলিয়া যাওয়ার পরই গাছ হইতে মোচা পাড়ে। সেই মোচা কোটে, সিদ্ধ করিয়া কষ ফেলিয়া দেয়, তারপর মাকে ডাকিয়া বলে, এখন করব কি?

নিজে যা পারিস্ কর্।

আমি ত জানি না।

আমিই যদি রাঁধিয়া দি তা হইলে মানিকরে তুই কবি কি ?

কব যে রাঁধছি আমি।

বাঃ রে মিথ্যুক—বলিয়া গোলাপী উঠানের পাশে যাইয়া বসিল। ঠিক এই সময় বাহিরে ভীমের ডাক শোনা গেল, গোকুল দা।

ডাকটা স্বাভাবিক নয়। গোলাপী বাহিরে আসিয়া দেখে ভীমের পাশে মানিক, কোন রকমে ভীমকে ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া আছে, তার ডান বাহুমূলে লাল গামছা জড়ানো, মুখখানা আগুনের তাতে কচিপাতার মত কোঁকড়াইয়া গিয়াছে। গোলাপী বিহ্বলভাবে তাকাইয়াছিল।

ভীম বলিল, দেখ কি ? তাড়াতাড়ি একখান হোগলা পাতো।

বারান্দায় হোগলা পাতে কুমি। গোলাপী জিজ্ঞাসা করে, অর হইছে কি, ঠাকুর পো, জ্ঞান আছে ?

ভীম বলিল, লাঠির বাড়ি পড়ছে কাঁধের উপর। ভারি দুর্বল হইছে। তোমরা কথা কইও না, একটু সোয়াস্তিতে থাকতে দেও।

একী ! তোমার সর্ব দেহেও দেখি কালশিরা পড়েছে। এ সর্বনাশ করল কেডা ?

করছে বড় মানষে, তার টাকায়।

ছোডদির খবর কি ?

ছোটরাণী ? তানারে প্রথমে দেখছিলাম, তারপর ভিড়ের মধ্যে মিলাইয়া গেছে। যাউক মানিকারে একটু গরম দুধ খাইতে দেও। আমি এখন চললাম।

গোকুল ভীমের পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল, তুমি আবার যাবা এই দেহ লইয়া ?

আমার কিছু হয় নাই, তা ছাড়া আমি না গেলে চলবে না।

গোকুল বলে, না ভাই, কাজ নাই তোমার যাইয়া, সুকু আছে, অনিল সেন আছে, কানু নলিন নগেন—।

মানিক এবার চোখ মেলিয়া বলিল, ওনারে যাইতে দেও, মানা করিও না। ভীম কাকা না গেলে আমরা হারিয়া যাব।

মাঠে আজ ভীম চাষীদের নেতা, সংগ্রামের প্রাণ স্বরূপ। তার সাহস তাদের উৎসাহ যোগাইয়াছে, তার দৈহিক শক্তি তাদের অনুপ্রাণিত করিয়াছে। জিনিসটা মানিকের চোখে দেখা।

গোকুল আর বাধা দেয় না।

ভীম দ্রুতপদে চলিয়া যায়। সে সাঁকো পর্যন্ত গেলে গোকুল ডাকিয়া বলিল, দাঁড়া ভাই, আমিও তোর লগে যাব।

ভীম ফিরিয়া দাঁড়ায়।

স্বামীর প্রস্তাবে গোলাপী একেবারে অবাক্ হইয়া গেল, তার রাগ হইল ভীমের উপর। সেই যেন তার স্বামীকে ছিনাইয়া নিতে আসিয়াছে। গোকুল ততক্ষণে কোমরে শক্ত করিয়া কাপড় বাঁধিয়াছে, মাথায় গামছা জড়াইয়াছে। গোলাপী বলিল, এই শরীর লইয়া তুমি চললা কোথায়?

চললাম মাইনকার পথে। ছাওয়াল বাপের পথে চলে, আমি যাব ছাওয়ালের পথে।

গোলাপী আর কিছু বলার অবকাশ পায় না। গোকুল ঘরের কোণ হইতে পুরানো একখানা বৈঠা তুলিয়া নিয়া একবার মানিকের দিকে তাকায় আবার তাকায় কুমি ও গোলাপীর দিকে।

আমি তড়িঘড়িই ফেরবো, শীগগিরই আমাগো সুদিন আসবে, তোমরা ভাবিও না, বলিয়া সে একরূপ ছুটিয়াই বাহির হইয়া গেল।

গোলাপী বোধ হয় পিছু ডাকিতেছিল, মানিক বাধা দিল, বাবারে মানা করিও না।

গোলাপী বলিল, এ কস্ কি তুই? ক'মাস আগে যার গা গতর কাঁপত, সে যাবে কাজিয়া করতে?

কুমি বলিল, শুধু বৈঠা নয়, কাপড়ের তলায় একখানা দাওও লইয়া গেছে।

মানিক বলিল, বেশ করছে। লড়াই করতে খালি হাতে যাবে কেন?

গোলাপী আর কোন কথা বলে না। চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ছেলের মাথায় পাখা করে, কপালে হাত বুলায়।

মানিকও নীরব। সে মায়ের হাত তুলিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে আঙুল নাড়ে, যেন তাকে আশ্বাস দেয়, অভয় দেয়, তার মনে সাহস সঞ্চার করে।

কুমি দাদার মাথা ধোয়ার জল আনিল, দুধ গরম করিয়া দিল। গোলাপী ছেলের বিছানা ছাড়িয়া উঠিল না। কুমি খাইতে ডাকিলে বলিল, তোর বাবা আসুক তখন খাব।

আজ সে স্বামীর সঙ্গে একত্রে বসিয়া খাইতে চায় যেমন আগে খাইত—তাদের নীড় বাঁধার আগে।

সময় কাটে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ক্রমে ক্রমে গৌরীর মাঠ নিস্তব্ধ হইয়া আসে। গোলাপী কুমিকে প্রশ্ন করে, কি, কোন শব্দ পাস্?

কুমি বলে, হ পাই। কখনও বলে, না মা পাইনা তো কিছু।

গ্রামটা নিস্তব্ধ। গাছ পালা সাঁকো খাল সমস্ত প্রকৃতি ধ্যান মগ্ন মুনির মতন আত্মস্থ। গোলাপীও যেন নিজের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে, মনে কিছুই দাগ কাটে না, চারধারের আলো বাতাস সবই তার কাছে অর্থহীন।

এক একবার বুকের ভিতরটা হু হু করিয়া ওঠে, ভাবে এ নীরবতা কেন? তবে কি চাষীরা হারিয়া গেল? তার চেয়েও খারাপ কিছু হইল না কি!

কুমি বাপের খবর জিজ্ঞাসা করার জন্ত সিধুর বাড়ি গিয়াছিল, সেখানে ধমক খাইয়া ফিরিয়া শিরিষ গাছ তলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

মানিকও ঘুমাইতেছিল। বৈকালের দিকে সে ঘুমের মধ্যেই শব্দ করিয়া উঠিল। গোলাপী বলিল, কি, কি চাই বাবা? জল, দুধ?

মার্ মার্—বলিয়া মানিক বাঁ হাত ঘুরায়। মাটি হইতে কি যেন তুলিয়া ছুঁড়িয়া মারিবার চেষ্টা করে।

সন্ধ্যা নামে। মাটির তলা হইতে অন্ধকার উঠিয়া চারদিক গ্রাস করিয়া ফেলে। গোলাপী কুমি মানিক সেই অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া যায়।

ঘরের পিছনে একটা শিয়াল ডাকে, আবার একটা। শুরু হয় শৃগালের ঐকতান বাদন। সেই বেতার বার্তা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভাসিয়া চলে। গোলাপী ভাবে, মানুষের মতন শিয়াল জাতটাও পাগল হইয়া গেল নাকি?

খানিকটা পরে উঠানে পায়ের শব্দ শুনিয়া সে বলিল, কে, কে?

আস্তে,—ভীমের কণ্ঠস্বর। গোলাপী তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিল, তুমি একলা আইলা যে, তোমার ভাই কোথায়?

আইলাম মাইনকারে নিতে।

তারে আবার কেন?

লুকাইয়া রাখতে হবে, পুলিস ধর পাকড় করতে আসবে শোনতেছি। চাষীর ঘরে কোন জোয়ানরে পাইলে আর আস্তা রাখবে না।

ও ত জোয়ান না, একরত্তি ছাওয়াল।

অর বয়সী ছাওয়ালগোও ধরছে, তাছাড়া গান বাঁধার জন্য, লড়াইর জন্য অর নাম চারদিকে ছড়াইছে।

তোমার ভাইরেও লুকাইছ বুঝি? তারে রাখলা কোথায়? সে বেশী মার খায় নাই ত?

ভীম বলিল, আছে—

কোথায় আছে? কেমন আছে?

এই এক রকম, আছে গ্রামেই—ভীম উত্তর করিল টানিয়া টানিয়া।

মিথ্যা কথা বলিতে সে জানেনা, তার গলা কাঁপিয়া যায়। গোলাপীর সন্দেহ হয়; সে খপ করিয়া ভীমের হাত ধরিয়া বলে, আমারে ছুঁইয়া কও দেখি তার কি হইছে, সে কোথায়?

ভীম বালকের মতন কাঁদিয়া ফেলে।

গোলাপীর বুঝিতে আর কিছুই বাকী থাকে না, অন্ধকারের দিকে চাহিয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

তাদের কথাবার্তায় মানিকের ঘুম ভাঙে। সে এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। এবার বিছানায় উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবার কি হইছে ভীম কা?

ভীম নীরব।

মানিক আবার প্রশ্ন করিলে সে এক নিঃশ্বাসে বলিল, গোকুল ভাই ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেছে।

লণ্ডন সর্দারের লাঠির এক ঘায়ে গোকুলের মাথার খুলি ফাটিয়া যায়। ভীম তার সংজ্ঞাহীন দেহ কাঁধে করিয়া ভীড়ের মধ্য দিয়া আসিতেছিল এই সময় গোকুলের মাথায় আবার লাঠি পড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই ঘিলু বাহির হইয়া যায়।

এবার মারে গৌরীগাঁয়ের এক চাষী। হারাণ সম্প্রতি লোকটাকে টাকা দিয়া কিনিয়াছিল।

বন্ধুর কাঁধের উপরেই গোকুলের শেষ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া যায়।

ভীম সবটা বলে নাই, যতটুকু বলিয়াছিল গোলাপী তাহাও সম্পূর্ণ শুনিতে পাইল না।

মানিকও নীরব। কাঁদিল শুধু কুমি। বাবা বাবা—বলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। ধমক দিয়া ভীম তাকে থামাইয়া দিল।

সময় কাটে, দুই পাঁচ সাত মিনিট। মিনিট না যেন এক একটা ঘণ্টা।

মানিক জিজ্ঞাসা করিল, ছোট মা কোথায় ?

তারে পুলিসে ধরছে। ঘায়েল নন্দীর লোকেও কম হয় নাই। হরি কাবুল মরছে। রাম দরোয়ানের মাথা ফাটছে।

হরিমতী হারাণের সঙ্গে মাঠ হইতে ফেরে নাই। জনতার মধ্যে যাইয়া নিজের ধানের গাদার উপর দাঁড়াইয়া ছিল। সেই সময় পুলিসের গুলিতে মারা গিয়াছে।

আমাগো গেল কেডা কেডা ?

অনুকূল, এস্তাজ নরেন সাত আটজন।

সাত আটজন মরছে !

ভীম সংক্ষেপে জবাব দেয়, হুঁ। একটু পরে বলে, আমাগো এবার যাইতে হবে। তুই চলতে পারবি ?

তোমারে ধরিয়া পারব।

ভীম ও মানিক বারান্দা হইতে উঠানে নামা পর্যন্ত গোলাপী চুপ করিয়াছিল ; তারা চলিতে আরম্ভ করিলে সে বলিল, ঠাকুরপো, ওরেও নিয়া চললা ?

তোমার ভয় নাই ; অর যাতে খেতি না হয় তা আমি করব।

গোলাপী জানে নিজের জীবন দিয়াও ভীম তার ছেলেকে রক্ষা করিবে। কিন্তু সেই চেষ্টার সাফল্য সম্পর্কে আজ তার মনে সন্দেহ জাগে। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া সে বলিল, তোমরা থাকবা কোথায় ?

কাছেই থাকব। নন্দীরা ধান তুলিয়া নেওয়ার জন্য লোক পাঠাইতে পারে। তখন আবার লড়াই লাগবে।

গোলাপী বলে, আরও লড়াই !—তার গলা দিয়া কথা বাহির হয় না।

মানিক বলিয়া উঠিল, ভাবিও না মা, এ লড়াইতে আমরাই জেতব, গরিবরা।

সাঁকোর বাঁশ তাদের পায়ের চাপে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করিয়া উঠিলে কুমি ডাকিল, যাইওনা, আমাগো ফেলিয়া যাইও না, ফিরিয়া আইস।

রাত বাড়ে। আর সব নীরব, শুধু প্রহরান্তে একবার করিয়া বাস্তু কুডালের ডাক শোনা যায়।

গোলাপী চুপ করিয়া বসিয়া, তার গায়ে অন্ধকারের আবরণ। বাহিরের এই আবরণ ভিতরের হতাশার মতন ভারী, মৃত্যুর মতন শীতল।

*　　　*　　　*

চাঁদ ওঠে। জোছনায় জোছনায় আকাশ ছাইয়া যায়।

খালপাড়ে বিলাস মজুমদারের বাড়ি। বিলাসরা দেশ ছাড়া বহুদিন। উঠানে এক হাঁটু জঙ্গল, ঘেঁটু গাছই বেশী—আর কতকগুলি মনসা। এক খানা ঘর পড়িয়া গিয়াছে। আর একটা ভিটার উপর ভাঙা চালা হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছে। চালাটার ফাঁকে ফাঁকে আশ সেওড়া, পিয়ালি ফুল ও বাসক গাছ।

মানিক বলিল, এখানে কেন ভীমকা?

ভীম উত্তর করে না।

একটু পরে হুমড়ি খাওয়া চালার তলা হইতে সে বাহির করে গোকুলের মৃতদেহ। মানিক এক দৃষ্টে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। শান্ত স্নিগ্ধ সমাহিত মুখ, মনে হয় যেন আকাশের দিকে চাহিয়া তারা গুনিতেছে।

তার পরই মানিকের চোখ পড়ে বাপের মাথার দিকে। সে চোখ ফিরাইয়া নেয়।

ভীম বলিল, নাও বাওয়ার সময় তোর বাপ এই রকম চাইয়া থাকত, তারা গোনতে বড় ভালবাসত, আর বাসত আমারে—।

মানিক প্রশ্ন করিল, বাবারে এখানে আনছে কেডা?

ভীম বলিল, আনছি আমি, ভাবছি তোরে দেখাইয়া—ভাসাইয়া দেব।

ভাসাইয়া দেবা!

আগুন দেওয়ার সময় নাই। সুবিধা হয় নাই। আমি একটা দিয়াশালাইর কাঠি ধরাইয়া দি, তুই সেই কাঠিটা গোকুলদার মুখে ছোঁয়াইয়া দে। তবু যাক্ ছাওয়ালের হাতের একটু আগুন পাবে।

ভীম কাঠি ধরাইয়া দিলে মানিক জলন্ত কাঠিটা বাপের মুখে ছোঁয়ায়। তারপর ছোঁয়ায় পায়ের নখের ডগায়।

তার হাত কাঁপিয়া যায়। চোখ আগেই জলে ভরিয়া গিয়াছিল। আর একটু হইলে কাপড়ে আগুন লাগিয়া যাইত। ভীম তাড়াতাড়ি কাঠিটা নিভাইয়া দিল।

এই পোড়ো ভিটায় ইট পাথর কিছুই নাই। ভীম তাড়াতাড়ি কত গুলি ভারী কাঠ জড় করে। সেগুলি শবে বাঁধিয়া খাল পর্যন্ত টানিয়া শবটা জলে ডুবাইয়া দেয়।

মানিক এতক্ষণ চুপ করিয়া দেখিতেছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, বাবারে মাছ কাছিমে ঠোকরাইয়া খাবে না ত?

ভীম কোন উত্তর দিল না।

সারাটা রাত গোলাপী দরজায় বসিয়াছিল, একটি বার চোখ বোজে নাই। চোখের উপর ছবির পর ছবি ভাসিয়াছে—স্বামীর সঙ্গে নিবিড় প্রেমের কতগুলি উজ্জ্বল স্মৃতি। মানিকের মুখে মা ডাক, তার হাসি হাসি মুখ।

গোলাপীর সঙ্গে আর রাত জাগিয়াছে, সিধুদের বাড়ির ধবলি গাই। সারা রাত মৃত বাছুরকে ডাকিয়াছে। বাছুরটা ভূমিষ্ঠ হইয়াই মারা গিয়াছে। সেই হইতে মায়ের ডাক আর থামে নাই।

আকাশ ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়। পাখীর কল-কাকলীর মধ্যে ধরণী আবার জাগিয়া ওঠে, আসে নূতন প্রভাত।

পুব-আকাশে অরুণে অরুণে ছাইয়া যায়। মনে হয় ঐ দিকটায় আগুন লাগিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে হাজারো কণ্ঠের কলরব বন্যার তরঙ্গের মতন ভাসিয়া আসে।

গোলাপীর মনে পড়ে ঠাকুর পো (ভীম) কাল বলিয়াছিল 'নন্দীর পো ধানের জন্য কাল সকালে লোক পাঠাইলে আবার লড়াই লাগবে।'

সেই লড়াই বাধিয়াছে। গোলাপী কুমিকে কাছে টানিয়া নিয়া বলে, শোনতে পাস কিছু ?

হ, মা। হো—ও—ও, কাল বেটারা বাবারে মারছে। আজ দাদারে, কাকারে।

গোলাপী মনে মনে আশা পোষণ করে কাল মানিকের যে অবস্থা হইয়াছিল, আজ সে হয়ত যায় নাই।

কিন্তু ভীম ?

সে নিশ্চয়ই গিয়াছে, সব চেয়ে ভাল লড়াই করে সে। চাষীদের সে নেতা।

বেলা বাড়ে। কলরবও বাড়ে। গোলাপীর ভয় হয় নন্দীদের অত টাকা, কত ওস্তাদ লাঠিয়াল, কত অস্ত্র-শস্ত্র। পুলিসও তার পক্ষে। আর এদিকে তার ভীম ঠাকুরপোরা একদল গরিব মানুষ। সম্বল শুধু সাহস, অস্ত্র লাঠি ও বৈঠা। বড় জোর দু'চারটা লেজা সড়্‌কি। তারা কি পারিবে ?

আচ্ছা মানিকও আছে না কি ? হয়ত আছে।

গোলাপীর হঠাৎ মনে পড়ে মানিকের কথা, শেষ পর্যন্ত আমরাই জেতব, মা। গরিব দুঃখীরা।

সে কুমিকে প্রশ্ন করে, কি কস ? আমরা জেতব ?

কি যে উত্তর করিবে কুমি ঠিক বুঝিতে পারে না।

গোলাপীর কানে ছেলের কথাটা যেন লাগিয়াই আছে, আমরা জেতব শেষ পর্যন্ত, জয় হবে গরিব চাষীর।

এই আশার বাণীই তার কাছে ক্রমে ক্রমে বড় হইয়া ওঠে। গৌরীর মাঠের কলরবকেও ছাপাইয়া যায়।

সমাপ্ত
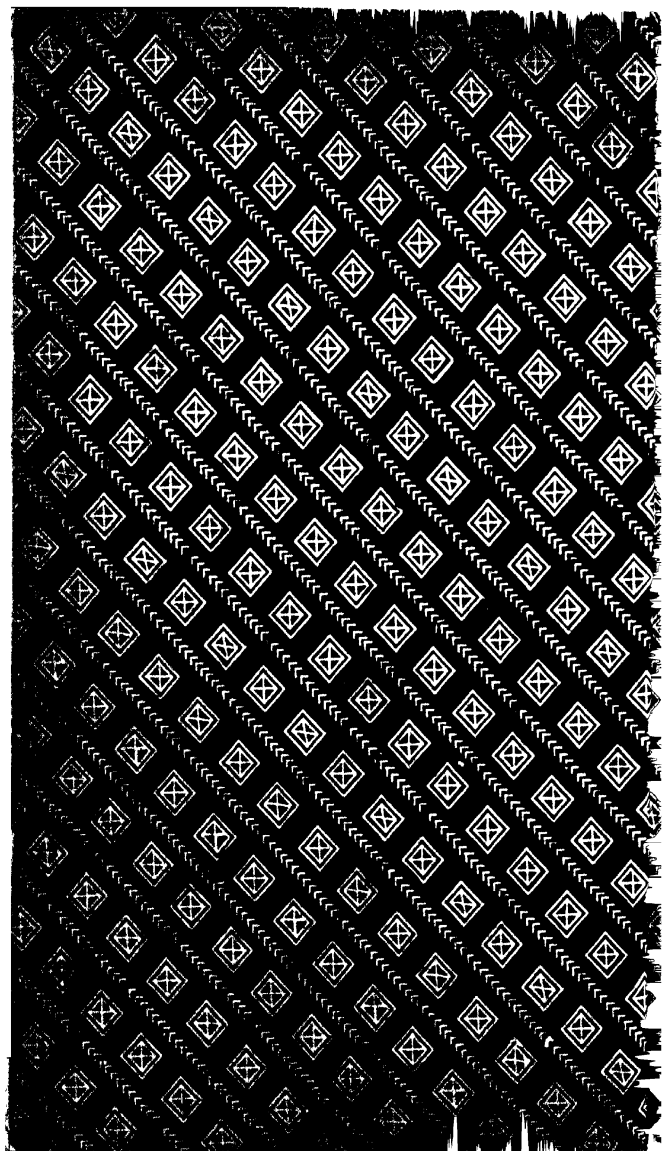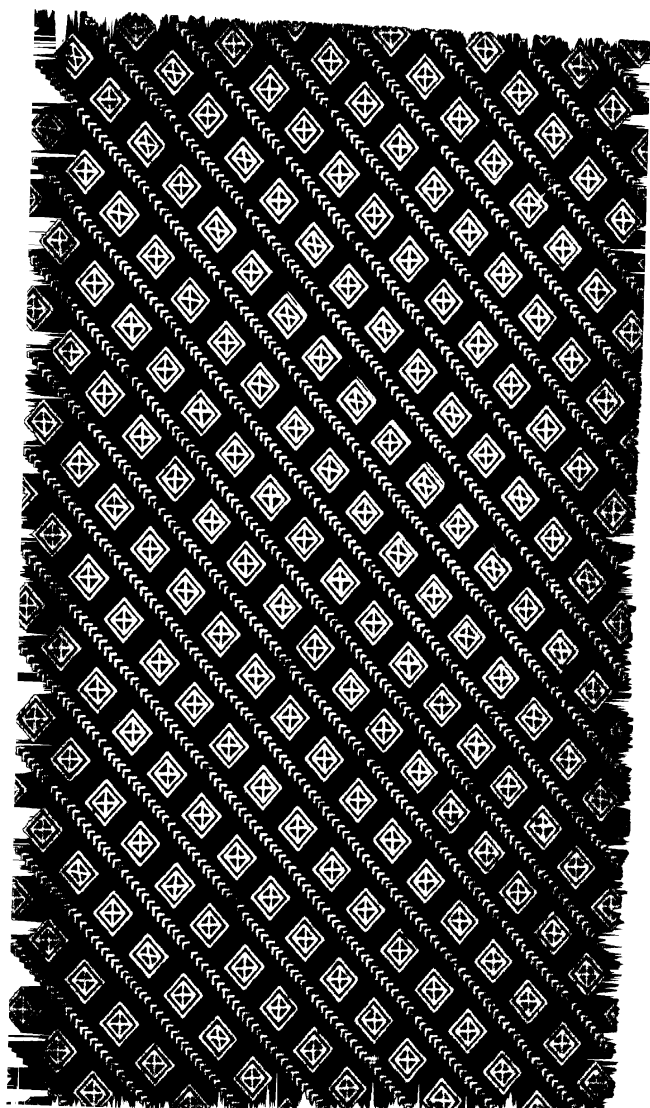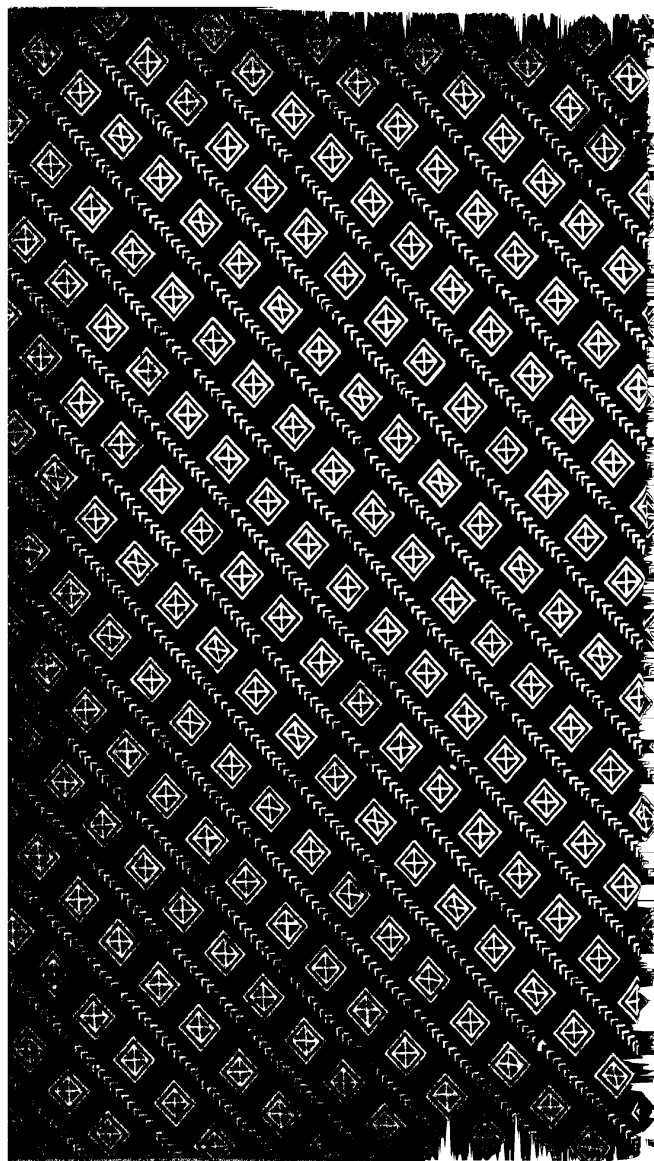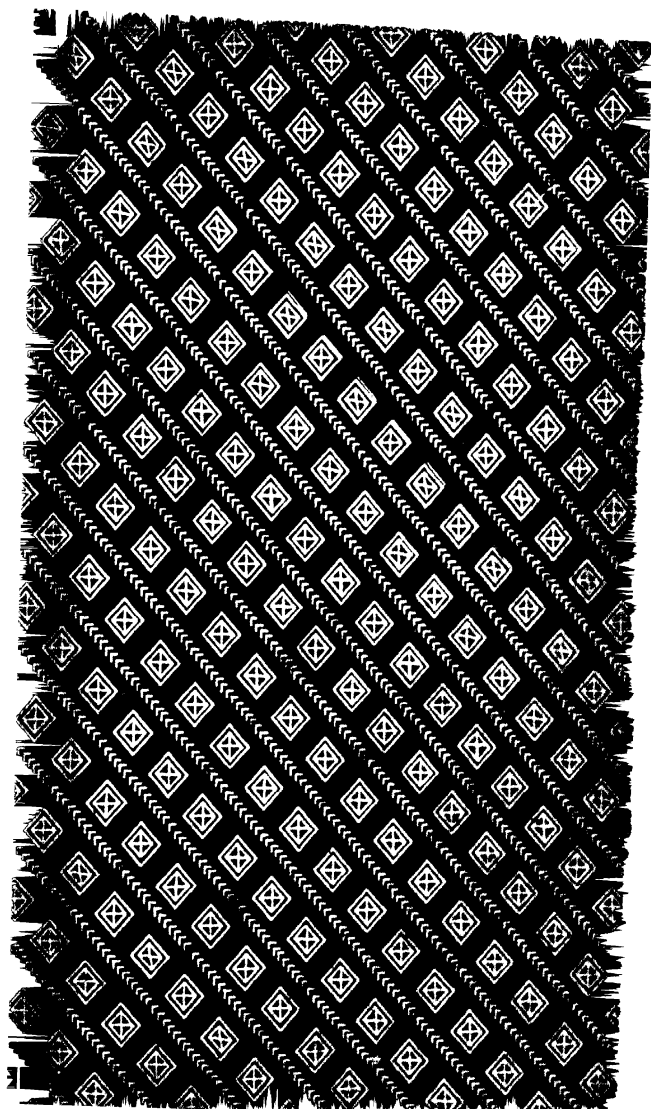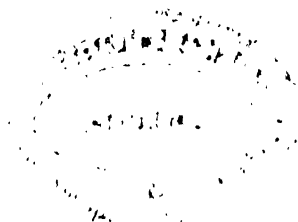
মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা—১২ হইতে প্রফুল্ল বসু কর্তৃক প্রকাশিত ও
বসুশ্রী প্রেস ৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট কলিকাতা—৬ হইতে শ্রীগৌরীশংকর রায়চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত

স্নেহভাজন শ্রীমান প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত

ও

শ্রীমতী অমিয়া সেনগুপ্তকে—
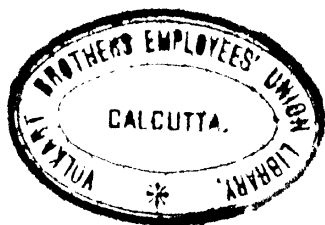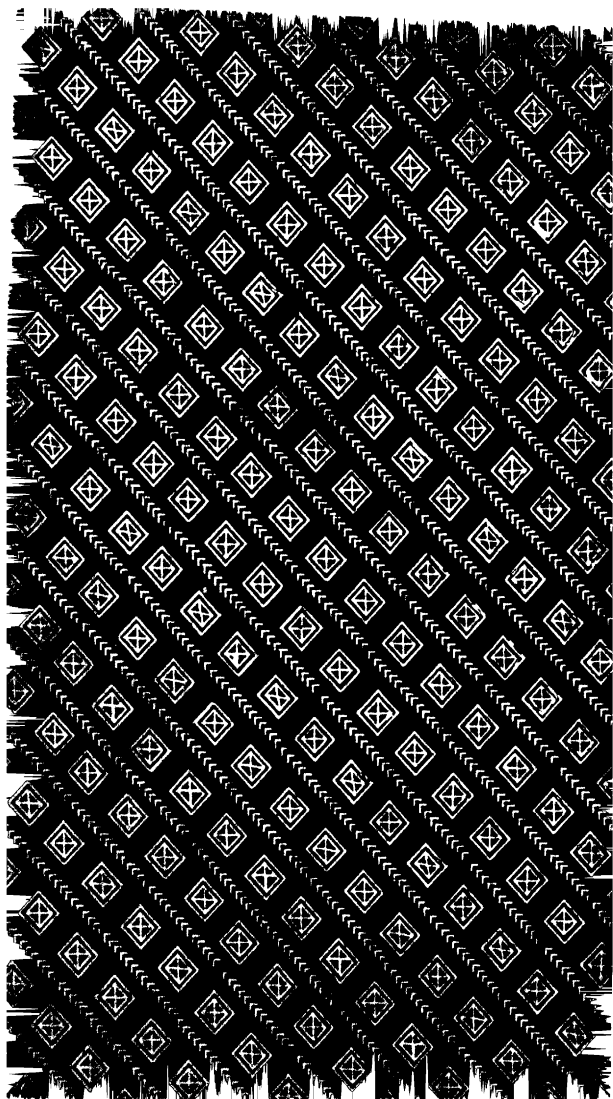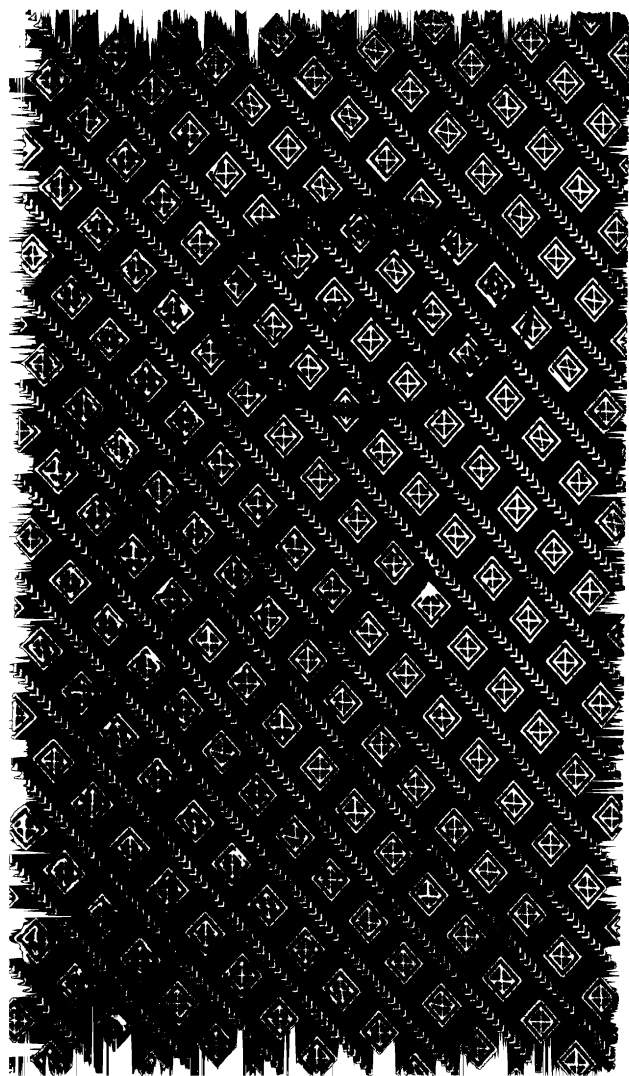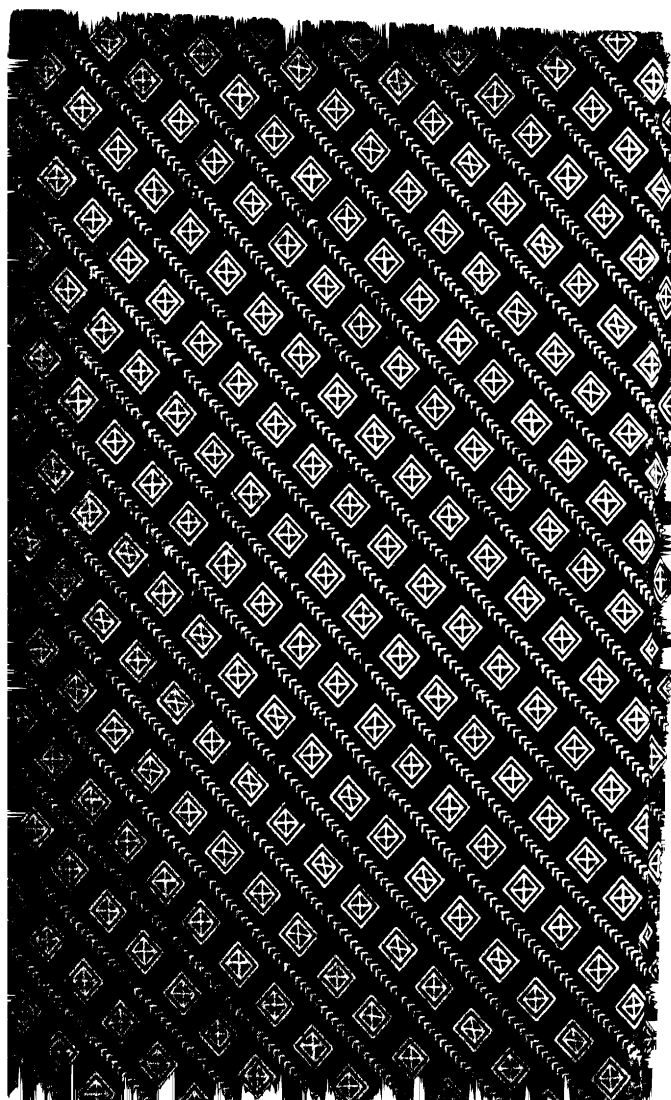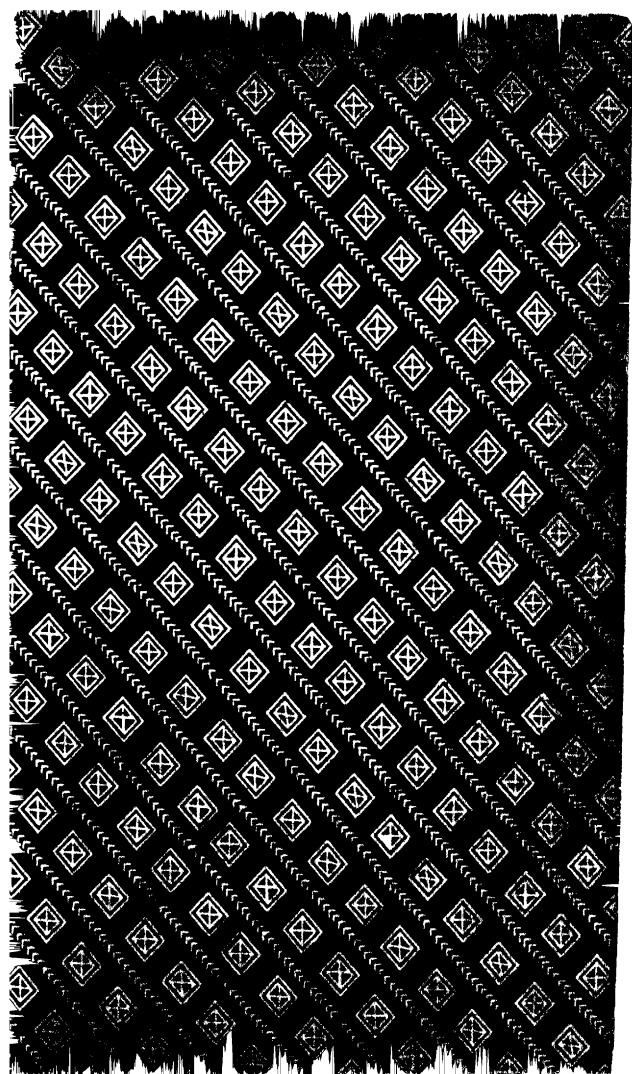
গৌরীগ্রাম

রমেশচন্দ্র সেন

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২